বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা

সম্পাদক
আবদুল মান্নান তালিব

বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা
সাহিত্য সংকলন, ডিসেম্বর ২০০৪

সম্পাদক
আবদুল মান্নান তালিব

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান
মাহবুবুল হক
মোঃ আবদুল হান্নান
সাজজাদ হোসাইন খান
ড. হুমায়ুন কবীর
সোলায়মান আহসান
তৌহিদুর রহমান

প্রকাশক
পরিচালক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১ বড়মগবাজার
ডাক্তারের গলি, ঢাকা-১২১৭,

যোগাযোগ
সম্পাদক
বাংলা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা
১৭১ বড়মগবাজার
ডাক্তারের গলি, ঢাকা-১২১৭,
ফোন- ৯৩৩২৪১০, ০১৭১৫৮১২৫৫

মুদ্রক
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ
আবদুর রহীম

মূল্য
ত্রিশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

...না বিনতে মুজাহি...

সম্পাদকীয়

আমাদের ভাবনা

যে কাজটি করার ছিল আরো আগে। অন্তত বিশ বছর আগে। তবুও তা আজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর মেহেরবাণী। তাঁর অপার করুণা।

আমরা শুরু করেছি একটি নিয়মিত আলোচনা পর্যালোচনার আসর। একটি পত্রিকা। আমরা কি চাই। আমরা কি করবো। আমাদের কি করতে হবে। এসবই হচ্ছে আমাদের ভাবনা ও কাজের কথা।

সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে। কিভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আমাদের আপন সত্তা ও চেতনার সাথে একাত্ম করতে হবে। সাতশ বছর আগে যে ভাষা ও সাহিত্যকে লালন ও পরিচর্যা করে আমরা মৃত্যুদশা থেকে বাঁচিয়েছিলাম, আপন করে নিয়েছিলাম, যার লালন ও সমৃদ্ধির জন্য আমরা একটি মুক্ত স্বাধীন স্বদেশ ভূমি রচনা করলাম, তার সাথে আমাদের সত্তাকে আমরা কতটুকু মিশিয়ে দিতে পারলাম, তাকে আমরা কতটুকু ঘরের, নিজেদের আপন করে নিলাম- এটি অবশ্যই একটি পর্যালোচনার বিষয়।

বাংলা ভাষা আমাদের ভাষা। আমাদের বলা ও লেখার মাধ্যমে একে আমরা একটি আকৃতি দিয়েছি। আমাদের লেখনী চর্চার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে আমরা গড়ে তুলেছি। এসব কিছুর সাথে আমরা যুক্ত আছি। আমাদের পূর্বপুরুষরাও যুক্ত ছিলেন। আমাদের উত্তরসূরীরাও যুক্ত থাকবেন। আমরা যা কিছু করছি, তাঁরা যা কিছু করেছেন সবকিছু গভীর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ বিশ্লেষণ করলে আমাদের চেতনাকে আরো সতেজ করতে পারবো। আমাদের জাতীয় সত্তা, আমাদের জাতীয় ভাবধারা থেকে আমাদের সাহিত্যকে কি আমরা আলাদা করে দেখতে পারবো? কালের আবর্তন যুগের পরিবর্তনের ছাপ অবশ্যই আমাদের সাহিত্যে থাকবে। কিন্তু নবুওতী চেতনাও সর্বদা সচল থাকবে। এটি আমাদের সাহিত্যের বৈশিষ্ট।

এসব বিষয় সচেতন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের জন্যই আমাদের এই আসর। অতীত ও বর্তমান উভয়ই আমাদের বিষয়। বাংলা সাহিত্য পরিষদ এ দায়িত্ব নিয়েই এগিয়ে চলছে। সচেতন বিদগ্ধ সমাজ এ আসরে সক্রিয় অংশ নেবেন এ আশা আমরা করবো। আগামীতে নিয়মিত সংখ্যা বের করার প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাবো। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ ও সুগঠিত করতে সঠিক পথে ও সহজভাবে।

www.pathagar.com

সূচি

স্মৃতি
স্মৃতি কথা ৫
শামসুল ইসলাম নিজামী

প্রবন্ধ
নজরুল সঙ্গীতে ভাব-দর্শন ৮
মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

বিদেশী সাহিত্য প্রসঙ্গ
টি.এস. এলিয়টের কাব্যে আধুনিক মানুষের সংকট ২৬
ড. সদরুদ্দিন আহমেদ

প্রবন্ধ
ভাষা নিয়ে কিছু ভাবনা কিছু দুর্ভাবনা ৩৬
আবু জাফর

গল্প
কলির কেষ্টো ৪৫
শফীউদ্দীন সরদার

বিদেশী সাহিত্য প্রসঙ্গ
ইকবাল সাহিত্যের আদর্শ ৫১
আবদুল মান্নান তালিব

প্রবন্ধ
জাতীয় ভাবাদর্শের কবি গোলাম মোস্তফা ৫৭
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

কবিতা
ইকবালের কবিতা
ইবলিসের পরামর্শ সভা ৭৪
আল মাহমুদ
বিশ্বাসের চর ৭৮
আবদুল মান্নান সৈয়দ
আফজাল চৌধুরী ৭৯
মাহবুবুল হক
অর্জন ছিনতাই কেন? ৭৯
মতিউর রহমান মল্লিক ৮০
একটি লোকের জন্যে

শিল্প সংস্কৃতি
বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্প ৮১
ড. হাবিবা খাতুন

বিদেশী সাহিত্য প্রসঙ্গ
কলিকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি ৮৫
ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর

স্মরণ
সৈয়দ আলী আহসান ঃ একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন ৮৯
সোলায়মান আহসান

পুনর্মূদ্রণ
বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব ১০৩
শ্রীদীনেশ চন্দ সেন বি-এ, ডি-লিট্

স্মরণ
গোলাম মোহাম্মদ-এর কাব্য লক্ষ্য ১১৪
হাসান আলীম

www.pathagar.com

সিরিয়াল গল্প ১২২
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

শিল্পতত্ত্ব শিল্প সংস্কৃতি ১২৭
ইব্রাহীম মন্ডল

সেকুলারিজম রাজনৈতিক প্রবন্ধ ১৪০
ফাহমিদ-উর-রহমান

প্রেস্টিজ গল্প ১৪৭
নাসীমুল বারী

মৃত দেহ জীবিত আত্মা গল্প ১৪৯
সুফিয়া হাফিজ মুক্তা

একজন রহমত আলী গল্প ১৬১
সালেহ মাহমুদ

সাহিত্য প্রচেষ্টা প্রবন্ধ ১৬৯
ওমর বিশ্বাস

শূন্যতা গল্প ১৭৩
সিদ্দিক আবু বকর

অন্ত্যমিলে গরমিল প্রবন্ধ ১৭৭
হাসান রাউফুন

মাফরুহা চৌধুরীর 'সঙ্গ প্রসঙ্গ' গ্রন্থালোচনা ১৮২
তৌহিদুর রহমান

ছড়া ও কবিতা ১৮৪-১৯০
কাঙ্ক্ষিত সূর্যোদয়ের প্রার্থনা ইসমাঈল হোসেন দিনাজী
হেরার সাধক খালীদ শাহাদাৎ হোসেন
আমিও হারাবো মুর্শিদ-উল-আলম
কাঠিন্যের প্রিজনসেলে আমিন আল আসাদ
সুদ্রেয় সুন্দর জানে আলম
আষাঢ়ের পদাবলী-বৃষ্টি আফসার নিজাম
অবাঞ্ছিতের দর্শন ড.মো. রেদওয়ানুর রহমান
দুঃসময়ের প্রার্থনা ফজলুল হক তুহিন
মানুষ নাকি নষ্ট হাবিবুল্লাহ মারুফ
অন্য রকম বৃষ্টি শাহনাজ পারভীন
রক্তাক্ত কারবালার সচিত্র রিভিউ সা'দত ইবনে সিদ্দিক

আয়নার ওপাসে সম্পূর্ণ উপন্যাস ১৯১-২৫৪
আবু বকর সিদ্দিকী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

স্মৃতি কথা

শামসুল ইসলাম নিজামী

আমি-সৃষ্টিকর্তার পরম করুণার এক প্রতিকৃতি। প্রৌঢ়ত্বের যুগসন্ধিক্ষণে নষ্টালজি যখন আমার নিজস্ব ভুবনে ডানা মেলে তখন স্পষ্টতই বুঝতে পারি আমি আর সবার মতই সাধারণ। তারপরও আমার জীবনে তারুণ্য আছে। নতুন সূর্যের উপস্থিতি আছে, শিশির কণার স্পর্শ আছে, বালুকা বেলার অবগাহন আছে। আছে নীলাকাশের আনাগোনা। আর আছে মহান মানুষের স্নেহধন্য আর্শিবাদ।

পাহাড়ের মাঝে থেকেও তার সৌন্দর্য অনুভবে আমাদের অযোগ্যতা যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট কাছে পাওয়া মহান মানুষগুলোর প্রতিভা তাদের জীবদ্দশায় মূল্যায়নে আমাদের অযাচিত অযোগ্যতা। তেমনি একজন মানুষের কথা ভাবতে নিজেকে আজ খুবই অপরাধী মনে হয়। সেই সহজ সরল উপদেশদাতা মানুষটি আমাকে আমার গুরুর সন্ধান দিয়েছিলেন অতি শৈশবে। বলেছিলেন, তুমি শিল্পী জয়নুল আবেদিন কে চেন? স্কুল পাঠ শেষ করে ঢাকা আর্ট কলেজে ভর্তি হবে। জয়নুল আবেদিন ঐ কলেজেরই অধ্যক্ষ। দেশের বিখ্যাত শিল্পী। বলেছিলেন সুন্দর আঁকতে পার তুমি। শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তিনি তখন স্কুল পাঠ শেষ করে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মরত। একজন সৌখিন আঁকিয়েও বটে। সীতাকুণ্ড বাজারে এক অখ্যাত অচেনা কববাত-এর টি স্টলে দেখেছিলাম তাঁর শিল্প কর্ম। তার সৃষ্টি ছিল তাঁর মতই অনন্য। তাঁর আঁকা পালতোলা নৌকার যে অভিসার, সে অভিসারে সঙ্গী হতে, তার কথার মূল্যায়নে সেদিন হতেই আমি হয়েছিলাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি জাফর নগর উচ্চ বিদ্যালয়েরই ছাত্র, আমার অগ্রজ।

শৈশবে আমি আঁকার উৎসাহ পাই শেখের হাট প্রাইমারী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আমারই পাশে বসা ঠাকুরের ছেলে লেদিয়া থেকে। আবদুল আজিজ মৌলভী সাহেব, ৩য় শ্রেণীতে মহেন্দ্রবাবু, সপ্তম শ্রেণীতে এসে জাফরনগর স্কুলে পেলাম হেড মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, অংকের স্যার বাবু বিদুভূষণ ভট্টাচার্য ভীষণ রাগী অথচ আন্তরিক এ মানুষগুলো আমাকে স্নেহে কাছে টেনেছেন। তাদের সাহচর্য আমাকে উৎসাহী করেছে। আর পরিচিত হলাম সেই হৃদয়বান ব্যক্তিটির সাথে। দেখতে দেখতে একদিন স্কুল ছাড়ার সময় এসে গেল। মনের কোণে সুপ্ত বাসনা ডানা মেললো। মুহূর্তে মনে পড়ল সেই উপদেশটি। 'তোমাকে পথ খুঁজতে হবে। অজানা, অচেনা পথে গুরুর খোঁজে যাত্রা শুরু করতে হবে'। সেই অভিপ্রায়ে একদিন বাড়িতে আম্মাসহ ভাইদেরকে আমার মনের কথাটা বললাম। মেজভাই মোঃ ইউনুছ মিয়া সংসারের দায়িত্বে। আব্বা

www.pathagar.com

তখন বেঁচে নেই। ভাই বলেছিলেন PTI তে ভর্তি হতে। উনার ইচ্ছা আমি মাস্টার হই। বিনয়ের সাথে উনাকে বলেছিলাম আমি আর্ট কলেজে পড়বো। একজন সমাজসেবী হিসাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাপুষ্ট ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার হিসাবে মেজদা ছিলেন খুবই দূরদৃষ্টিভংগী সম্পন্ন। যেমন মেজাজি তেমনি আন্তরিকও বটে। তিনি বললেন, ছবি এঁকে এদেশে দুবেলা ভাত জুটবে না। উনার এ কথায় আমি বিদ্রোহ করলাম। আমার প্রাপ্য সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে আর্ট কলেজে পড়ার আগ্রহের কথা জানালাম। যতদূর মনে পড়ে বড়দের সাথে সেই বয়সে এটাই আমার অশোভন আচরণ। শেষ পর্যন্ত আমার শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ ভাই আমার সিদ্ধান্তে সম্মতি জানালেন এবং পাঁচ বৎসরের শিক্ষা কোর্সের ব্যয় আন্তরিকতার সাথে বহন করলেন। মেজ ভাইয়ের স্বপ্ন পূরণে আমি আজ মাস্টার, দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষায়তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার।

যে হৃদয়বান মানুষটি উদার চিত্তে শৈশবে আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এপথে গেলে তুমি গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে, সেই তিনি এখন বেঁচে নেই। সেই সৌখিন শিল্পী মরহুম আবদুল গফুর, যিনি একজন অত্যন্ত বড় মাপের বহুমুখী গুণের অধিকারী ছিলেন। আজ তাঁকে হারিয়ে বুঝতে পেরেছি উনার উপদেশ মত আমি যে পথে এসেছি সেপথ সত্যি কঠিন, কন্টকাকীর্ণ। এখানে রাত হয় দিন আসে। রাতে মশার কামড়, কনকনে শীত, রূপালী জোছনা, ঝমঝম বৃষ্টি, দিনে কড়া রোদ্দুর, ঝড়ঝাপটা, বৃষ্টির সোঁদাগন্ধ, শিশির কণা, সোনালী সূর্য-সবই আছে। এপথে যা দেখেছি, দেখছি তাই'ই আমাকে রপ্ত করতে হবে। এপথ অতিক্রম করতে পিছলে পড়ার ভয়, পথ ভুল করার সম্ভাবনা বড় বেশি।

আর্ট কলেজে ভর্তি হবার প্রাক্কালে দুটি মহানুভব মানুষের সহযোগিতা আমার চলার পথের আরেক আলোকবর্তিকা। তাদের একজন মীর জাফরুল আলম। ঢাকাতে তিনি ছিলেন আমার তৎকালিন আশ্রয়দাতা। আরেকজন ড. রহিমুল্লাহ মাস্টার। তিনি এ পথের চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে আজও আমাকে ঋণী করে রেখেছেন। আর্ট কলেজ হতে পাশ করার পর সীতাকুণ্ড হাই স্কুলের তৎকালীন হেডমাস্টার মরহুম আবদুল ওদুদ সাহেব আমাকে পেইন্টিং এর উপর আরও নিরীক্ষাধর্মী, গবেষণাধর্মী কাজ করার লক্ষ্যে স্কুলের একটি কক্ষ বেশ কিছু দিনের জন্য যোগান দিয়েছিলেন। আমার শিল্প চর্চার লক্ষ্যে তার এই উদার ভূমিকার জন্য আজও আমি শ্রদ্ধাবনত কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার বাবা আমার জীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক। একজন ধর্মপ্রাণ, বহুভাষাবিদ, জ্ঞানী অথচ সনাতন শিক্ষা বঞ্চিত এ মানুষটি বেঁচে থাকতে যে শিক্ষা আমি পেয়েছি তা পথ চলে আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। সঠিক পথে চলতে হলে বুদ্ধিমান শিক্ষিত লোকের পরামর্শ নেবে। আরও শিখিয়েছিলেন যদি তুমি যাত্রা পথে কিছুদূর যাবার পর দু'শাখায় পথের দিশা এবং পথের বিচ্ছিন্ন বিন্দুতে দুজন লোককে দেখ যাদের একজন

www.pathagar.com

নিদ্রায় মগ্ন এবং অপরজন জেগে বসে আছে। তোমার গন্তব্যে পৌঁছতে হলে কার নিকট হতে জানবে পথের ঠিকানা? প্রশ্নের উত্তরে সাহস করে বলেছিলাম কেন যিনি জাগ্রত তার নিকট হতে। তিনি বললেন, বোকা ছেলে আমার, জেগে থাকা ব্যক্তি তো বসে আছে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গের জন্য। সেই শুধু জানে কোন পথে এগুলে তোমার কাঙ্ক্ষিত বাসনা চরিতার্থ হবে। সুতরাং তার পাশে বস, অপেক্ষা কর, জান এবং জ্ঞান অর্জন কর। এটাই শিক্ষা। আপন মেধায় সঠিক পথে চলার পর ঢেউ ধীর কিংবা উত্তাল তরঙ্গ গুনতে হবে একের পর এক। হাজার লক্ষ কিংবা কোটি গুণের শেষ নেই যা। সেটাই জানাই জ্ঞান।

এ জ্ঞানকে রচনা করে জীবন পথ। সৃষ্টির উল্লাসে জীবন যখন অসীমের পানে ধাবমান তখন সামনেই উত্তাল উর্মী বিক্ষুব্ধ ফেনিল সমুদ্র। এপারের যাত্রী আমরা তখন ওপারে যাত্রার সম্ভাবনা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর। কেবল তারাই মাহীসোয়ারে জীবন সমুদ্রের এপার হতে ওপারে পার হবে যারা সৃষ্টির আলোকময় রূপের মাঝে অবগাহনে সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। স্রষ্টার কৃপায় আমার চেষ্টার রথে চড়ে আমি সফল হলেও জীবন ওপারেই থেমে যায়নি। জিজ্ঞাসু হৃদয়ের অভিলাষ আমাকে টেনে নিয়ে যায় সীমাহীনতার কালচক্রে যেখানে কেবলই মরু আর অনন্ত দিগন্তের লুকোচুরি। কিন্তু এ বালুকা বেলাতে এসেও আমি হতোদ্যম হইনি। ক্লান্ত আমি। পরিশ্রান্ত আমি। পিপাসার্ত আমি। এগিয়ে চলেছি সমুখ পানে, মরুদ্যানের খোঁজে, শিল্পী স্রষ্টার শিল্পে অবগাহনের মানসে। এক সময় ব্যর্থতায় হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছি। দু'হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে জড়ো হয়েছে অসীমলোকের বিশ্ববিধাতার পানে। রুদ্ধ কণ্ঠে মিনতি– 'স্রষ্টা তোমার সৃষ্টি তোমারই অস্তিত্ব। তা ব্যবচ্ছেদের কিংবা তার রূপ-সুধা পানের সামর্থ ও যোগ্যতা আমার নেই। আমার কামনা, আমার বাসনা, আমার চেষ্টা-অভিপ্রায়, আমার প্রতি পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সুভানুধ্যায়ী, পরিচিতজনদের স্নেহধন্য আর্শিবাদ আমাকে সীমাবদ্ধতা থেকে তোমার সৃষ্টির মাঝে নিক্ষেপ করেছে। আমি বিন্দু হতে অণু, অণু হতে পরমাণুতে ছিন্ন হয়ে তোমার সৃষ্টিকে আপনার করতে চেয়েছি। পরাজয় আমার। আমি না পেরেছি তাদেরকে দেবার মত কোন সুর তুলতে কিংবা তোমাকে দেবার মত কোন সৃষ্টি গড়তে। স্বার্থপর আমি, নিঃস্ব আমি। তাই মাথানত করে আজ ক্ষমাপ্রার্থী। প্রভু আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে তোমার ইচ্ছার মাঝে লীন কর।'

লেখক আর আমাদের মাঝে নেই। স্মৃতিকথাটি আমাদের হাতে তুলে দেবার পর কিছুদিনের মধ্যে তিনি ইন্তিকাল করে তাঁর প্রভুর ইচ্ছার মাঝে লীন হয়ে গেছেন। –সম্পাদক

www.pathagar.com

নজরুল সঙ্গীতে ভাব-দর্শন

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্

নজরুল-সঙ্গীতে ভাব-দর্শন অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, উপলব্ধি ও অনুধ্যান কিভাবে রূপ পেয়েছে এবং তাতে রূপায়িত হয়েছে দার্শনিক অভিব্যঞ্জনা– সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে হলে স্বভাবতই তাঁর রচনায়– বিশেষত কবিতা ও গানে ভাব ও রূপের সমন্বয় কিভাবে এবং কতটা ঘটেছে, সে সম্পর্কেই আলোকপাত করতে হয়। গদ্য রচনা হোক আর পদ্য এবং কাব্য রচনাই হোক, কিংবা হোক সঙ্গীত বা কাব্যগীতি, যে কোনো ধরনের এবং আঙ্গিক ও রূপরীতির রচনার জন্যই ভাব অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় অত্যাবশ্যক। সে ভাব বা বিষয়বস্তু হতে পারে অতি সাধারণ, মামুলী ধরনের এবং তাৎপর্যহীন ও গুরুত্ববিহীন। আবার কোনো কোনো রচনার ভাব, বক্তব্য বা বিষয়বস্তু হতে পারে অসাধারণ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যবাহী, উচ্চমার্গীয়– এমনকি দার্শনিক অনুধ্যানজ্যাত এবং দার্শনিক তত্ত্ব-সমৃদ্ধ ও অত্যন্ত মূল্যবান। গদ্য রচনা বলি, কবিতা বলি, আর সঙ্গীতই বলি, কোনো না কোনো ভাব বা বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে, আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-কল্পনাকে আশ্রয়ের মাধ্যমে এবং বক্তব্যকে ধারণ করেই রচনার শিল্পরূপ গড়ে ওঠে বা রচিত হয়। পদ্য বা কাব্যের মতোই সঙ্গীত– বিশেষত কাব্যগীতি যেহেতু বাণী অর্থাৎ কথা নির্ভর, সে কারণে এ ধরনের সঙ্গীতেও বাণী এবং সুরের রূপ নির্মিত হয় কোনো না কোনো ভাব বা বক্তব্যকে অবলম্বন করে। সঙ্গীতের বাণীর মধ্যেও বিধৃত হয়ে থাকে আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা, চিন্তা-চেতনা, কোনো না কোনো বক্তব্য, এমনকি ভাব-দর্শন অর্থাৎ দার্শনিক অভিজ্ঞান বা তত্ত্ব-কথা। তবে, যে গান কথাশ্রয়ী নয় কিংবা কয়েকটি মাত্র কথা অর্থাৎ বাণী নির্ভর এবং প্রধানত সুরাশ্রয়ী– সেখানে ভাব-দর্শন বিধৃত নাও হতে পারে। রাগ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

গদ্য রচনা হোক, আর পদ্য কিংবা কাব্য রচনাই হোক, অথবা হোক সঙ্গীত অর্থাৎ কাব্যগীতি, সব ধরনের রচনাতেই ভাব বা বক্তব্য বিষয়কে অবলম্বন করেই রচনার সাহিত্য তথা শিল্পরূপ নির্মিত হয়। ভাব, ভাষা, আঙ্গিক– এই তিনটিই সাহিত্যের প্রধান ও অপরিহার্য অবলম্বন। কবিতা, গান, গল্প-উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের যে কোনো শাখা এবং রূপরীতির রচনার জন্যই ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক চাই। ভাবকে অবলম্বন এবং কেন্দ্র করেই ভাষা রূপ পায়, বক্তব্য বিধৃত হয় এবং কোন বিশেষ আঙ্গিক ও রূপরীতিতে ভাব বা বক্তব্য বিষয় মূর্ত হয়ে ওঠে। এ জন্যই সাহিত্যবেত্তারা বলেন, ভাব নেই অথচ রূপ আছে, সৃষ্টির জগতে এমনটি কল্পনা করা যায় না। সাহিত্যের আদিতম ও সুন্দরতম শাখা কবিতা ও গান অর্থাৎ কাব্যগীতি সম্পর্কে কথাটি আরও

www.pathagar.com

বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কবি ও গীতিকার তার আবেগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও স্বপ্ন-কল্পনাকে এবং কোনো না কোনো বক্তব্যকেও ভাষা দেন, ভাষা ও শব্দধ্বনির সহায়তায় নির্মিত উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে তাকে অভিব্যক্তিময় এবং আকর্ষণীয় করে তোলেন। কবিতা, গীতিকবিতা, কাব্যগীতি কিংবা সঙ্গীত যাই বলি না কেন, এর কোনোটিই শুধু শব্দ দিয়ে রচিত হয় না, এসব রচনার জন্যে ভাব এবং বক্তব্যেরও প্রয়োজন। হয়তো সে ভাব বা বক্তব্য অস্পষ্ট, অনভিব্যক্ত কিংবা জটিলতায় আক্রান্ত হতে পারে, হতে পারে ম্লান ও ধূসর। বাংলা সাহিত্যের তথা কবিতার যে আদিতম শাখা এবং প্রাচীনতম রূপ-রচনা– সেই 'চর্যাপদ' বা 'চর্যাগীতি' অর্থাৎ বৌদ্ধ গান ও 'দোঁহা' মূলত গীতিকবিতা বা সঙ্গীত আর তা এক ধরনের দুর্বোধ্য এবং দার্শনিকতাসঞ্জাত 'সান্ধ্য ভাষা'য় রচিত। সেই আদিকাল থেকে হাল আমল পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে কবি-গীতিকারদের– বিশেষত আউল-বাউল ও সাধকশ্রেণীর এবং আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী কবি-গীতিকারদের রচনায় অর্থাৎ তাদের রচনার বাণীতে দুর্বোধ্যতা, দুর্জ্ঞেয় জটিলতা এবং এক ধরনের অন্তঃগূঢ় রহস্যের সন্ধান মিলবে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবি এবং আধুনিক যুগের কবি হওয়া সত্ত্বেও, নিজেকে বলেছেন 'জন্ম-রোমান্টিক; আর 'মডার্ণ-বাউল'। নজরুল যে আধুনিক যুগের এবং মনের মানুষ হয়েও পরম রোমান্টিক ছিলেন, তাঁর মনে যে ছিল এক ধরনের আউল-বাউল ও উদাসীর অধিবাস, তা কে না জানেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে, কীর্তনে-ভজনে, বাউল-সঙ্গীতে, মারফতী মুর্শিদী ইত্যাদি বহু গানের বাণীতে দুর্জ্ঞেয় জটিলতা ও অন্তঃগূঢ় রহস্য অর্থাৎ এক ধরনের দর্শনের অতিভ ব্যঞ্জনার সাক্ষাৎ মেলে। দেহতত্ত্ব, প্রেম তত্ত্ব, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধারণা এবং সে সম্পর্কিত দর্শন অভিব্যক্তি পেয়েছে এক ধরনের জটিল রূপ-রচনারূপে, রূপক ও প্রতীকের আশ্রয়ে।

নজরুল-সঙ্গীতে ভাব-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উপরোক্ত দীর্ঘ পটভূমিকা ও পর্যালোচনার আবশ্যকতা অনুভূত হলো এই কারণে যে, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগ-স্রষ্টা কবি, অনন্যসাধারণ গীতিকার ও সুরকার এবং সঙ্গীত-স্রষ্টা-বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান এবং বিশেষভাবে তাঁর কাব্যগীতি বিচিত্র ভাব, বিষয় ও বক্তব্যকে অবলম্বন বা আশ্রয় করেই বিধৃত এবং শিল্পরূপের মহিমামণ্ডিত হয়েছে। মানব জীবনের এবং জগৎ-সংসারের, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনেরও প্রায় সর্ববিধ বিষয় তাঁর কবিতা ও অন্যান্য রচনায় যেমন, গানে অর্থাৎ কাব্যগীতিতেও তেমনি বিচিত্ররূপে বিধৃত হয়েছে। তিনি যেমন ভাব বা বক্তব্যকে অবলম্বন করে সহজ-সরল ভাষায় কবিতা ও গান রচনা করেছেন, অনেক রচনায় অনবদ্য শিল্পরূপ রচনার অর্থাৎ উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প ইত্যাদিতে সুশোভিত করার বদলে, সাধারণ সাদা-মাটা ভাষায় কবিতা-গান লিখেছেন, আবার তেমনি বহু কবিতা-গানে ভাব বা বক্তব্য প্রকাশ করেছেন শিল্পরূপের মহিমা ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে– অনন্যসাধারণ উপমা,

www.pathagar.com

উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প সুশোভিত করে, রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে, দার্শনিক ভাব-ব্যঞ্জনামণ্ডিত রূপে, অন্তঃগূঢ় রহস্যের আধারে। নজরুলের কবিতা-গানের বিশেষত তাঁর কাব্যগীতির পাঠক ও শ্রোতা মাত্রই উপলব্ধি করবেন যে, তাঁর অনেক সাদামাটা অর্থাৎ সহজ-সরল রচনার মধ্যে যেমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাণী, জীবন-জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বকথা এবং দার্শনিক অভিব্যঞ্জনা রয়েছে, তেমনি তার শিল্পরূপ-সমৃদ্ধ ও কাব্যগুণান্বিত এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত কবিতা-গানে-বিশেষত কাব্যগীতিতেও রয়েছে নানা উপমা-চিত্রকল্প এবং রূপক ও প্রতীকের আশ্রয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাণী, জীবন-জিজ্ঞাসা ও তত্ত্বকথা এবং দার্শনিক অনুধ্যান ও অভিব্যঞ্জনা। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে, বাংলা সাহিত্যে সবার্ধিক সংখ্যক গানের রচয়িতা এবং অনন্য-সাধারণ সুরকার ও সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুলের গান তো বটেই, তার বহু কবিতাও সুরারোপিত হয়ে গীত হয়েছে এবং অদ্যাবধি গীত হচ্ছে। তাঁর বহু বিখ্যাত গানই মূলত কবিতা এবং কবিতা হিসাবেই সে সবের সৃষ্টিও। রবীন্দ্রনাথের মতোই, নজরুলও মূলত গীতিকবি এবং গীতিকবিতার রচয়িতা, আর সে কারণেই বাংলা সাহিত্যের এই দুই মহান স্রষ্টা ও যুগন্ধর কবির রচিত গানে তো বটেই, দীর্ঘ কবিতায়ও সুরারোপ করা এবং তা গীত হওয়া সম্ভব হচ্ছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের নয়, আরও বহু গীতিকবির কবিতায়ই সেকালে এবং একালে সুরারোপিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সে সব কবিতা শিল্পীকণ্ঠে সঙ্গীতরূপে গীতও হচ্ছে।

নজরুল-সঙ্গীতে ভাব-দর্শন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত বিষয় ও তথ্যাদি উপস্থাপিত হলো এই কারণে যে, নজরুল-সঙ্গীতে ভাব-দর্শন তুলে ধরতে গিয়ে তাঁর অনেক সঙ্গীতের পাশাপাশি বহু কবিতারও শরণ নিতে হবে। কেননা, এসব রচনা কবিতা হিসাবে রচিত হলেও, সুরারোপিত হয়ে গানের বা গীতিকবিতার মর্যাদা লাভ করেছে, বহু কবিতা গান হিসাবেই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। নজরুলের যে বিপুল জনপ্রিয়তা তার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁর অনন্যসাধারণ ও 'প্রেরণা-সঞ্চারী' গান ও কবিতা এবং সে সব কবিতার ও গানের বাণী, অন্তর্নিহিত বক্তব্য এবং অনেকক্ষেত্রে বিধৃত ভাব-দর্শন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে বলে নেয়া আবশ্যক যে, কবিতা ও 'গান' অর্থাৎ গীতিকবিতা মূলত কথা ও বাণী-নির্ভর। এ কারণেই 'কাব্যগীতি' কথাটি ব্যবহারে অনেকের মধ্যে অনীহা থাকলেও, গানের বাণীকে 'কাব্যগীতি' বা 'গীতিকাব্য'ই বলতে হবে। কেননা, কাব্যগীতিতে বা গীতিকবিতায় সুরারোপ করলে তবেই তা 'সঙ্গীত' হয়। আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা, রূপ ও সৌন্দর্য এবং বহুবিধ বক্তব্য বিষয় বিধৃত করার জন্যই কবি নানা ভাষায়, ছন্দে, আঙ্গিকে ও রূপরীতিতে কবিতা রচনা করেন। কবি ও গীতিকার গানও রচনা করেন উপরোক্ত বিভিন্ন কারণেই। বস্তুত, কবিতা দীর্ঘ অবয়বে বিধৃত হয়, আর গান বা কাব্যগীতি বিধৃত হয় অনেক হ্রস্ব বা ক্ষুদ্র অবয়বে এবং অনেকটা সুনির্ধারিত আঙ্গিক ও রূপরীতিতে। তবে সব কবি ও গীতিকারই যে গান রচনায় সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতি হুবহু অনুসরণ করেন– এমন নয়। যারা

www.pathagar.com

একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত-স্রষ্টা– তারা গান বা সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক ও রূপরীতি বজায় রাখতে সর্বাধিক সক্ষম হন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গানে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে। বলা বাহুল্য, কবিতার দীর্ঘ অবয়বে বর্ণনার মাধ্যমে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের সহায়তায় এবং বিচিত্র স্তবক-বিন্যাসের মাধ্যমে বিভিন্ন বক্তব্য বা ভাব-দর্শন যত বিস্তারিতভাবে বলা যায়, গানের তথা 'সঙ্গীতের' সীমাবদ্ধ পরিসরে এবং নির্দিষ্ট আঙ্গিকে তা সম্ভব হয় না। নজরুল-সঙ্গীতে ভাব-দর্শন অনুসন্ধান করতে গেলে এ সত্য উদ্ভাসিত হয় যে, বিচিত্র বিষয়ে অসংখ্য অনবদ্য গানের রচয়িতা নজরুল তাঁর গানে যত না 'ভাব-দর্শন' বিধৃত করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাব-দর্শন অর্থাৎ দর্শন-সঞ্জাত বক্তব্য বা ভাবানুভূতি বিধৃত হয়েছে তাঁর কবিতায় এবং গদ্য রচনায়। মনে রাখতে হবে, বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী চেতনার অসামান্য রূপকার কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মূলত রোমান্টিক মানসপ্রবণতার অধিকারী এবং স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপায়নকারী। প্রেম ও প্রকৃতি এবং রূপ ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার নজরুল তার অসংখ্য কবিতা, গান ও অন্যান্য রচনায় ভাব বা বক্তব্য বিষয়ের প্রকাশ ঘটাতে এবং শিল্পরূপ নির্মাণে অসামান্য সৃজন-ক্ষমতা এবং শিল্প সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার অন্যদিকে নজরুল তাঁর বিদ্রোহী চেতনা, বিদ্রোহী মনোভাব, রাজনৈতিক, সামাজিক চিন্তা-ভাবনা, সংগ্রাম-সাধনা, স্বাধীনতার জন্যে লড়াই, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, জাতীয় নবজাগরণ, ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রীতি, বৈশ্বিক ভাবানুভূতি, হিন্দু-মুসলিম মিলন, রেনেসাঁর বাণী প্রচার, কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদির বাণীরূপ দিতে গিয়ে অনবদ্য রূপ রচনা করেছেন। তবুও, নিছক আবেগ-অনুভূতি ও স্বপ্ন-কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, সচেতনভাবে ও চিন্তা-চেতনায় এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে সে সব রচনা সৃষ্ট হওয়ায় তাতে বক্তব্যও বিধৃত হয়েছে।

নজরুল-সঙ্গীতে ভাব-দর্শন অনুসন্ধানের প্রয়োজনে উপরোক্ত তথ্যাদি জানা আবশ্যক। কেননা, নজরুলের বিচিত্র বিষয়ক এবং নানা আঙ্গিক ও রূপরীতির কবিতা-গানের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে, নানা রূপক-প্রতীকে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের আড়ালে নানা ভাব-দর্শন অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য, নজরুল রোমান্টিক মানসপ্রবণতার অধিকারী এবং বিদ্রোহী চেতনা সম্পন্ন কবি। বিদ্রোহী কবি হলেও, তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসে দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং আধ্যাত্মিকবোধে সমর্পিতচিত্ত কবি। মানবতাবাদী কবি নজরুল মানবমুক্তির লক্ষ্যে যেমন মানুষের ইহলৌকিক মুক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক মুক্তিসহ মানুষের জাগতিক সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করেছেন, তেমনি চেয়েছেন মানুষের পারলৌকিক মুক্তি এবং শান্তি ও কল্যাণ। নজরুল দার্শনিক কবি নন। কোনো দর্শন-তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক দর্শন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা তাঁর আরাধ্য ছিল না। দার্শনিক কবি না হলেও, নজরুলের কবিতা-গানে ও অন্যান্য রচনায় দার্শনিক

www.pathagar.com

উপলব্ধি ও চিন্তা-চেতনার পরিচয় আছে এবং দার্শনিক কবি হিসাবে নয়, বরং কবি-দার্শনিক হিসাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। নজরুলের জীবনবোধ ও দার্শনিক উপলব্ধি ও চিন্তা-চেতনায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, মানবীয় মহিমার উদ্বোধন এবং সাম্য, সত্য, ন্যায় এবং স্বাধীনতা তথা মানব মুক্তিই প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। মানবতাবাদই নজরুলের রচনায় এবং বিশেষভাবে তার গানের এক বড় ভাব-দর্শন। মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাস বলেছেন, 'শুন হে মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' 'বিদ্রোহী, কবিতায় নজরুল মানুষের মহিমা কীর্তন করেছেন, পরাধীনতা এবং অত্যাচার-নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার অবসানের কথা বলেছেন, এ সবের অবসানের লক্ষ্যে সংগ্রামের বজ্রকণ্ঠ ঘোষণা দিয়েছেন। নজরুলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে দার্শনিক উপলব্ধি ও অনুধ্যান সঞ্জাত এই উচ্চারণ ঃ 'গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' ধর্মীয় বিশ্বাসে এবং বিশেষভাবে ইসলামের মানবতাবাদী ও সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি নজরুল 'ঈশ্বর' শীর্ষক কবিতায় উচ্চারণ করেছেন, "সকলের মাঝে প্রকাশ তাহার,/ সকলের মাঝে তিনি/ আমারে দেখিয়া আমার অদেখা/ জন্মদাতারে চিনি।' নজরুল তাঁর অজস্র কবিতা-গানে স্রষ্টার ও সৃষ্টির তথা বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহতায়ালার এবং সৃষ্টির সেরা মানুষের মহিমা কীর্তন করেছেন দার্শনিক অভিব্যঞ্জনায়। আল্লাহর রাসূল এবং বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে এবং তাঁর শা'নে লিখেছেন অনেক কবিতা ও বহু 'না'ত'। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা কীর্তন করতে গিয়েই তিনি উচ্চারণ করেছেন, 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।' তিনি আরও বলেছেন, 'নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি/ সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।' মানবতাবাদী নজরুল 'মানবধর্মে' এবং মানব-দর্শনে আস্থাবান বলেই এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি তাঁর গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের কারণেই কবির উপরোক্ত দর্শন-সঞ্জাত উচ্চারণ। মনে রাখতে হবে, নজরুল ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তার কবিতা-গানে ও গদ্য রচনায় অনেক কষাঘাত হানলেও, তিনি নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার পরিপোষক ছিলেন না, কোনো ধর্মের বিরুদ্ধেই কখনো আঘাত হানেননি। নজরুল বলেছেন, 'প্রত্যেক ধর্মই সত্য-শাশ্বত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং কোন ধর্মকেই বিচার করতে গেলে তার মানুষের গড়া বাইরের বিধান-শৃঙ্খলা দিয়ে কখনো বিচার করবে না। ... তেমনি মানুষকে তার চির অমর আত্মাকে– তার সত্যকে বুঝতে হলে তার অন্তর দেউলে প্রবেশ করতে হবে ভাই। ... আমি তো আগেই বলেছি যে, সব ধর্মের ভিত্তি চিরন্তন সত্যের ওপর– সে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনও রয়েছে এবং অনন্তেও থাকবে। এই সত্যটাকে যখন মানি, এখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছা ফেলতে পারিস।' [সাহসিকার পত্র, বাঁধনহারা] নজরুলের উপরোক্ত ধর্মীয় ভাবধারা এবং ভাব-দর্শনের কারণেই ইসলাম ধর্মে গভীরভাবে আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও, ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ,

www.pathagar.com

ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ বিষয়ক কবিতা-গান রচনার পাশাপাশি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে কালীকীর্তন, দেবস্তুতি ইত্যাদি গান এবং হিন্দু ঐতিহ্যমূলক বহুবিধ কবিতা ও গান রচনা।

নজরুলের কবিতা-গানে কোনোরূপ দর্শন অর্থাৎ দার্শনিক তত্ত্বকথা কিংবা ভাব-দর্শন রয়েছে কিনা, এ প্রশ্ন তাঁর কবি-জীবনের প্রাথমিক পর্বেই উচ্চারিত হয়েছিল। নজরুলের কাব্যে উঁচু ভাব, দার্শনিক তত্ত্বকথা, বিশ্বানুভূতি, বিশ্বপ্রেম, অনন্তপ্রেম, আল্লাহপ্রেম, ঈশ্বরপ্রেম ইত্যাদি নেই বলেও কেউ কেউ অভিযোগ করেছিলেন। এসব অভিযোগ যে অর্থহীন সে কথাও কেউ কেউ নজরুল-কাব্য পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং কবির রচনা থেকে বহুল উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে ধরেছিলেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছিলেন, 'কাব্যের উচ্চতম আদর্শ অন্ত প্রেম হইলেও মনুষ্যপ্রেম, সমাজপ্রেম, দেশপ্রেম বিশ্বপ্রেম ইত্যাদিও সেই নিত্য সত্যেরই অন্তর্গত।' [দ্রঃ কাব্য সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান' আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মাসিক 'সওগাত' ১৩৩৩-৩৪] এই পরিপ্রেক্ষিতেই পরবর্তীকালে নজরুলের গীতিগ্রন্থ 'বুলবুল'-এর ভূমিকায় শ্রী অমলেন্দু দাশগুপ্ত লেখেন– "কবি নজরুলের লেখায় ফিলযফি নাই– একটা নালিশ তার সম্বন্ধে শোনা যায়। এ অভিযোগ সত্যি হইলে দুঃখ নাই– মিথ্যা হইলেও কথা থাকে না। তবু কথাটা না থাকাই উচিত। ... নজরুল কবি, ফিলযফি চাহিলে চলিবে কেন? ... নজরুলের প্রতি রক্তবিন্দুটি ভালবাসায় রক্ত রঙিন। ভালবাসা নিয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন নাই, ব্যথার গানই গাহিয়াছেন। ... নজরুল প্রেমিক কবি। এই ধূলোমাটির তুচ্ছ মানুষের প্রেমই তাঁর সম্পদ।" ['বুলবুল'-এর কবি'] নজরুলের কবিতায় ও গানে দার্শনিকতা তথা ভাব-দর্শন অর্থাৎ 'ফিলযফি' নেই বলে যারা আফসোস করেছেন বা করে থাকেন, তারা ভুলে যান যে, বিদ্রোহী কবি নজরুল মূলত রোমান্টিক কবি এবং প্রেমের কবি। মর্ত্যের মানুষের তথা পৃথিবীর মানব-মানবীর প্রেম এবং বিরহ-বেদনার কথা অজস্র সঙ্গীতে ফুটিয়ে তুললেও তিনি আধ্যাত্মিক প্রেমের তথা আল্লাহ ও ঈশ্বর প্রেমের কথাও লিখেছেন দার্শনিক অভিব্যঞ্জনায়। বিশ্বাসীর ও ভক্তিবাদীর দৃষ্টিতে নজরুল বলেছেন, 'বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার সকল অভিমান।' প্রেমের ব্যর্থতা থেকেই যে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার সূচনা এ কথাও কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন। প্রখ্যাত ছান্দসিক-কবি, সাহিত্য-সমালোচক ও নজরুল-গবেষক আবদুল কাদির লিখেছেন– "নজরুলের 'বাঁধনহারা'র মূলে ছিল প্রেমের ব্যর্থতা, সেই ব্যর্থতা শেষে রূপান্তরিত হয়েছিল বিদ্রোহে।" [নজরুল পরিচিতি, পৃঃ ৬-৭] নজরুল কেন বিদ্রোহী হয়েছেন, তাঁর বিদ্রোহের স্বরূপ কি তাও তিনি বলেছেন 'সাহসিকার পত্রে'। বলা আবশ্যক যে, প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা ও গভীর অনুভূতি থেকে কিংবা অন্য কোন সামাজিক অথবা বেদনা-দীর্ণতার কারণে নজরুল-কাব্যে, তার গানে ও গদ্য রচনায় বিদ্রোহী চেতনার

www.pathagar.com

জন্ম হলেও, তাঁর বিদ্রোহ কিংবা বিদ্রোহী চেতনা শুধু প্রেম, বিচ্ছেদ কিংবা বিরহ-বেদনার ও অভিমানের মধ্যে সীমায়িত থাকেনি, তা হয়ে ওঠে ব্যাপ্ত এবং পরাধীনতা, অন্যায়, অসত্য, অসুন্দর, শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়ন, কুসংস্কার, গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি সবকিছুর বিরুদ্ধেই নজরুল বিদ্রোহের বাণী দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। বস্তুত নজরুলের ভাব-দর্শনের বা দর্শন-জাত চিন্তার মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও মানব মুক্তি। নজরুল-সঙ্গীতে যে ভাব-দর্শন ভাষা পেয়েছে তাতে রয়েছে প্রকৃতিপ্রেম, নারীপ্রেম, মানব-মানবীর ভালোবাসা, বিরহ ও বিচ্ছেদ-বেদনা, মিলনের আকুতি, অন্তরের সুগভীর আর্তি। কিন্তু নজরুলের সব গানেই ভাব-দর্শন বা দার্শনিক ভাবনাজাত উচ্চারণ নেই, বহু গানে ভাষা পেয়েছে সাধারণ মানুষের প্রেম-বিরহ-ভালোবাসা এবং মিলনের আর্তি-আকুলতা। সব গানকেই নজরুল দার্শনিক চিন্তা-ভাবনায় ভারাক্রান্ত করেননি, তিনি দার্শনিক অভিজ্ঞান দিয়ে নয়, বরং রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ-অনুভূতি দিয়ে সঙ্গীতকে জারিত ও সঞ্জীবিত করেছেন। নজরুলের প্রকৃতি ও প্রেমের গান অসাধারণ রোমান্টিক, অনন্যসাধারণ শিল্পরূপ মণ্ডিত, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প সুশোভিত। নজরুলের গানের উদাহরণ ও উদ্ধৃতি দিয়ে তা তুলে ধরতে গেলে একটি বিরাট গ্রন্থই রচনা করতে হবে। তবুও সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয় যে, মানব-জীবনের এবং জগৎ-সংসারের খুব কম বিষয়ই আছে যা নজরুলের কবিতা-গানে বিধৃত হয়নি। শুধু প্রেমের কথা বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় যে, প্রেম ও না পাওয়ার বেদনা, বিরহ ও অভিমান নজরুলের কবিতা-গানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এ ধরনের অনেক গান মানব-মানবীর প্রেম ও বিরহ-বেদনার এলাকা অতিক্রম করে অনেকটা রূপক ও প্রতীকে অতীন্দ্রিয়তা বা আধ্যাত্মিকতায় পর্যবসিত হয়েছে, পরিণত হয়েছে অনেকটা ভাব-দর্শনে, এমনকি 'আল্লাহ' প্রেমে। নজরুল লাইলী-মজনুর প্রেম বিষয়ক যে অনন্যসাধারণ গান লিখেছেন, তা শুধু মর্ত্যের মানব-মানবীর প্রেমে সীমাবদ্ধ থাকেনি, আল্লাহ প্রেমে পর্যবসিত হয়েছে। নজরুলের উচ্চারণ ঃ 'লায়লী! লায়লী! ভাঙিয়োনা ধ্যান/ মজনুর এ মিনতি/ পাথর খুঁজিয়া ফিরিয়াছি প্রিয়া/ প্রেম-দরিয়ার কূলে/ খোদার পরশ– মানিক পেলাম কখন ভুলে/ সে মানিক যদি দেখ একবার/ মজনুরে তুমি চাহিবে না আর/ জুলেখা-ইয়ূসুফ লাজ মানে হেরি/ তাহার খুব সুরতী।" রূপক প্রতীকে সমৃদ্ধ দুয়েকটি গানের কয়েকটি পংক্তি নীচে উদ্ধৃত করছি ঃ

[১] 'কেন আসিলে ভালবাসিলে
দিলে না ধরা জীবনে যদি।
বিশাল চোখে মিশয়ে মরু
চাহিলে কেন গো বে-দরদী

www.pathagar.com

ওগো কত জনমের কত সে কাঁদন
করে হাহাকার বুকেরি তলায়
ওগো কত নিরাশায় কত অভিমান
ফেনায়ে ওঠে গভীর ব্যথায়।
মিলন হবে কোথায় সে কবে
কাঁদিছে সাগর স্মরিয়া নদী।'

[২] 'কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও
প্রিয়, মালা গাঁথা অকারণে
আমি চেয়েছিনু একটি কুসুম
সেই কথা পড়ে মনে ॥

তব ফুলবনে কত ছায়া দোলে
জুড়াইতে চেয়েছিনু তারি তলে
চাহিলে না ফিরে চ'লে গেলে ধীরে
ছায়া-ঢাকা অঙ্গনে
সেই কথা পড়ে মনে ॥

অঞ্জলি পাতি চেয়েছিনু
তব ভরা ঘটে ছিল বারি
শুষ্ক কণ্ঠে ফিরিয়া আসিনু
পিপাসিত পথচারী।

[৩] 'নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল ভরা ফুল
ফুল নেব, না অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল।

মালা যখন গাঁথ তখন পাওয়ার সাধ যে জাগে
মোর বিরহে কাঁদ যখন আরো ভাল লাগে।
পেয়ে তোমায় যদি হারাই
দূরে দূরে থাকি গো তাই
ফুল ফুটিয়ে যাই গো চলে চঞ্চল বুলবুল।"

নজরুলের লেখা প্রেম ও বিরহ-বেদনার এ রকম অজস্র গান থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়, যেখানে প্রেম ও বিরহ-বেদনা শুধু মানব-মানবীর প্রেমের ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, তা এক ধরনের ভাব-দর্শনে সর্বজনীনতায় ও সর্বকালিকতায় পরিব্যাপ্ত। বিরহ-বেদনা ও অভিমান নজরুল-সঙ্গীতের একটি প্রধান বিষয়। 'অদেখা সুন্দর',

www.pathagar.com

'চিরন্তন সুন্দর' ইত্যাদি বহুবিধ রোমান্টিক বিষয় নজরুলের গানে ভাব-দর্শনে রূপ লাভ করেছে। দু'য়েকটি গান থেকে আংশিক উদ্ধৃতিঃ

[১] 'আমি যার নূপুরের ছন্দ
বেনুকার সুর–
কে সেই সুন্দর কে।

আমি যার বিলাস যমুনা
বিরহ-বিধুর
কে সেই সুন্দর কে।'

[২] 'ও কে চলিছে বন-পথে একা
নূপুর পায় রণ ঝন ঝন।
তারি চপল চরণ আঘাতে
দুলিছে নদী, দোলে ফুল বন।

ঝরে ঝর ঝর গিরি-নির্ঝর
তার ছন্দ চুরি করে।
'এল সুন্দর। এল সুন্দর
বাজে বনের মর্মরে।'

উপরের উদ্ধৃত সঙ্গীতাংশে যে মানবীর অর্থাৎ 'সুন্দর'-এর প্রতীকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা নিছক দৃষ্টিগ্রাহ্য মানবী নয়, নজরুলের ভাব-দর্শনে সমৃদ্ধ এক অদৃশ্য ও অদেখা মানবী– যে সৃষ্টি ও সুন্দরের প্রতীক। নজরুলের 'গজল' গানে [যা ইরানী কবিদের কাব্যধারায় বিশেষত 'গজল'-এ অবগাহন ও অনুসৃতির ফল] প্রেমের আর্তি-আকুলতা ভাষা পেয়েছে। সৌন্দর্যরূপ বিকশিত হয়েছে, আবার সুফী ভাবধারার এবং দর্শন-তত্ত্বের মিশ্রণও ঘটেছে।

নজরুলের গানে (এবং তার বহু কবিতায়ও) আধ্যাত্মিকবোধ, পারলৌকিক চিন্তা-চেতনা, ইহলৌকিক বোধ ও ধ্যান-ধারণা, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা, সৃষ্টি-রহস্য, মানুষের নিয়তি ও চরম পরিণতি, জন্মান্তরবাদ, অজানা-লোক, সৃষ্টির বেদনা, আত্ম-দর্শন, মানব-জীবনের অনিত্যতা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নানাভাবে বিধৃত হয়েছে। ইসলামী আদর্শের উদ্দীপন, মুসলিম নব-জাগরণ, ইসলামী সাম্যবাদ যেমন তাঁর কবিতা-গানে বিধৃত হয়েছে, তেমনি রূপায়িত হয়েছে হিন্দু-ঐতিহ্য, নবজাগরণের বাণী, কালী কীর্তন, শ্যামা-সঙ্গীত, কৃষ্ণ-প্রেম, দেবস্তুতি। হাম্‌দ, না'ত, মারফতী, মুর্শিদী বাউল-সঙ্গীত, লোকগীতি ইত্যাদির পাশাপাশি নজরুল লিখেছেন হিন্দু ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মবাদী সঙ্গীত। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে,

www.pathagar.com

নজরুল মুসলিম ও হিন্দু ঐতিহ্যমূলক কবিতা ও সঙ্গীতে নিছক ভক্তিবাদী চিন্তা-চেতনা এবং ধ্যান-ধারণারই প্রতিফলন ঘটাননি, বহু রচনায় ইহলৌকিক চিন্তা-চেতনার, ভাবধারার এবং জীবন-দর্শনেরও প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এ আলোচনার এক স্থানে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারলৌকিক জীবনের মুক্তি ও কল্যাণ এবং চির শান্তির কথা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জীবনবোধ ও ভাব-দর্শনের কথা নজরুল তাঁর কবিতা-গানে বিধৃত করেছেন সত্য, কিন্তু তিনি ইহলৌকিক জীবনের অর্থাৎ জগৎ-সংসারের উন্নতি, সমৃদ্ধি, সুখ ও শান্তির তথা মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির কথাও বলেছেন– সেসব লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সংগ্রামের আহবানও জানিয়েছেন। এখানে বিষয়ানুসারে কিছু রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো ঃ

১। ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয়-নতুন সৃজন-বেদন
আসছে নবীন জীবন হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!'

২। 'ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
[প্রলয়োল্লাস]

নজরুল তার কবি দৃষ্টিতে এবং দার্শনিক অনুধ্যানে ধ্বংস আর সৃষ্টিকে পারস্পরিক সম্পর্কিতরূপে একই আধারে প্রত্যক্ষ করেছেন, নতুনের সৃজন-বেদনাই পুরাতনকে ধ্বংস করে নবীনের জন্ম দেয়। অসুন্দরকে ছেদন করে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ঘটায়; নজরুল নেহায়েত দার্শনিক নন। তিনি কবি-শিল্পী ও স্রষ্টা, শুধু ভাঙা নয়, গড়াই তাঁর জীবন-দর্শন। শুধু ভাঙার গানে নয়, প্রেমের কবিতায়ও নজরুল শক্তিমত্ততার কথা বলেছেন, তাঁর দৃষ্টিতে ভালোবাসা নিতান্ত মালা নয়, খর তরবারিও। নজরুলের এক হাতে যে 'বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তুর্য'– এই সত্য ও ভাবানুভূতির এবং জীবন-দর্শনের পরিচয় আছে তাঁর প্রেমের কবিতা-গানে। অনেকক্ষেত্রে ভাব-দর্শনের দুই ধারা একাকারও হয়ে গেছে। কেননা, মানুষের মন 'ওয়াটার-টাইট কম্পার্টমেন্ট' (Water-Tight Compartment) এ বিভক্ত নয়। এ কারণেই তিনি প্রেমিক তিনি আবার সংগ্রামী চিত্তের অধিকারীও/ নজরুলের ভাব-দর্শনের– বিশেষত প্রেমিক ও সংগ্রামী সত্তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে অনেক রচনায় ঃ তাঁর উক্তি ঃ

১। 'প্রেয়সীর কণ্ঠ কভু এই ভুজ বাহু জড়াবে না আর,
উপেক্ষিত আমার এ ভালোবাসা মালা নয়, খর তরবার।'

২। 'ক্ষুদ্র প্রেমের শুদ্রামি ছাড়,
ধর খ্যাপা তোর অগ্নি প্রাণ
আয়রে আবার আমার চির-তিক্ত-প্রাণ।'

www.pathagar.com

শুধু প্রেমের কবিতা-গানে নয়, সত্য, সাম্য, স্বাধীনতা, আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনায় জারিত কবিতা-গানেও নজরুলের জীবনবোধ ও দর্শন বাঙময়। নজরুলের যত সংগ্রাম-সাধনা, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা– সবই চিরশান্তি, কল্যাণ ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠার জন্য। নিতান্ত রোমান্টিকতায় নয়, জীবন-দর্শন-সঞ্জাত জীবনানুভূতিতেই তিনি প্রেমকে দেখেছেন।

সত্য, সাম্য, স্বাধীনতা, আত্মশক্তি

১। শৌর্য, ধৈর্য মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও।
[উদ্বোধন, গান]

২। বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়।
বল, মাভৈঃ জয় সত্যের জয়।
[অভয় মন্ত্র]

৩। এস বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর।
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলি-ঝলক ন্যায় অসির।
[আত্মশক্তি, গান]

৪। গাও আদিম স্বাধীন প্রাণ
আত্মা জাগিলে বিধাতা চান।
কে ভগবান?
আত্ম জ্ঞান।
[আত্মশক্তি, গান]

৫। টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া তলে।
স্বাধীন-চিত জয়! জয় হে !!
[বন্দী-বন্দনা গান]

৬। মুক্ত বিশ্বে কে আর অধীন? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই
[বন্দী-গান, গান]

৭। মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল
[শিকল-পরা ছল, গান]

৮। বল জয় সত্যের জয়
আসে ভৈরব-বরাভয়
শোন অভয় ঐ রথ- ঘর্ষর রে
[যুগান্তরের গান]

www.pathagar.com

সত্য, ন্যায়, স্বাধীনতা ও আত্মশক্তির উদ্বোধনে উচ্চকিত ও প্রাণিত কবি উপরোক্ত রচনাসমূহেও তাঁর বিশ্বাসের কথা, দার্শনিক প্রত্যয়ের কথা নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। আদর্শবাদিতায় উজ্জীবিত হয়েছেন, মানব মনে বিশেষত দেশ ও জাতির মনে তা সঞ্চারিত করেছেন।

অসাম্প্রদায়িকতা, জাতিত্ববোধ ও মানবতাবাদী চিন্তা

১। সকল জাতই সৃষ্টি যে তাঁর, এ বিশ্ব-মায়ের বিশ্ব-ঘর
মায়ের ছেলে সবই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্ম-পর
[জাতের নামে বজ্জাতি, গান]

২। পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর
বিধির বিধান সত্য হোক।
বিধির বিধান সত্য হোক।
[সত্য-মন্ত্র গান]
সত্যের জয় হবেই হবে
আজ নয় কাল মিলবে ফল [ঐ]

৩। শাশ্বত যে সত্য তারি ভুবন ভরে বাজলো ভেরী
অসত্য আজ নিজের বিষেই মরলো ও তার নাইক দেরী
[পাগল পথিক, গান]

৪। শীতের শ্বাসেরে বিদ্রুপ করি ফোটে কুসুম
[রক্ত পতাকার গান]
চির বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন [ঐ]

৫। নবভিত্তি 'পরে
নবী নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে [ঐ]

এ সত্য সুস্পষ্ট যে, নজরুল দার্শনিক কবি না হলেও, তিনি যে কবি-দার্শনিক অর্থাৎ তাঁর কবিতা-গানে যে দার্শনিকভাবের অভিব্যক্তি ও অভিব্যঞ্জনা রয়েছে, তা উপরোক্ত রচনাসমূহের উদ্ধৃতাংশ থেকেই স্পষ্ট। নজরুল ছিলেন স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার, সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের অভিসারী এবং স্বাধীনতাকামী, স্বদেশপ্রেমিক ও স্বজাতি প্রেমিক এক মহান মানবতাবাদী কবি। অজস্র কবিতা-গানে তিনি তাঁর এই সব চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ রূপায়িত করেছেন, অন্যকে আহ্বান জানিয়েছেন সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের, স্বাধীনতা অর্জনের পথে, সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হওয়ার পথে। নজরুল এ ব্যাপারে দৃঢ়-প্রত্যয়ী ছিলেন যে, মানুষ শুধু আল্লাহর সৃষ্ট 'সেরা জীবই' নয়, মানুষের মধ্যে রয়েছে অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনা। এই বিশ্বাস এবং দার্শনিক প্রত্যয় থেকেই বিদ্রোহী নজরুল উচ্চারণ করেছিলেন দার্শনিক ভাবনা-সঞ্জাত বক্তব্য ঃ

www.pathagar.com

[১] 'বল বীর চির-উন্নত মম শির
শির নেহারি নত শির ওই
শিখির হিমাদ্রীর।'
[বিদ্রোহী]

[২] 'যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই
করব সেথাই বিদ্রোহ!
ধামাধরা! জামা ধরা
মরণ-ভীতু চুপ রহো।
আমরা জানি সোজা কথা,
পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ।
এই দুলালুম বিজয় নিশান,
মরতে আছি মরব শেষ।
[বিদ্রোহীর বাণী]

বিদ্রোহী চিন্তা-চেতনার অধিকারী এবং ভাব-দর্শনে উদ্বুদ্ধ মানবতাবাদী কবি নজরুল মানুষের মহত্তে ও শ্রেষ্ঠত্বে ছিলেন বিশ্বাসী এবং তিনি ছিলেন স্বজাতি প্রেমিক আর স্বদেশ প্রেমিক হয়েও, বিশ্বপ্রেমিক এবং বিশ্বামানবের কল্যাণকামী। স্বদেশের পরাধীন, নির্যাতিত-নিপীড়িত, শোষিত বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্যে তিনি যেমন লেখনীকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন, তেমনি ইসলামের সাম্যবাদী নীতি ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ কবি সারা বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে নব-উত্থানের জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন। বস্তুত নজরুলের জীবন-দর্শন তথা ভাব-দর্শনই ছিল মানবতার মুক্তি এবং উন্নত, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ে তোলা। নজরুলের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে এই উচ্চারণ,

'মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।
[বিদ্রোহী]

নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা ছাড়াও, বিদ্রোহী চেতনা- সঞ্জাত অনেক কবিতা এবং গান রচনা করেছেন। এমনকি তাঁর রোমান্টিকতা-আশ্রিত কবিতা-গানে এবং প্রেমের কবিতায় আর গানেও বিদ্রোহী চেতনার ও ভাব-দর্শনের ছায়াপাত

www.pathagar.com

ঘটেছে। নজরুলের স্বদেশ- প্রেমমূলক ও দেশাত্মবোধক এবং বিদ্রোহী চেতনা-সম্পন্ন কবিতায় ও গানে বিশ শতকের বিশের দশকে কুমিল্লায় ও কুমিল্লার দৌলতপুরে অবস্থান এবং নার্গিস ও প্রমীলার সংগে প্রেম কতটা প্রভাব ফেলেছে তা ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রচিত নজরুলের 'বিজয়িনী' (প্রমীলার উদ্দেশ্যে রচিত) শীর্ষক কাব্যগীতির অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট হবে ঃ

'হে মোর রানী তোমার কাছে হার মানি
আজ শেষে
আমার বিজয়--কেতন লুটায় তোমার
চরণ তলে এসে।
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত রথের চূড়ে,
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে।'

উদ্ধৃত কাব্যগীতির অংশ বিশেষে লক্ষণীয় যে, নজরুল তাঁর কবি-সত্তা ও কবি ব্যক্তিত্বকে 'বিদ্রোহী' অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখ্য, ১৯২১ সালে কুমিল্লায় ও দৌলতপুরে অবস্থান এবং নার্গিস ও প্রমীলার সঙ্গে প্রেমের আগে নজরুলের কোনো কবিতা-গানে 'বিদ্রোহী' শব্দের ব্যবহার ও চেতনার উল্লেখ সম্ভবত পাওয়া যায় না। কুমিল্লার দৌলতপুরে অবস্থানকালেই ১৯২১ সালে নজরুল নার্গির্স-এর প্রেম ও পরিণয় হয়, এবং তা পরে (কারো কারো মতে বিবাহের রাতেই) বিচ্ছেদে পরিণত হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের সুদীর্ঘ পনেরো বছর পরে নজরুল এক পত্রে (১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই) নার্গিসকে লেখেন, 'আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা। কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি, তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশ মানিক না দিলে আমি 'অগ্নিবীণা' বাজাতে পারতাম না। আমি 'ধূমকেতুর' বিস্ময় নিয়ে আবির্ভূত হতে পারতাম না।' উল্লেখ্য, নজরুল নার্গিসের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালের জুন মাসে, আর নজরুলের 'বিদ্রোহী' রচিত ও প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে, 'ধূমকেতু' পত্রিকাও প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের আগস্ট মাসে। নজরুলের কবিতা-গানে বিদ্রোহী ও সংগ্রামী চেতনার পাশাপাশি প্রেমিক ও বিরহী হৃদয়ের, বিরহ বেদনায় বিধুর চিত্তের পরিচয়ও মেলে। উল্লেখ্য, নার্গিস ও প্রমীলার প্রতি নজরুলের গভীর ভালোবাসা (নার্গিসের সঙ্গে প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, প্রমীলার সঙ্গে ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিবাহ স্থায়ী হয়) যেমন তাঁর অনেক প্রেমের কবিতা-গানের উৎস হয়েছে, তেমনি নজরুলকে স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা-প্রীতি ও বিদ্রোহী চেতনায় উদ্বোধিত হতে অনুপ্রাণিত করেছে। বস্তুত নজরুল

www.pathagar.com

যে অজস্র প্রেমের গান, বিরহ-বেদনার গান এবং স্বদেশপ্রেমের গান রচনা করেছেন, তার মূলে বড় প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে বিরহ-বেদনা ও বঞ্চনার অভিজ্ঞতা। রোমান্টিক মানস-প্রবণতার অধিকারী ও প্রেমিক চিত্ত নজরুল বিদ্রোহী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যেমন স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রেম ও মানবপ্রেমের গান রচনা করেছেন, তেমনি প্রেমিক ও অভিমানী কবি প্রেমের গান, মানব-মানবীর প্রেম এবং বিরহ-বেদনার গানও রচনা করেছেন। বস্তুত নজরুল-সঙ্গীতের যে ভাব-দর্শন তাতে বিচিত্র বিষয়ের এমনকি বিপরীতধর্মী বিষয়েরও সন্নিপাত ঘটেছে।

মানবতাবাদই নজরুলের জীবন-দর্শনের মূল কথা, তাঁর সঙ্গীতে যে ভাব-দর্শন তাও মানব জীবনের বিচিত্র বিষয়কে ধারণ করেই। সন্দেহ নেই যে, নজরুলের কবিতা-গানে এবং বিশেষভাবে তাঁর গানে স্বপ্ন-কল্পনার ও আবেগ-অনুভূতির প্রশ্রয় আছে, অনেক রচনায় অত্যুচ্চ কল্পনা-প্রতিভারও প্রশ্রয় ঘটেছে। বাস্তববাদী ও সমাজ-সচেতন সংগ্রামী কবি বস্তুতান্ত্রিকতার বদলে ধ্যান-কল্পনা এবং আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতি তথা জীবন-দর্শনকেই অধিক মূল্য দিয়েছেন। বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি-মাহাত্ম্য এবং লীলাখেলা সম্পর্কে অত্যুচ্চ কবি কল্পনায় এবং প্রতীকরূপে তিনি লিখেছেন, 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে/ প্রলয়-সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে, প্রভু নিরজনে।' এ আলোচনায় একস্থানে আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, নজরুল সাম্যবাদ (বিশেষত ইসলামী সাম্যবাদে) বিশ্বাসী হলেও তিনি কমিউনিজমে (Communism) বা সমূহবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিশ্বজনীন মানবধর্ম ইসলাম ও ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তিঃ গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই নজরুলের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টানসহ সর্বমানবের জন্য কাব্য রচনা, গান লেখা। ইসলামের আদর্শ, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও শিক্ষা-সংক্রান্ত কবিতা-গান রচনার পাশাপাশি তিনি হিন্দু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক কবিতা এবং শ্যামা-সঙ্গীত, কালী-কীর্তন ও দেবস্তুতি রচনা করেছেন, তাও আধ্যাত্মিক দর্শন এবং মানবতাবাদী ধ্যান-ধারনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, সংস্কার এবং ভেদ-বিভেদ ভেঙে দেয়ার লক্ষ্যে। হিন্দু-মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মিলন ঘটিয়ে অজস্র গান ও কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন নজরুল। তিনি বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এই পোড়া দেশের কিছুই হবে না, এও আমি জানি'। নজরুলের জীবন-দর্শনে এবং ভাব-দর্শনেও যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে তাহলো মানবতাবাদী শিক্ষা। মানবতাবাদী কবি নজরুল তাই উচ্চারণ করেছেন, 'কেবল মুসলমানের লাগিয়া আসেনিক ইসলাম/ সত্য যে চায় আল্লায় মানে মুসলিম তারি নাম।' ডক্টর আহমদ শরীফের ভাষায়, "ইসলামের মানবতা ও সমাজ-সংজ্ঞা তার আদর্শের সম্পূর্ণ অনুকূল বলেই মানুষ নির্বিশেষের মিলন পীঠ, কা'বার ছবি তার বক্ষে অঙ্কিত, মানবতা ও সাম্যের বাণী-বাহক হযরত মুহাম্মদের (স) নাম তার 'জপমালা'; এই জন্যেই মর্যাদার পূজারী

www.pathagar.com

উন্নত শির কবির হৃদয়ে কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' আন্দোলন জাগায়। তাঁর এই ইসলাম প্রীতি ধার্মিকতা প্রসূত নয়, মানবতা ও ব্যক্তি নিষ্ঠাজাত। ধর্মপ্রাণতা নয়, আদর্শানুগত্য। তাঁর আদর্শের সাধনার অনুকূল উপাদান তিনি যেখানেই পেয়েছেন গ্রহণ করেছেন, তাই হিন্দু দেব-দেবী, পুরান প্রভৃতিও তাঁর কাব্য সাধনায় ও আদর্শানুসরণে প্রেরণা দিয়েছে, আশা জুগিয়েছে, ভাষা জুগিয়েছে। খলিফা 'উমর' তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন শুধু ধার্মিক বলে নয়, ইসলাম ও মুসলমানের ভাগ্য বিধাতা বলেও নন, মানুষকে ভালোবেসেছেন বলে। ... এইরূপে 'আমপারা' 'মহররম' 'ফাতেহা-ইয়াজদহম' 'মরু-ভাস্কর' প্রভৃতি রচনায় কবি ইসলামের ও হযরতের মানবতার দিকটি প্রস্ফুটিত করেছেন। ইসলাম ও রসূলের জীবনের এই সৌন্দর্য ও শিক্ষায় তিনি মুগ্ধ ছিলেন। নিজের জীবনে ও সমাজে এই শিক্ষার বাস্তব রূপায়নেই তাঁর সাধনা নিয়োজিত ছিল।" [নজরুল সাহিত্য, পৃঃ ৯২-৯৫]

সন্দেহ নেই যে, নজরুল মানবতাবাদের শিক্ষা নিয়েছিলেন ইসলামের চিরন্তন আদর্শ থেকে। কালী-কীর্তন, শ্যামা-সঙ্গীত, দেবস্তুতি তিনি রচনা করেছিলেন হিন্দু-সমাজের আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা ও ভক্তিবাদিতা প্রকাশের জন্য, পারলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে এবং অন্তর্নিহিত শক্তির নব-উদ্বোধনের জন্য। নজরুলের রচিত কালী-কীর্তন, শ্যামা-সঙ্গীত, দেবস্তুতি ইত্যাদি সর্বত্রই শুধু আধ্যাত্মিকতাবাদের এবং পারলৌকিক মুক্তি চিন্তার রচনা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তিনি আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভক্তিবাদের মোড়কে এবং হিন্দু ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পুরান থেকে উপাদান নিয়ে নানা রূপকে ও প্রতীকে বর্তমানকালের পটে শক্তির নব-উদ্বোধনের বাণী উচ্চারণ করেছেন, পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির লক্ষ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি উচ্চারণ করেছেন যে, মুক্ত, স্বাধীন ও সত্যকে কেউ বন্দী করতে পারে না। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে 'মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়।' নজরুলের 'রক্তাম্বর-ধারিনী মা', 'আগমনী', 'আনন্দময়ীর আগমনে' ইত্যাদি হিন্দু ঐতিহ্যমূলক কবিতা-গান ভক্তিবাদী ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন বা ভাব-দর্শন নয়, সে সব রচনায় রয়েছে রূপক ও প্রতীকের আড়ালে হিন্দু সমাজের নবজাগরণের আহ্বান, শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে– বিশেষত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক। ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যমূলক বহু কবিতা-গানেও নজরুল প্রতীক ও রূপকের মাধ্যমে এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে বৃটিশ পরাধীনতার বিরুদ্ধে, শাসন-শোষণ ও অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের নবজাগরণের এবং সংগ্রামের আহ্বান ধ্বনিত করেছেন। নজরুলের 'মোহররম', 'কোরবানী', 'কামাল পাশা', 'শাত-ইল-আরব' ইত্যাদি কবিতা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। নজরুলের কবিতায় এবং বহু গানে স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা প্রীতি এবং পরাধীনতা থেকে মুক্তির আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। নজরুলের চিন্তা-চেতনায় ও দার্শনিক অনুজ্ঞায় এবং তাঁর কাব্য-সঙ্গীতের দর্শনেও সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও স্বাধীনতা প্রীতি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি

www.pathagar.com

উচ্চারণ করেছেন ঃ "জয় হে বন্ধন-মৃত্যু ভয় হর!/মুক্তিকামী জয়! স্বাধীনচিত্ত জয়! হে'। তিনি আন্তরিক প্রার্থনা উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ 'দাও তেজ, দাও মুক্তিগরব/নির্বীষ এ তেজঃসূর্যে/দীপ্ত কর হে বহ্নি-বীর্যে/ শৌর্য ধৈর্য্য মহাপ্রাণ দাও/ দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব।' তাঁর কণ্ঠে আরও ধ্বনিত হয়েছে ঃ 'মোরা অসি বুকে ধরি/ হাসিমুখে মরি/ 'জয় স্বাধীনতা' গাই' (রণভেরী) স্বাধীনতাকামী নজরুল জানতেন যে, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ ছাড়া স্বাধীনতা সহজে অর্জিত হয় না, শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়নের অবসান এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যও চাই নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রমনের সংকল্প ও শক্তি। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' পাড়ি দেবার শক্তি ও সাহস। নজরুলের কবিতায় ও বহু গানে এই চিন্তা-চেতনা এবং ভাব-দর্শন ভাষা পেয়েছে। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন ঃ

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে!
লংঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার ॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানেনা সন্তরণ–
কান্ডারী আজি দেখিব তোমার মাতৃ মুক্তি পণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম– ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন,
কাণ্ডারী, বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র ॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান–
আসি' অলখ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান!
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ,
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ॥

নজরুল সঙ্গীতের ভাব-দর্শন ' কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' শীর্ষক উপরোক্ত কাব্যাংশেও বিধৃত। নজরুল যে মানবতাবাদী কবি, বিদ্রোহী চেতনা সম্পন্ন সংগ্রামী কবি, স্বাধীনতার জন্যে যে তাঁর অপরিসীম অনুরাগ এবং তিনি যে মানব-মিলনের ও মহান ঐক্যের বাণীবাহক, উপরোক্ত কাব্যাংশেও তা স্পষ্ট। নজরুল তাঁর সঙ্গীতে এবং কবিতায় সম্পূর্ণ নতুন কোনো ভাব-দর্শন বা তত্ত্বকথা উপস্থাপন করেননি, কিন্তু জীবন ও জগতের বহুবিধ বিষয়কে, মানবীয় চিন্তা-চেতনা ও আধ্যাত্মিক ভাবানুভূতিকে, মানবতাবাদকে নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত এবং রূপায়িত করেছেন।

যদিও নজরুল বলেছেন যে, 'বড় কথা বড় ভাব আসে না ক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে। অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।'

কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ অর্থাৎ আশা। ইংরেজ কবির ভাষায় ঃ Hopes' Spring is eternal in human breast, অর্থাৎ মানুষের বুকে

www.pathagar.com

আশার বসন্ত চিরন্তন। বস্তুত আশাবাদ নিয়েই মানুষ এই রৌদ্র-ছায়াময় পৃথিবীতে সুখ-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় অধিবাস করে, প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট নানা দুর্যোগের মোকাবিলা করেই মানুষকে বাঁচতে হয়, বাঁচার সংগ্রাম করতে হয়। নজরুল তাঁর নিজের বাস্তব জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং অন্যের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও সুখ-দুঃখময় জীবন-জগৎকে চিনতে পেরেছিলেন, তাঁর ভাব-দর্শনেও এই অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়ে আছে। দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে অশৈশব পরিচিত নজরুল 'দারিদ্র্য' কবিতায় এক ধরনের দার্শনিক– অনুধ্যানে উচ্চারণ করেছেন, 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান/তুমি মোরে দানিয়াছ খৃষ্টের সম্মান/ কন্টক-মুকুট শোভা!–দিয়াছ তাপস/ অসঙ্কোচ প্রকাশের দূরন্ত সাহস,/উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি! বাণী ক্ষুরধার/ বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার।' 'দারিদ্র্যের' মহিমা-কীর্তন নয়, বরং এ কবিতায় এমন এক জীবন-দর্শন বিধৃত হয়েছে যা সংগ্রামী-চেতনা সম্পন্ন এবং দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের প্রতি মমতাবোধে জারিত। নজরুল চির-সংগ্রামী এবং আশাবাদিতায় উজ্জীবিত হলেও, তিনিও উপলব্ধি করেছেন এই জীবন– সত্য যে, 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়/ আজিকে যে রাজাধিরাজ/ কাল সে ভিক্ষা চায়।' কবির ভাব-দর্শনে এবং তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতালব্ধ দার্শনিক অনুধ্যানে তিনি এই সত্যও উচ্চারণ করেছেন যে, 'এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে এই তো নদীর খেলা/ সকালবেলা আমীর রে ভাই/ ফকির সন্ধ্যা বেলা।' নজরুল তাঁর এই সব বিখ্যাত গানে এবং আরও বহু রচনায় রূপকে-প্রতীকে, নানা উপমায় মানব জীবনের নানা রূপ, পরিণতি, নিয়তির খেলা এবং অনিত্যতার দর্শনই ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুত, জীবন-জগৎ এবং ইহলোক-পরলোক নিয়েই নজরুলের বিভিন্ন গদ্য-পদ্য রচনায় এবং সঙ্গীতেও নানা ভাব-দর্শন বিধৃত, কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো বা পরোক্ষরূপে, সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে।

www.pathagar.com

টি.এস. এলিয়টের কাব্যে আধুনিক মানুষের সংকট

ড. সদরুদ্দিন আহমেদ

১৯১৭ সাল। বোনামী ডব্রী যিনি পরে সমালোচক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন প্যালেস্টাইন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আলেকজান্ড্রিয়াতে এসেছেন ছুটিভোগ করতে। সেখানে ঔপন্যাসিক ই.এম. ফস্টারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ফস্টার তার হাতে একটি কবিতা তুলে দিয়ে বললেন ঃ "I don't know if you care for this sort of thing." এটি ছিল টি.এস. এলিয়টের The Love Song of J. Alfred Prufrock. কবিতাটি বোনামী ডব্রীকে উত্তেজিত করেছিল। তার নিজের ভাষা ঃ "Care for it! It excited me. The actuality of the whole thing, yet expressed in considerable musical terms, struck me as belonging to life." (T.S Eliot : The man and His Work, edited by Allen Tate, p. 65.) 'প্রুফ্রক' প্রায় সকল পাঠকের মনে অনুরূপ সাড়া জাগায়। তার অন্যতম কারণ ডব্রী নিজেই উল্লেখ করেছেন ঃ কবিতাটিতে বাস্তবতা আছে, জীবন ঘনিষ্ঠতা আছে। এই বাস্তবতা, এই জীবন ঘনিষ্ঠতা এলিয়টের কাব্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। তার পূর্বসূরীদের কাব্য–জর্জিয়ান কাব্য– ছিল জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন (poetry of escape)। দূর দেশের রোমান্স, সমুদ্র, পল্লী প্রকৃতি, পাখির গান, চাঁদের আলো ইত্যাদি ছিল সে কাব্যের বিষয়বস্তু। এসব চিরাচরিত বিষয়বস্তুর পরিবর্তে এলিয়ট তার কাব্যে আধুনিক জীবনের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেছেন নতুন আঙ্গিকে, নতুন বাগধারায়। এর মধ্যে আধুনিক মানুষের সংকট প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গ নিয়েই।

'প্রুফ্রক' কবিতাতেই আধুনিক মানুষের সংকটের প্রথম অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। এটি একটি ড্রামাটিক মনোলগ (dramatic monologue)। এই জাতীয় কবিতায় সংকট মুহূর্তেই একজন 'চরিত্র' নিজেকে ব্যক্ত করে। এলিয়টের কবিতাটিতে প্রুফ্রক নামের একজন চরিত্র তার প্রেমের কথা বলছে। আসলে তার বক্তব্যে যেটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা প্রেম নয়, তার ব্যক্তিগত চরিত্র থেকে উদ্ভূত মানসিক সংকট। কবির উপস্থাপনায় সেটা ব্যক্তিগত সীমানা অতিক্রম করে বৃহত্তর ব্যাঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, আধুনিক মানুষের সংকটের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ড্রামাটিক মনোলগে একটা কাহিনী উপাদান থাকে কিন্তু 'প্রুফ্রক' কবিতার কাহিনী উপাদন সামান্যই এবং তাও সরলরেখায় এগোয়নি। যেটুকু উদ্ধার করা যায় তা এই ঃ এক সন্ধ্যায় প্রুফ্রক একটি নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার গন্তব্যস্থল একটি

www.pathagar.com

কক্ষ যেখানে মহিলারা যাওয়া আসা করতে করতে শিল্পী মাইকেল এনজেলো সম্বন্ধে আলোচনা করছে। কিন্তু পরক্ষণে সে সিদ্ধান্ত স্থগিত করে দেয়। তবে ঐ কক্ষের মহিলাদের কথা ভাবতে থাকে। সে তাদের কাছে একটা overwhelming question উত্থাপন করতে চায়। কিন্তু তার সাহস হয় না। মহিলারা হয়তো তার চেহারা নিয়ে কটাক্ষ করবে। তাছাড়া, সে তাদের ভাল করে চেনে। দিনের পর দিন সে সেখানে গিয়েছে। চা, কফি খেয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সে কেমন করে শুরু করবে? তারা হয়তো তার কথা বুঝবে না। অবশেষে সে সাগর তীরে গিয়ে বিচরণ করতে চায়; রোমান্টিক কল্পনায় অবগাহন করতে চায়।

প্রুফ্রক তার 'প্রেমের গানের' শুরুতে যে সব চিত্রকল্প ব্যবহার করেছে তাতে তার অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ধ্যা তার কাছে অস্ত্রপচারের টেবিলে শায়িত সংজ্ঞাহীন রোগীর মত। যে পথ ধরে সে যেতে চেয়েছিল তা নির্জন। সেখানে আছে সস্তা হোটেল, নোংরা রেস্টুরেন্ট। শিকড়হীন মানুষ সেখানে অশান্ত রাত্রি যাপন করে। কুয়াশাকে সে ড্রেনের উপর লাফালাফি করে ঘুমিয়ে পড়া বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করেছে। সে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আবার তা স্থগিত করছে। স্পষ্টত মহিলাদের মুখোমুখি হতে সে অস্বস্তিবোধ করছে। তার দৈহিক ত্রুটি (তার মাথায় টাক, হাত-পা সরু) নিয়ে সে বিব্রত; মহিলাদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া নিয়ে সে বিচলিত। বস্তুত প্রুফ্রককে একজন উদ্বিগ্ন স্নায়ু বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না।

কবিতার কাহিনী উপাদান থেকে মনে হয় প্রুফ্রকের ব্যাপারটা সামান্যই কিন্তু তবু তার মনে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। মহিলাদেরকে সে যে কথা বলতে চায় সেটা তার কাছে প্রকাণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। 'Overwhelming question', 'disturbing the universe' ইত্যাদি phrase তার মনের তীব্র আবেগের বহিঃপ্রকাশ। এই আবেগের তীব্রতার কারণ কি? আসলে সে অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই ধরনের মানুষের মনে কোন উপলক্ষ্য ছাড়াই বা উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করে তীব্র আবেগ সৃষ্টি হয়। এলিয়ট তার Hamlet প্রবন্ধে এই কথাই বলেছেন ঃ "The intense feeling, ecstatic or terrible, without an object or exceeding its object, is something every person of sensibility has known." প্রুফ্রকের আবেগ তার উপলক্ষ্যকে ছাড়িয়ে গেছে। এটা সংবেদনশীল মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য। লক্ষণীয় যে সে যা বলতে চায় তা ঠিকমত বলতে পারছে না। সে নানা কথার অবতারণা করছে। এক পর্যায়ে সে স্বীকার করেছে ঃ "It is impossible to say just what I mean." যোগাযোগ স্থাপনে এই অক্ষমতা, এই ব্যর্থতা সংবেদনশীলতার আর একটি বৈশিষ্ট্য।

প্রুফ্রকের মধ্যে আত্মসমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। সে বুঝতে পারছে যে সে সারাজীবন অর্থহীন রীতিনীতি পালন করছে। জীবনে উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি। তার নিজের ভাষায় ঃ "I have mesured out my life with coffee spoons."

www.pathagar.com

তার সমাজের অন্যান্যদের অবস্থাও একই রকম। তারা চা, কফি, মারমালেড, আইসক্রীম খেয়ে, গান শুনে, নভেল পড়ে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। একজন বুদ্ধিমান বিদগ্ধ মানুষ হিসাবে প্রুফ্রক এ ধরনের জীবন যাপনের অসারতা উপলব্ধি করতে পারছে কিন্তু এটা পরিত্যাগ করার মনোবল তার নেই। এটা তার মানসিক সংকটের আর একটি কারণ।

প্রুফ্রক একজন সেকিউলার মানুষ হলেও নৈতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত। সে বাইবেলের John the Baptist-এর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছে। তার কিছু বলবার আছে যেমন John-এর ছিল। হয়তো উভয়ের চেহারায় কিছু মিল আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। John ছিলেন একজন পয়গম্বর। তিনি গুরুত্বপূর্ণ বাণী নিয়ে এসেছিলেন– নবজীবনের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। তার মিশনের খাতিরে প্রেমকে উপেক্ষা করে জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু প্রুফ্রক সামাজিক নিয়ম নিগড়ে আবদ্ধ একজন আধুনিক সৌখিন মানুষ। তার বক্তব্যও তেমন কিছু নয়। সে নিজেই বলেছে ঃ "here's no great matter" সে বাইবেলের Lazarus-এর কাহিনীও উল্লেখ করেছে। Lazarus ছিল একজন ভিক্ষুক। এক ধনী ব্যক্তির গেটের সামনে বসতো। মৃত্যুর পর ধনী ব্যক্তিটি নরকে গেল কিন্তু Lazarus স্বর্গে স্থান পেলো। ধনী ব্যক্তিটি Lazarus কে পৃথিবীতে পাঠানোর আবেদন জানালো যাতে সে তার মত মানুষকে অনুতপ্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে পারে। কিন্তু যারা পয়গম্বরদের কথা শোনেনি তারা Lazarus-এর কথা শুনবে না বলে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই কাহিনী উল্লেখ করে প্রুফ্রক হয়তো এটাই ইঙ্গিত করছে যে সে নিজের জীবন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে চায় এবং অন্যদেরকেও তা করতে আহ্বান জানাতে চায়। কিন্তু তার কথা হয়তো তারা বুঝবে না। তাই সে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করলো না। বাইবেলের John the Baptist ও Lazarus যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতীক সে জীবনের আবেদন সে উপলব্ধি করলো। তার মনে একটা নৈতিক সংকট সৃষ্টি হলো কিন্তু পরক্ষণে রোমান্টিক কল্পনায় গা ভাসিয়ে দিয়ে সেটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো।

প্রুফ্রক একজন ব্যক্তি চরিত্র। তার ব্যক্তিগত সংকটকে আধুনিক মানুষের সংকট হিসাবে অভিহিত করার কি যুক্তি আছে? প্রথমত প্রুফ্রকের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আধুনিক মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট। তার উদ্বেগ, তার আত্মমগ্নতা, তার স্নায়ুবিকারগ্রস্ততা, তার সংবেদনশীলতা তাকে আধুনিক মানুষের প্রতিভূ করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত যে সামাজিক বাস্তবতা সে উল্লেখ করেছে তা আধুনিক সমাজেরই চিত্র। তার জীবন তুচ্ছ, অন্তঃসারশূন্য, আধ্যাত্মিকতাবর্জিত। তার সমাজের অন্যদের জীবনও তাই। তাছাড়া, এলিয়ট যে Epigraph ব্যবহার করেছেন তা থেকেও স্পষ্ট যে প্রুফ্রকের সংকট শুধু ব্যক্তিগত নয়। দান্তের Divine Comedy থেকে Epigraph টি উদ্ধৃত। এটি নরকের অগ্নিশিখায় আচ্ছাদিত Guido-এর উক্তি। প্রুফ্রকও Guido-এর মত damned-ধর্মীয় অর্থে নয়, তবে এ এক ধরনের damanation. সে এই পৃথিবীতেই

www.pathagar.com

নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে। সে তার কাহিনী বলছে কারণ সে মনে করে যে অন্যরাও একই রকম যন্ত্রণায় জর্জরিত। তাই সে তার 'প্রেমের গানের' পরিসমাপ্তিতে হঠাৎ 'we' শব্দটি ব্যবহার করেছে। এ ারণে তার সংকট ব্যক্তিগত সীমানা অতিক্রম করে আধুনিক মানুষের সংকটের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

Gerontion কবিতাতেও সংকট উপস্থাপিত হয়েছে। এই মনোলগের বক্তা এক বৃদ্ধ। একটি বালক তাকে বই পড়ে শুনাচ্ছে। সম্ভবত জেরনশন দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। সময়টা খরাপীড়িত। সে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছে। কোন যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করেনি; কোন বীরত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা তার নেই। সে এক জরাজীর্ণ বাড়িতে ভাড়াটে হিসাবে বাস করে। বাড়ির মালিক এক ইহুদী। ইউরোপের বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোতে তার এ ধরনের আরো বাড়ি আছে। জেরনশনের বাড়ি চারিদিকে পাথর, শ্যাওলা, লোহার বর্জ্য, বিষ্ঠা। নোংরা পুতিগন্ধময় পরিবেশ। তার কোন পরিবার আছে বলে মনে হয় না। এক অসুস্থ খিটখিটে মেজাজের মেয়েলোক তার দেখা শুনা করে। স্পষ্টত এই বৃদ্ধ মহাসংকটের মধ্যে বাস করছে।

জেরনশন তার বর্তমান অবস্থার বিবরণ দেয়ার পর ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে এবং ধর্ম বিশ্বাস হারানোর মধ্যে তার সংকটের উৎস নিহিত বলে ইঙ্গিত করেছে। ধর্মের প্রতি আহ্বান জানালে মানুষ নিদর্শন চায়– অলৌকিক নিদর্শন ঃ "We would see a sign." ঈশ্বর যিশুখৃষ্টকে সেই নিদর্শন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ঈশ্বরের বাণীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু শিশু অবস্থায় সে বাণী ছিল অস্ফুট। অতএব অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঃ "The word within a word, unable to speak a word/Swaddled with darkness." যৌবনে তিনি বাঘ হয়ে এলেন ঃ "In the juvescence of the year/Came Christ the tiger." তিনি বাঘের মত শক্তি আর সৌন্দর্য নিয়ে মানুষের পুরোনো বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে ভক্ষণ করতে এসেছিলেন যাতে মানুষ নবজন্ম লাভ করতে পারে। জেরনশন যিশু খৃষ্টকে গ্রহণ করে নিয়েছিল, নবজীবনে উজ্জীবিত হয়েছিল। কিন্তু এমন এক সময় এলো যখন সে তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। সে শুধু একা নয়; আরো অনেকে তার সঙ্গে ছিল। সে চার জনের নাম উল্লেখ করেছে। তারা হলো ঃ Mr Silvero, Hakagawa, Madame Tornquist ও Fraulein von kulp. নামগুলো তাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তার পরিচয় বহন করে। তাদের জীবনের লক্ষ্য, আদর্শ তাদের কার্যকলাপের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। Mr Silvero চিনামাটির শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে উত্তেজিত হয়ে সারারাত পাশের ঘরে পায়চারী করছে। Hakagawa টিশিয়ানের চিত্রকর্মের সামনে শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে মাথা নোয়াচ্ছে। Madame Tornquist অন্ধকার ঘরে মোমবাতি নাড়াচাড়া করছে। সম্ভবত সে পুরোনো জীবনে বন্দি হয়ে আছে। Fraulein দরজায় এক হাত রেখে হল ঘরে ফিরে তাকাচ্ছে। বোধ হয় পুরোনো ও নতুন জীবনের মধ্যে দোল খাচ্ছে। তারা সবাই

www.pathagar.com

যিশু খৃস্টকে প্রত্যাখ্যান করে সেকিউলার আদর্শ ও মূল্যবোধকে গ্রহণ করেছে। তারা এখন vacant shuttles. তাদের কোন আধ্যাত্মিক সত্তা নেই।

জেরনশন বলছে আমরা সত্যকে জেনেছি কিন্তু অনুসরণ করিনি। ইতিহাস আমাদের ভুল পথে পরিচালিত করেছে। আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। যিশু খৃস্ট এবার আমাদের ধ্বংস করতে আসছেন ঃ "The tiger springs in the new year, Us he devours." জেরনশন আর্তকণ্ঠে খৃস্টকে বলছে ঃ

I that was near your heart was removed there from
To lose beauty in terror, terror in inquisition.

উপরোক্ত লাইন দুটিতে সে তার সমগ্র জীবনের ইতিহাস তুলে ধরেছে। সে খৃস্টের হৃদয়ের কাছে অবস্থান করছিল কিন্তু সেখান থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ তার ধর্মবিশ্বাস হারানোর জন্য সে শুধু নিজে নয় তার পরিবেশও দায়ী। ভয়ে সে খৃস্টের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারনি; আবার বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সে ভয়কে জয় করেছিল। এর পরিনাম তার বর্তমান অবস্থা। কিন্তু এখন আর ধর্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। সে আবেগ সে হারিয়েছে ঃ "I have lost my passion." এমনকি তার সমস্ত ইন্দ্রিয় লোপ পেয়েছে ঃ

I have lost my sight, smell, hearing, taste and touch:
How should I use them for your closer contact?

সে এখন মৃত্যুর কথা ভাবছে। তার বক্তব্যের পরিসমাপ্তিতে সে মৃত্যুর চিত্র এঁকেছে।

প্রুফ্রকের সঙ্গে জেরনশনের কিছু মিল আছে। উভয়ই হতাশাগ্রস্ত; উভয়ই নিজের নিজের দুর্দ্দশাবোধে জর্জরিত; উভয়ই আধ্যাত্মিকভাবে মৃত; উভয়ই তাদের বর্তমান অবস্থার কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছে। তবে মধ্যবয়সী প্রুফ্রক এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারতো, নবজীবনে উজ্জীবিত হওয়ার সময় তার ছিল, কিন্তু সে সাহস, সে মনোবল তার নেই। তার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনা যথেষ্ট প্রবলও নয়। অপরপক্ষে বৃদ্ধ জেরনশন জীবনের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যখন এই সংকট থেকে পরিত্রাণের আর কোন সুযোগ নেই। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় লোপ পেয়েছে; সমস্ত আবেগ শুকিয়ে গেছে। তার অন্তরে একটা চরম শূন্যতা বিরাজ করছে। জেনেশুনে বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে এই ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখন সে বিশ্বাস ফিরে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রুফ্রক একজন ব্যক্তি চরিত্র যে আধুনিক মানুষের প্রতিভূ হয়ে উঠেছে। জেরনশন যতটা ব্যক্তি চরিত্র নয়, তার চেয়ে বেশি রূপক। কবিতার শুরু থেকেই তা বুঝা যায়। খরা, বৃষ্টি, জরাজীর্ণ বাড়ি, ইহুদী মালিকানা, নোংরা পরিবেশ— সবই পাশ্চাত্য সভ্যতার রূপক হয়ে উঠেছে। সে সভ্যতা আন্তর্জাতিক ও বাণিজ্যিক। ইহুদী এই আন্তর্জাতিকতা ও বাণিজ্যিক মূল্যবোধের প্রতীক। যে সভ্যতার সে ধারক ও বাহক সে সভ্যতা ঘুনে ধরা, ধ্বংসোন্মুখ। জেরনশনের ধর্ম বিশ্বাসের বিলুপ্তি ও বিকৃতি ইউরোপে খৃস্টধর্মের

www.pathagar.com

ইতিহাসকে প্রতিফলিত করছে। ইউরোপ এক সময় এই ধর্মকে গভীরভাবে আকড়ে ধরেছিল। কিন্তু রেনেসাঁর সময়ে যাকে কবিতায় depraved May বলা হয়েছে সে বিশ্বাস লোপ পেতে থাকে। মানুষ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করে সেকিউলারিজমকে গ্রহণ করে। খৃস্টান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। জাতীয়তার উদ্ভব হয়। ইউরোপ বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় মেতে ওঠে। শিল্পকর্মের প্রতি উৎসাহ ঈশ্বরের আরাধনার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। Gerontion এ ইউরোপের এই ইতিহাস রূপকের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে এবং বিশ্বাসহীন জীবনের সংকট তুলে ধরা হয়েছে।

এলিয়টের বিখ্যাত কবিতা The Waste Land এ আধুনিক মানুষের সংকট আরো বিস্তৃত পরিসরে অভূতপূর্ব ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এই কবিতায় আমরা একাধিক বক্তার কণ্ঠস্বর শুনি। কিন্তু তারা সবাই গ্রীক পুরাণের অন্ধ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা একাধারে নারী ও পুরুষের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন Tiresias এ এসে মিলিত হয়েছে বলে কবি উল্লেখ করেছেন। Sir James Frazer-এর The Golden Bough-এ বর্ণিত vegetation myths এবং Miss Jessie L. Weston-এর From Ritual to Romance এ বিবৃত Grail Lagend-এর পটভূমিকায় রচিত এই কবিতায় চিত্রকল্প, রূপক, স্মৃতিচারণ, নাটকীয় দৃশ্য, অন্যান্য লেখকদের লেখা থেকে উদ্ধৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক মানুষ তথা সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকট তুলে ধরা হয়েছে।

পাঁচটি পর্বে বিভক্ত এই কবিতায় একটি বিরান দেশের চিত্র আঁকা হয়েছে যেটা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতীক। এপ্রিল সে দেশের মানুষের কাছে নিষ্ঠুরতম মাস। কারণ এ সময় প্রকৃতিতে নব জীবনের সঞ্চার হয়; তার প্রভাবে মানুষের মনে স্মৃতি ও কামনা জেগে ওঠে। কিন্তু সেখানকার মানুষ স্মৃতি ও কামনাকে ভুলে থাকতে চায়। তাই বসন্ত নয়, শীতই তাদের কাছে অধিকতর কাম্য। বস্তুত তারা জীবন-মৃত; প্রুফ্রক ও জেরনশনের সমগোত্রীয়।

বসন্তের আগমনে কি ধরনের স্মৃতি জাগ্রত হয় Maire নামক একটি মেয়ের স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে তার কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে। যেসব কথা তার মনে পড়ছে সেগুলো হলো ঃ এক গ্রীষ্মে তারা বেড়াতে বেরিয়েছিল, কফি খেয়েছিল, ঘন্টা খানেক গল্প করেছিল। ছোটবেলায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে— নিজের বাড়ি বা বাবা মায়ের কথা তার মনে পড়ছে না— অবস্থানকালে পাহাড়ে স্লেড নিয়ে খেলতে গিয়েছিল। ভীত হয়ে আত্মীটিকে জড়িয়ে ধরে পাহাড়ের ঢালু দিয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল। তার আরো মনে পড়ছে, অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ার কথা, শীতে দক্ষিণাঞ্চলে কাটানোর কথা। এই স্মৃতিচারণের মধ্যে Marie ও তার সমাজের তথা আধুনিক মানুষের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা, উত্তেজনাপূর্ণ খেলাধূলা, ইচ্ছামত বই পড়া, প্রমোদ ভ্রমণ– এই নিয়ে তাদের জীবন। প্রুফ্রক ও জেরনশনের জীবনের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে এ জীবনের তেমন কোন পার্থক্য নেই।

www.pathagar.com

স্মৃতিচারণ শেষ হতে না হতেই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কে যেন বিরানভূমির আরো ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরে তাদের প্রকৃত অবস্থা, তাদের মারাত্মক সংকটের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান জানানো হচ্ছে লাল পাথরের ছায়ায়। উল্লেখ্য যে লাল পাথর গীর্জার প্রতীক। তবে এখানে ভয়ও আছে। নিজের আত্মার সংকটের উপলব্ধিজাত ভয় হতে পারে।

লাল পাথরের প্রতীকের মাধ্যমে যে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে আহ্বান জানানো হচ্ছে রোমান্টিক প্রেম তার একটা বিকল্প হতে পারে কি? Wagner-এর অপেরা Tristan and Isopde থেকে একটি গানের উদ্ধৃতির মধ্যে এই রোমান্টিক প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। এরপর প্রেমের আর একটি আনন্দঘন মুহূর্তের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে দুটো শেষ হয়েছে Tristan and Isolde-এর একটি লাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে, যার মধ্যে প্রেমের ব্যর্থতা, হতাশা ফুটে উঠেছে। এর দ্বারা সেকিউলার বিকল্পের ক্ষণস্থায়িত্ব ও সীমাবদ্ধতা বোঝানো হয়েছে বলে মনে হয়।

Madame Sosostris-এর মাধ্যমে আধুনিক মানুষের জীবনে ধর্মীয় ঐতিহ্যের বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই মহিলা একজন ভাগ্য গণনাকারিনী। উল্লেখ্য যে সেই ইউরোপের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি বলে সুপরিচিত। এক প্যাকেট বিশেষ ধরনের তাস (Tarrot pack of cards) নিয়ে সে ভাগ্য গণনা করে। এই তাস এক সময় নীল নদের পানি বৃদ্ধির মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য ব্যবহৃত হতো। এই পানি বৃদ্ধি নতুন ফসলের জন্য ছিল অপরিহার্য; অতএব সমগ্র সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু এখন সেই তাস ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যক্তি মানুষের ভবিষ্যৎ গণনা করার কাজে। ধর্ম বিশ্বাসহীন মানুষের জীবনে আর কোন উন্নততর লক্ষ্য বা আদর্শ নেই। তাছাড়া তাসের উপর যেসব প্রতীক আঁকা আছে সেগুলো ধর্মীয় প্রতীক। কিন্তু Madame সেগুলোর প্রকৃত অর্থ জানে না। অধিকন্তু যে প্রতীক মানুষের নবজন্মের ইঙ্গিত করছে সেটা সে দেখতে পাচ্ছে না। সে দেখতে পাচ্ছে বিশাল জনতা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে।

প্রথম পর্বের শেষ স্তবকে লন্ডন ও তার বাসিন্দাদের বর্ণনার মাধ্যমে আধুনিক মানুষের দুর্দাশার আরো চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান সভ্যতার প্রতীক লন্ডনকে একটি অবাস্তব নগরী (Unreal city) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুয়াশাচ্ছন্ন এই নগরী। ('কুয়াশা' শব্দটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে এলিয়টের কবিতায়। এর প্রতীক ব্যাঞ্জনা সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়)। লন্ডন ব্রীজের উপর দিয়ে জনস্রোত চলেছে। সব অফিসগামী মনে হয়। কিন্তু তারা কি জীবিত? তাদের সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ঃ "I had not thought that death had undone so many." কথাটি দান্তের Divine Comedy-এর একটি লাইনের প্রতিধ্বনি। নরকের অগণিত damned spirits দেখে দান্তে এই উক্তি করেছিলেন। এলিয়ট উক্তিটি উদ্ধৃত করে আধুনিক মানুষের সংকটের স্বরূপকে যেভাবে

www.pathagar.com

উদ্ঘাটন করেছেন তা অন্য কোনভাবে করা যেতো না। কবি জনতার আরো বর্ণনা দিয়েছেন। তারা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কেউ কারোর দিকে তাকাচ্ছে না। তাদের চোখ তাদের পায়ের পাতায় নিবদ্ধ। কারোর সঙ্গে কারোর যোগাযোগ নেই। সবাই নিঃসঙ্গ, একা। তারা Saint Mary Woolnoth-এর গীর্জা পার হয়ে যাচ্ছে। তারা বাস্তবিকই আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। বোদলেয়ার থেকে একটি উদ্ধৃতি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে তিনিও এদের একজন।

প্রথম পর্বে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে, আধুনিক মানুষের জীবনের যে সংকটময় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বে তার আরো কিছু উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে সবগুলোর আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা দ্বিতীয় পর্বের জৌলুসপূর্ণ ড্রয়িং রুমের স্নায়ুবিকারগ্রস্ত আধুনিকা মহিলার ভয়ার্ত চিৎকার, হতাশা ও শূন্যতাবোধ, মদের দোকানের নিম্ন শ্রেণীর এক নারীর বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কথপোকথন, তৃতীয় পর্বের এক বাড়ির দালালের কেরাণী ও এক টাইপিষ্টের প্রেমহীন যৌন মিলনের উল্লেখ করতে পারি। এসব দৃশ্য বা ঘটনার অনেকগুলোতে লালসার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই লালসা শুধু আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য নয়। Tiresias-এর অনন্তকালপ্রসারী চেতনায় এ ধরনের বহু ঘটনার স্মৃতি জাগরুক হয়ে আছে। তার ভাষায় ঃ

(And I Tiresias have fore suffered all
Enacted on this same divan or bed.
I who have sat by Thebes below the wall
And walked among the lowest of the dead.)

এ যেন চিরন্তন মানবিক সংকট। তবে বর্তমান কালে এটা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। Goldsmith থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে কবি বুঝাতে চেয়েছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে একজন মেয়ের পদস্খলন হলে যেখানে সে আত্মহত্যা করতো সেখানে আধুনিক কালের একজন মেয়ের কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। তৃতীয় পর্বে লালসার আরো ঘটনা আছে। Thamesdaughters-এর গান থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয় যে লালসার বিভিন্ন ঘটনা বা দৃশ্যের পর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈরাগ্যময় ঐতিহ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধ ও অগাষ্টীন এই ঐতিহ্যের ধারক। তারা আগুনকে লালসার প্রতীক হিসাবে দেখেছিলেন। তাদের কাছে আগুন আত্মশুদ্ধির প্রতীকও বটে। "O Lord thou pluckest me out" অগাষ্টীনের এই প্রার্থনার মাধ্যমে পরিত্রাণ ও আত্মশুদ্ধির ধারনা দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ পর্বে একজন Phoenician নাবিকের জলে ডুবে মৃত্যু এবং এর ফলে লাভ-ক্ষতির হিসাব থেকে তার মুক্তির উল্লেখ করে সবাইকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু এবং পার্থিব জীবনের তুচ্ছ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অসারতা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

কবিতার শেষ পর্বে বিরান দেশের সংকট তীব্র ও অসহনীয় রূপ ধারণ করেছে। এ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে Grail Legend-এর পটভূমিকায় একটি যাত্রার বিবরণ আছে। Chapel Perilous-এর উদ্দেশ্যে এই যাত্রা। কিন্তু এ যাত্রা কঠিন, দুঃস্বপ্নের মত। অবশেষে Chapel টি দেখা গেল, কিন্তু সেটি শূন্য মনে হয়। স্পষ্টত পরিত্রাণ সহজ নয়। তবে পরিত্রাণের ইশারা আছে কারণ শেষ পর্যন্ত অশুভ বিতাড়নের ইঙ্গিত দিয়ে মোরগের ডাক শুনা গেল, বাতাসে বৃষ্টির আভাস পাওয়া গেল, বজ্রের বাণী ধ্বনিত হলো উপনিষদের ভাষায় ঃ "আত্মসমর্পণ, সহানুভূতি, সংযম।" এই আহ্বানের বাস্তবায়নের মধ্যে হয়তো পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কবিতায় পরিত্রাণ দেখানো হয়নি। দেখানো হয়েছে লন্ডন ব্রীজ তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভেঙে পড়ার দৃশ্য।

The Waste Land এ যে জীবন চিত্রায়িত হয়েছে সেটা সেকিউলার জীবন এবং এই সেকিউলার জীবনের মধ্যেই যে সংকটের উৎস নিহিত তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংকট উপস্থাপনার মাঝে মাঝে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের ইঙ্গিত বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। প্রতীকগুলোর মধ্যে আছে লাল পাথরের ছায়া, Saint Mary Woolnoth-এর গীর্জা, Christopher Wren-এর Magnus Martyr, বুদ্ধ ও অগাস্টীনের উক্তি, যিশু খৃস্টের Passion, নিহত দেবতার পুনরুত্থান, Grail Legend-এর Chapel Perilous, উপনিষদের ভাষায় বজ্রের বাণী ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে Prufrock ও Gerontion এ শুধু খৃস্টীয় ঐতিহ্য বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু The Waste Land এ এই সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে কবি অন্যান্য ধর্মের ঐতিহ্য বা প্রতীক ব্যবহার করেছেন। তাতে কবিতাটির আবেদন ব্যাপকতা লাভ করেছে। তবে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহার সত্ত্বেও The Waste Land একটি sermon এ পরিণত হয়নি। কবিতাটিতে সংকটকেই বড় করে দেখানো হয়েছে এবং প্রতীকগুলো সংকটকে আরো তীব্রতা দান করেছে।

এই প্রবন্ধের শুরুতে আমরা এলিয়টের কাব্যে বাস্তবতার কথা উল্লেখ করেছিলাম। যে তিনটি কবিতা আমরা আলোচনা করেছি তাতে আধুনিক মানুষের জীবন অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু জীবন ও সাহিত্য এক জিনিস নয়। সাহিত্যে জীবন সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রকাশ পায় না। কবি বা সাহিত্যিক একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনকে অবলোকন করেন। এলিয়ট এর ব্যতিক্রম নন। তার কাব্যে একটি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বা চেতনা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের আলোচনায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেকে সুনজরে দেখেন না। এলিয়ট তার Religion and Literature নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে যারা আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করছেন তারা কোন supernatural

www.pathagar.com

order এ বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তারা জানেন না যে এই পৃথিবীতে এখনও অনেক লোক আছেন যারা এতখানি 'backward' ও 'eccentric' যে সে বিশ্বাস লালন করে চলেছেন। এটি একটি মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস। একে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা অযৌক্তিক। কিন্তু গত দু'শ বছর যাবত এই কাজটি চলছে। সাহিত্য সেকিউলার হয়ে পড়েছে। সেকিউলারিজম সাহিত্যকে বিকৃত করছে বলে এলিয়ট মনে করেন। তার নিজের ভাষায় ঃ

What I do wish to affirm is that the whole of modern literature has been corrupted by what I call secularism that it is simply unaware of, simply cannot understand the meaning of, the primacy of the superatural over the natural life; of something which I assume to be our primary concern.

স্বভাবতই তার কাব্যে এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হয়েছে, তবে সরাসরি পেশ করা হয়নি; কবিতায় উপস্থাপিত অভিজ্ঞতার আলোকে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই কারণে তা আবেদন সৃষ্টি করে, পাঠকের মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

www.pathagar.com

ভাষা নিয়ে কিছু ভাবনা কিছু দুর্ভাবনা

আবু জাফর

বাংলা ভাষী এতদ্দেশীয় মুসলিম উম্মাহর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আমাদের কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা যেমন আছে, প্রাসঙ্গিক কিছু দুর্ভাবনাও আছে। বলা বাহুল্য, এই দুঃখ ও ভাবনা-দুর্ভাবনাই বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথমেই উল্লেখ করা আবশ্যক, ভাষার প্রভাব শুধু বহুমুখীই নয়, অন্তর্লীন ও রহস্যময়ও বটে এবং এই ভাষা নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যারা কাজ করেন, তারাও যুগপৎ অন্তর্মুখী ও বহুবর্ণিল এক-একজন রহস্য পুরুষ। অতএব এই ভাষা এবং এই ভাষা শিল্পীদের নিয়ে কথা বলা একটু কঠিন তো বটেই, ঈষৎ বিপজ্জনকও বটে।

ভাষা মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নেয়ামত এবং যেহেতু নেয়ামত, ইসলামের শিক্ষা ও দাবী অনুযায়ী, অন্য সকল নেয়ামতের মত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মানুষকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির প্রশ্নটি মাথায় রাখতে হয়। অর্থাৎ মেধা ও সৃজনশীল প্রতিভা, শক্তি ও দক্ষতা যাই থাক ও যতই থাক, কোন মানুষের জন্য এই অনুমতি বা স্বাধীনতা নেই যে, ভাষাকে যথেচ্ছভাবে সে ব্যবহার করতে পারে। শক্তি ক্ষমতা অর্থ-প্রতিপত্তি থাকলেই, যেমন তা সত্য ও ইনসাফের বিপরীতে মানুষের অকল্যাণে ব্যবহার করা নিষেধ, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই একই নিষেধ ইসলাম নিঃশর্তভাবে আরোপ করে। আবার উল্লেখ করি, নেয়ামতটা যেহেতু একান্তভাবেই আল্লাহর, আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ অবধারিত হয়ে ওঠে, এমন কোনভাবেই ভাষা নিয়ে কোন স্বেচ্ছাচার ইসলামের দৃষ্টিতে সংগত নয়। বলা উচিত সংগত তো নয়-ই, বরং সম্পূর্ণরূপে অসংগত, অনভিপ্রেত ও অপছন্দনীয় কারণ টাকা থাকলেই যেমন মদ্যপান করা যায় না, ক্ষমতা থাকলেই যেমন সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক হওয়া যায় না; ঠিক একই রকম, ভাষা ব্যবহারের পারঙ্গমতা থাকলেই হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে খ্যাতি ও অর্থলোভে প্রবৃত্তির দাসত্ব করা যায় না। যারা করেন তারা অবশ্যই অপরাধী, ইসলামী পরিভাষায় ফাসিক। কারণ ইলম্ এবং লেখার শক্তি সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে পেতে হয়। সকলে পায় না, কেউ কেউ পায়। অতএব এই নেয়ামত যদি বেপরোয়াভাবে অপব্যয়িত হয়, স্বার্থতাড়িত অন্যায় অসত্য ও অশ্লীলতার নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে, সেসব মারাত্মক.দুর্ভাগ্য, এক গুরুতর খোদাদ্রোহিতা, কোনদিক থেকেই যার কোন ক্ষতিপূরণ হয় না। অতএব ভাষা যেহেতু আল্লাহর প্রদত্ত মানুষের ব্যবহারযোগ্য একটি প্রকৃষ্ট নেয়ামত, এই নেয়ামত যাতে কোনভাবেই আল্লাহ পাকের শাশ্বত হেদায়াতের মোকাবিলায় সাংঘর্ষিক হয়ে না ওঠে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাজ করা, যে কোন মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় কথাটি হলো, বাহ্যত ভাষা একটি নিরপরাধ হাতিয়ার, যা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হলে সম্পদ, না হলে একটি বিপদ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ভাষার প্রভাব ও কার্যকারিতা লেখকদের উপর নির্ভরশীল; যে কারণে অনেক উন্নত ভাষার মধ্যে যেমন রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে, আবার অপরদিকে লেখকের সততা, মনুষ্যত্ব, নিষ্ঠা ও মানবপ্রেমকে পাথেয় করে একটি দুর্বল ভাষাও পর্যাপ্ত আলো বিকীরণ করতে সক্ষম। যে কোন ভাষার সাহিত্য কর্মের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাই। অতএব এ ক্ষেত্রে বলা যায় ভাষা একটি বড় সম্পদ বটে, কিন্তু এই সম্পদ লেখকদের হাতে কীভাবে ও কোন লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটাই প্রধান কথা। এই জন্যই লেখকের ভাগে যে নিন্দা বা অভিনন্দন জোটে, সেটা ভাষার কারণে নয়, লেখকের নিজস্ব ভূমিকার কারণে। অতএব কোন ভাষাকে পক্ষ-প্রতিপক্ষ বলে বর্জন কি গ্রহণ করবার মধ্যে যুক্তি অত্যন্ত কম। আর এই জন্যই ভাষার শক্তি ও সাবলীলতা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হতে পারে, সাহিত্যের ভালোমন্দ নিয়ে কথা হতে পারে, কিন্তু কোন ভাষাকেই ভাষা হিসাবে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। যাই হোক, ভূমিকাস্বরূপ পেশকৃত আমাদের এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন দেখতে চেষ্টা করবো, বাংলাভাষী জনগণ তাদের মাতৃভাষাকে ঠিক কীরূপে ও কী তাৎপর্যে দেখতে পাচ্ছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, ভাষা আসলে নিজে নিরপরাধ এবং এইসঙ্গে এই কথাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, স্ব স্ব মাতৃভাষার কাছে মানুষের ঋণ এতই বেশি, যা অস্বীকার করলে নিজেদের অবস্থান ও অস্তিত্বকেই খর্ব করে তোলা হয়। কিন্তু সমস্যা হলো, এই সূত্রে আমাদের আবেগ অনেক সময়ই এমন গগনচুম্বীরূপ ধারণ করে, যখন যুক্তি ও বাস্তবতা খুব একটা গ্রাহ্যে আসে না। আর এই আবেগের সঙ্গে যদি কোন প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের মতলব মিশ্রিত করে দেয়া যায়, তাহলে সেই মতলবী আবেগ সহজেই ভয়ংকরভাবে আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে ও ওঠে। যাই হোক, আমরা আমাদের নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ থেকে যা পেয়েছি, সে কথা পাঠক সমীপে পেশ করতে চাই।

ভাষা নিজে নিরপরাধ বটে, কিন্তু লেখকদের কারণে ভাষা যদি একই ধরনের বার্তা বারবার দীর্ঘকাল ধরে পাঠকের কাছে প্রেরণ করতে থাকে, তাহলে ওই ভাষার মধ্যে প্রেরিত বার্তার সমধর্মী একটি স্বভাব ও অভ্যাস সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ভাষা নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও অভ্যাসগত কারণেই কোন না কোন চিন্তা বা দর্শন বা বিশ্বাসের অনুগত কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যে সকল উৎস থেকে ভাষা তার প্রাণরস সংগ্রহ করে, সেই উৎস যদি হয় নির্মল, ভাষা হয়ে ওঠে সত্য ও সুষমার প্রতিচ্ছবি। আর উৎস যদি হয় পঙ্কিল ও কর্দমাক্ত, ধীরে ধীরে ভাষাও হয়ে ওঠে আবিল ও অপরিচ্ছন্ন। বলতে চাই, আমাদের একান্ত প্রিয় মাতৃভাষার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি নিয়ে কিছু ভাবনা-চিন্তা ও পর্যালোচনার অবকাশ আছে।

www.pathagar.com

এটা যদিও ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলিম রাজশক্তির অকৃত্রিম অনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা বাংলাভাষাকে পর্যাপ্ত সমৃদ্ধি দান করেছে; কিন্তু এই কথাও শতকরা এক'শ ভাগ সত্য যে, বাংলাভাষার স্বভাব ও চারিত্র্য-নির্মাণে রাজশক্তির কোন ভূমিকা ও মনোযোগ ছিল না, বিষয়টি তাদের বোধগম্যও ছিল না। অর্থাৎ বাধা কি সহায়তা যাই থাক, বাংলাভাষা বিকশিত হয়ে উঠেছে, তার চারিত্র্য নির্মিত হয়েছে দ্বিতীয় কোন প্রভাব ছাড়াই শুধু লেখকদের আবেগ ও অভিপ্রায়ের অধীনে। আর বাংলাভাষা যেহেতু তার প্রায় সহস্র বৎসরের এই জীবৎকালে সর্বদায়ই অংশীবাদ-বিশ্বাসী হিন্দু লেখকদের দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টির বাহন ও মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বাংলাভাষার স্বভাবে ও অবয়বে অঙ্কিত হয়ে গেছে একটা অংশীবাদী ছাপ। আদিতে এ রকম ছিল না; কিন্তু বারবার ব্যবহৃত হওয়ার কারণে অসংখ্য শব্দ ও শব্দ বন্ধ এখন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গেছে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে। অর্থাৎ বাংলাভাষার একটি বিরাট অংশের উপর হিন্দু-মানস তার দখলিস্বত্ব পাকাপাকিভাবে কায়েম করে ফেলেছে এবং অনেক হিন্দু যে বাংলাভাষাকে একমাত্র তাদেরই ভাষা বলে মনে করে, তার মূল কারণ এখানেই নিহিত। কিছু উদাহরণ পেশ করলেই আশা করি বিষয়টি পরিষ্কার হবে। 'সারদামঙ্গল' অন্নদামঙ্গল' 'মঙ্গলঘট' 'মঙ্গলপ্রদীপ' 'মঙ্গলাচার' 'মঙ্গলগীত' ইত্যাদি লিখতে লিখতে 'মঙ্গল' শব্দটিই এমন হয়েছে যে, 'মঙ্গলবার্তা বা 'তোমার মঙ্গল হোক' এ সবের মধ্যেও একটা হিন্দুয়ানী গন্ধ জেগে ওঠে। এইভাবে 'অঞ্জলি' 'চরণ' 'প্রণাম' 'ভ্রাতা' 'আরাধ্য' 'উপাসনা' 'সুপ্রভাত' 'স্বর্গাদপি' 'পিতৃদেব' 'পূজ্যপাদ' 'কীর্তন' 'লীলা' 'বিসর্জন' ইত্যাদি কত যে শব্দ একান্তভাবে হিন্দুদের হয়ে গেছে, তার কোন ইয়ত্বা নেই। আর এই ব্যাপারটা শুধু যে হিন্দু লেখকদের দ্বারা বহুলভাবে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হওয়ার ফলেই ঘটেছে তা নয়, অন্যতম মুখ্য কারণ হলো, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই খুব সজ্ঞানে ও সুপরিকল্পিতভাবে একটা হিন্দুয়ানী বাংলা তৈরির কাজ এগিয়ে নেয়া হয়েছে এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখেই হিন্দু লেখকেরা তাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে অঢেল সংস্কৃত শব্দ আমদানী শুরু করলেন। প্রথম প্রথম যথেষ্ট কৃত্তিম মনে হলেও, ধীরে ধীরে সময়ের ব্যবধানে সেইসব শব্দ ও শব্দ বন্ধই হিন্দুয়ানী ব্যঞ্জনার একটি স্বতন্ত্র গন্ধ ও অভিজ্ঞান নিয়ে বাংলাভাষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল।

কিন্তু এর পাশাপাশি বা মোকাবিলায় ইসলামী চেতনা ও তাওহিদী সৌরভে সমৃদ্ধ একটি আলাদা ভাষাশৈলী যে গড়ে উঠতে পারলো না, তার প্রধান কারণ হলো দু'টি। প্রথমত, শিক্ষা ও সুযোগের অভাব হেতু মুসলিম লেখকদের দুঃখজনক সংখ্যাল্পতা ও অসচেতনতা এবং দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ মুসলিম লেখকের মধ্যে বিরাজমান হিন্দুত্বের প্রতি হীনমন্যতাপূর্ণ প্রবল আত্মঘাতী অনুরাগ। এখনো এই স্বাধীন বাংলাদেশে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। মাঝখানে নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের রচনায় বাংলাভাষা অনেকটা তাওহিদী মুসলমানের ভাষায় সবাক হয়ে ওঠার অঙ্গীকার করেছিল,

www.pathagar.com

কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী সৃষ্টি না হওয়ায় বাংলাভাষার এই পার্শ্বপরিবর্তনকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখা যায়নি। আর কাজটা একটু কঠিনও বটে। যদিও উর্দু আরবি ফারসি শব্দ ভাণ্ডার থেকে গ্রহণযোগ্য ইসলামী শব্দের অভাব নেই, কিন্তু তাকে বাংলা-ভাষা বিন্যাস ও বাকপ্রকরণের মধ্যে দ্রবীভূত করে নেবার মত মেধাবী অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী তাওহীদ নিষ্ঠ লেখকের বড় অভাব। আর এতদসঙ্গে এই বাংলাদেশে এমন এক শ্রেণীর লেখক ও বুদ্ধিজীবী বর্তমান, যারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাতে এতই দক্ষ ও তৎপর যে, নজরুল ও ফররুখের লেখা শুধু নয়, ভাষায় কি ভাবাদর্শে তাওহীদের গন্ধ পাওয়া মাত্র 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে সেই লেখাকে লোক চক্ষুর নেপথ্যে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের নিদ্রাহীন পেরেশানি স্তিমিত হয় না। অতএব এইসব বহুবিধ কারণে পঁচাশি শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে আমাদের মাতৃভাষা এখনো হিন্দু যবানেরই প্রতিকণ্ঠ, যেখানে স্বতন্ত্র একটি তাওহিদী-ভাষাশৈলী গড়ে ওঠাই অনেকটা দুঃসম্ভব। অথচ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যেমন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা প্রয়োজন, নিজস্ব অর্থনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োজন; ঠিক একইভাবে প্রয়োজন ভাষা ও সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান ও শৈলী ও নিজস্ব কণ্ঠস্বর। বলাই বাহুল্য, সবকিছু ঠিক থাকলেও, এই শেষোক্ত বিষয়টি দীর্ঘসময় উপেক্ষিত থাকলে একটু একটু করে একদিন চূড়ান্ত সর্বনাশের দরজাটি খুলে যেতে পারে।

ভাষা ও সংস্কৃতি ও জীবনাচার যে কত গুরুত্বপূর্ণ, এটা সাধারণ কিছু দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমরা অনুধাবন করতে পারি। আমেরিকা এবং বৃটেন উভয়েরই ভাষা ইংরেজি, কিন্তু দুই ইংরেজি এক নয়। বাকভঙ্গিসহ বানানরীতি ও বাক্যগঠন প্রণালীতে এমন শ্রুতি দৃষ্টিগ্রাহ্য পার্থক্য তৈরি হয়েছে, যা থেকে বৃটেন ও আমেরিকার ভাষাকে আলাদাভাবে অনুভব করা যায় এবং করতে হয়। অথচ উভয় ক্ষেত্রে মূল শেকড় ও শব্দ সম্পদ একই। উল্লেখযোগ্য যে, মার্কিনীরা তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা সৃষ্টির জন্য এমনকি বৈদ্যুতিক সুইচের উঠানামাকেও আলাদা করে নিয়েছে; যেখানে সুইচ উপরে উঠলে বিদ্যুৎ কাজ করে, নীচে নামলে নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ ভাষা তো অবশ্যই, জীবনের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই জাতীয়তা এবং আত্ম পরিচয়ের দৃঢ়তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থে মার্কিনীরা সতর্ক ও সচেতন। মুসলমানদের দ্বারা পারস্য বিজয়ের পর অগ্নি পূজকেরা অধিকাংশই ইসলামে দীক্ষিত হলো। কিন্তু তারা শুধু ধর্মান্তরিত হলো না, তারা তাদের ভাষাতেও একটা ইসলামী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে নিলো এবং অচিরেই ফার্সীতে সৃষ্টি হলো অসংখ্য অমর ইসলামী সাহিত্য প্রণেতা; সৃষ্টি হলো তাওহীদ ও নবী প্রেমের সৌরভ নিয়ে এক সমৃদ্ধ ইসলামী সাহিত্য। অতএব বুঝা যায়, জীবন দর্শন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য ভাষা ও সাহিত্য তার মেধাবী লেখকদের হাতে পুরাতন অগ্নি উপাসনার খোলস ছেড়ে ইসলামী বিশ্বাস ও আকীদার সখ্য নিয়ে এক নতুন রূপে ও নতুন শক্তিতে জেগে উঠলো। মোগল সম্রাটদের

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় একটি অবহেলিত আঞ্চলিক উপভাষা খড়িবুলি যে আরবি-ফার্সী ইত্যাদি ভাষা থেকে বিপুল পরিমাণ শব্দ আহরণ করে আধুনিক উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত হলো, সেখানেও কার্যকর ছিল একই প্রেরণা। মোগল রাজশক্তি চেয়েছিল এমন একটি ভাষা তৈরি হয়ে উঠুক, যার মধ্যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জীবন চৈতন্যের অভিব্যক্তি অবাধ হতে পারে। এটা আসলে আত্মসচেতনতার একটি জরুরি প্রশ্ন এবং এই সচেতনতাকে যে কোন জাতি তার সংস্কৃতি ও বিশ্বাস ও সম্ভ্রমের রক্ষাকবচ হিসাবে বিবেচনা করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, ভাষার প্রশ্নে এই অত্যাবশ্যক সচেতনতা বাংলার মুসলিম শাসনামলেও ছিল না, আমাদের মধ্যে এখনো নেই। শুধু 'ছিল না' বা 'নেই' বললে কম বলা হয়; এ ক্ষেত্রে আমরা বরং বরাবরই মাত্রাতিরিক্ত গাফেল। আর এই কারণেই আমাদের সৃজনশীল লেখকেরা অধিকাংশই একদিকে যেমন শক্তি-সুনীল-জয় গোস্বামীদের ভক্ত ও অনুকারক; অন্যদিকে তেমনি ইসলামী ভাবচেতনার কথা শুনলেই তাদের মধ্যে প্রায় মৃত্যুকালীন অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য এ রকম না হয়ে উপায়ও নেই, কারণ যারা 'আল্লাহ হাফিজ' বলতে লজ্জা পায়, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'-এর পরিবর্তে 'নমস্কার' বলতে পারলে বিস্তর শ্লাঘা অনুভব করে, সেইসব সাহিত্য ব্যবসায়ী দ্বারা বাংলাভাষার শৈলী ও সাহিত্য চেতনায় প্রয়োজনীয় তাওহিদী প্রাণরস সঞ্চালিত হবে, এমনটা আশা করাই বোকামি। এই রবীন্দ্রমুগ্ধ আত্মবিক্রীত অক্ষরজীবীরা বরং বাংলাভাষাকে 'আবহমান ঐতিহ্যের' কথা বলে হিন্দুয়ানী অংশীবাদের মধ্যে যথাসাধ্য অর্গলবদ্ধ রাখতেই বদ্ধপরিকর। অতএব যারা মুসলমানের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞানকেই মানতে চায় না, সর্বধর্ম সমন্বয়বাদিতা যাদের আমৃত্যু সাধনার বস্তু, রবীন্দ্রনাথ যাদের কাছে পূজ্যপাদ দেবতা, তাদের পক্ষে এতদ্দেশীয় মুসলিম-তাওহিদী উম্মাহর জন্য স্বতন্ত্র ভাষাশৈলী নির্মাণের কথা কল্পনা করাও মহাপাপ। এমতাবস্থায় আবার একজন নজরুল ইসলাম অথবা ফররুখ আহমদের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের সম্মুখে দ্বিতীয় আর কোন বিকল্প নেই।

প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখযোগ্য যে, ভাষা আসলে কোন না কোন জীবন দর্শনকে অবলম্বন করেই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে এবং জীবনদর্শনের ভিত্তিতেই একটি প্রায় অনিবার্য চারিত্র্য অঙ্গীকার করে। একটি ছোট্ট উদাহরণ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। ইংরেজি একটি বিশ্ববিস্তৃত খুবই শক্তিশালী ভাষা। কিন্তু প্রথমাবধিই এই ভাষায় পুনঃ পুনঃ বস্তুবাদী দর্শন ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটার কারণে মরমি আধ্যাত্মিকতাকে প্রকাশ করবার মত যথোচিত শক্তি আয়ত্ব করা সম্ভব হয়নি। আর এই জন্যই ইংরেজি ভাষায় অনেক ধরনের অনেক বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু একজন হাফিজ কি ইকবাল কি রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাত মেলে না। এই বক্তব্যের অর্থ ও বাস্তব তাৎপর্য হলো এই যে, বহুদিন একাদিক্রমে মুশরিকী জীবনদর্শনের অকুণ্ঠ আনুগত্য করার ফলে বাংলাভাষা এমন এক অবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছে, এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছে, যার মধ্যে যথোচিত কাঙ্ক্ষিত তাওহিদী-সৌরভকে সাহিত্য মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন। যাই হোক, আমাদের ভাষা যেভাবে ও যে নিয়মে কাজ করে চলেছে, আমরা যদি এই অবস্থাকে প্রীতিকর বলে বিবেচনা করি, তাহলে বিশেষ আর কোন কথা থাকে না। কিন্তু যদি অনুভব করি, আমাদের তাওহিদী মুসলিম চেতনার অভিপ্রকাশ ও ইসলামী জীবনবোধকে পূর্ণশক্তিতে বাঙ্ময় করে তুলবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা অনেকটাই দুর্বল ও আড়ষ্ট, তাহলে আমরা মনে করি, আমাদের অবশ্যই কিছু করণীয় আছে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই কথাও মনে করি, আমাদের কিছু সুপারিশ দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকর হওয়া জরুরি।

এক। বর্তমান অবস্থার মোকাবিলায় আরবি ফার্সী ও উর্দুভাষা থেকে স্বীকরণযোগ্য শব্দ ও শব্দবন্ধের ব্যবহার যথাসম্ভব বাড়াতে হবে এবং এতদসঙ্গে মুসলিম চেতনা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে সকল শব্দ ও উপমা 'দেবভাষা' সংস্কৃত ও অন্য উৎস থেকে আহৃত, সেই ধরনের শব্দাবলীর অনুচিত ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বর্জন করতে হবে। উদাহরণত, যেখানে স্বাভাবিকভাবেই 'জান্নাত' 'জাহান্নাম' ব্যবহৃত হওয়ার কথা, সেখানে 'নরক' 'স্বর্গলোক' 'অমরাবতী' ব্যবহারের যৌক্তিকতা কোথায়? 'ইন্তেকাল' এর বদলে 'পরলোকগমন' 'মরহুম'-এর স্থলে 'প্রয়াত' লেখা বা বলার মধ্যে সত্যই কি কোন যৌক্তিকতা আছে? 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন'-এর পরিবর্তে 'বিশ্বপ্রভু জগদীশ্বর' বলার মধ্যে এক ধরনের নিন্দনীয় আধুনিকতা এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের খুশি ও বাহবা যতই নিহিত থাক, ওতে ভাষারও ক্ষতি, মুসলিম উম্মাহর ঈমান এবং জীবনদর্শনেরও বিপর্যয়, আর পারিভাষিক বিকার তো বটেই।

দুই. কলমের অগ্রভাগ থেকে উদার বিশ্বমানবতার বাণী, ধর্ম নিরপেক্ষতার 'অমৃতকথা' যত অবিরলভাবেই বহির্গত হোক, একজন হিন্দু লেখক হিসাবে সততই একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু; একজন ক্যাথলিক লেখক হিসাবেও ক্যাথলিক। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, নিন্দারও কিছু নেই; বরং এই ভূমিকা আমরা মনে করি সর্বার্থে প্রশংসনীয়। কারণ তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে মোনাফেকি করে না; আপন জাতি ও সম্প্রদায়ের হিতাহিত প্রশ্নে লেখক বলে উদাসীন থাকতে পারে না, তারা যথাকর্তব্যে অবিচল। অতএব আমাদের দ্বিতীয় সুপারিশটি হলো, একজন মুসলিম লেখককে তার লেখায় অবশ্যই মুসলমান থাকা জরুরি। 'আনন্দবাজারী' অভিনন্দনসহ যে কোন প্রলোভন উপেক্ষা করে তাকে ভাবতে হবে সে একজন মুসলমান; ভাবতে হবে ভাষার মত আল্লাহর এমন একটি শ্রেষ্ঠ নেয়ামতকে ঈমান ও আকীদা বিধ্বংসী অংশীবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা সকল মুসলিম লেখকের জন্য ফরজ।

তিন. তৃতীয় সুপারিশটা হলো, এক শ্রেণীর অবোধ ও স্বধর্মদ্রোহী লেখককে যে কোনভাবেই হোক সংযত রাখা। কিছু লেখক কবি ও নাট্যকার স্পষ্টতই আজ প্রকাশ্যে ও বীরদর্পে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে। বাকস্বাধীনতার নামে, তথাকথিত

www.pathagar.com

নান্দনিকতার নামে ইসলামকে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে শরবিদ্ধ করাই এই শ্রেণীর লেখকদের কাজ। এদের এই কুৎসিত অপকর্মকে কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার যে কোন বাহানা ও দুষ্কর্মের মূলোচ্ছেদ করা সাংবিধানিক দায়িত্বও বটে। নিকট অতীতে একদা রবীন্দ্র সঙ্গীতের একটি নির্দোষ প্যারডি ছাপা হওয়ার কারণে একজন সম্মানিত সম্পাদককে কারাগারে প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। হায়, কী সীমাহীন রবীন্দ্র ভক্তি! অথচ ইসলাম আক্রান্ত হলে, রাসূল (স)-কে অবমাননা করা হলে, আল কোরআন অপমানিত হলে, তাকে বলা হয় লেখকের নান্দনিক স্বাধীনতা। 'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায়'– ইসলামের প্রশ্নে, তাওহীদের আমানত অক্ষত রাখার প্রশ্নে, রাসূল (স)-এর শান ও সম্ভ্রম রক্ষার প্রশ্নে এই ধরনের নিরর্থক উদারতা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য জ্ঞান করতে হবে।

চার. মনে রাখতে হবে ক্ষুদ্রতম শিরকও একটি ক্ষমাহীন অপরাধ। কাজেই বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ যার লেখাই হোক, মুসলিম মানসে যদি গর্হিত অংশীবাদের প্রভাব ও আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে বা সৃষ্টি হয়, তাহলে শিরক থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই সেই লেখা বর্জন করা ওয়াজিব এবং এই জরুরি কথাটি মনে রেখে, কোনরকম কালক্ষয় না করে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও সাহিত্যের পাঠ্যসূচীতে গুরুত্বের সঙ্গে ইসলামী সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। এতে শিরকমুক্ত তাওহিদী বিশ্বাস, নৈতিকবোধ ও ঐতিহ্য-চেতনতা যেমন দৃঢ় হবে, একই সঙ্গে ইসলামী ভাষা ও পরিভাষা সম্পর্কেও সম্যক ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রসার ঘটবে।

পাঁচ. রাষ্ট্র ও সরকারের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সবাইকে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ইসলামী পরিভাষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেউ অবশ্য ভাবতে পারেন, এতে ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধারনা ভুল। বরং ভাষার প্রশ্নে যা পরীক্ষিত সত্য তাহলো, বহু শতাব্দীবাহিত যে-বিশ্বাস ও সংবেদনা, তাকে আশ্রয় করেই ভাষা প্রস্ফুটিত হতে চায়। যারা অন্যরকম কথা বলেন, তাদের অন্তত এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, ভাষা ও সাহিত্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষেরই প্রাণস্পন্দন। অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠের চিত্তমথিত সংবেগ ও বিশ্বাস ও হৃদস্পন্দনকে যে কোনরূপে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থই হলো, ভাষাকে ক্রমশ বিপন্ন করে তোলা। অতএব মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত ও আগত শাহাদাত, তামান্না, মাকসুদ, সওগাত, মনজিল, হিম্মত, বদনসীব, ইনসাফ, ইন্তেজার, কিস্‌মত, আমানত, জাহেলিয়াত, জিন্দিগী– এই জাতীয় শব্দের ব্যবহারে কোন সমস্যা তো নেইই, বরং বাংলাভাষার স্বাস্থ্যে স্বভাবে ও অবয়বে অনেক বেশি লাবণ্যই ফুটে ওঠার কথা।

www.pathagar.com

ছয়. আমাদের সর্বশেষ কথাটি হলো, এটা খুব উৎকটভাবে দৃশ্যমান যে, যারা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস ঐতিহ্য ও গৌরবগাথার পুনরুজ্জীবনে সংগ্রামী সাধনায় ব্রতী, ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যারা নিরলসভাবে কর্মিষ্ঠ, তাদের সংগ্রাম ও শ্রম সাধনার একেবারেই কোন স্বীকৃতি নেই। 'মৌলবাদী' বা 'ধর্মান্ধ' বা 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যায় চিহ্নিত হয়ে তারা বরং বিপুল উপেক্ষা ও অবহেলারই পাত্র। এই জন্যই একজন ক্যাবারে গায়িকা কি নর্তক অথবা নিরর্থক (নান্দনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় বিমূর্ত) ছবি আঁকিয়ে বা ভস্মস্তূপ নিয়ে গো-সন্ধানী গবেষকও সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে বৃত হতে পারে, কিন্তু কোটি কোটি তাওহিদী জনতার প্রীতিনন্দিত কোন কণ্ঠস্বর অথবা প্রকৃষ্ট হেদায়াতের একজন আত্মত্যাগী সংগ্রামী রাহবারকে নিয়ে কোন কথাই ওঠে না। সত্যই কী দুর্ভাগ্য এই জাতির। দুর্বোধ্য-অপাঠ্য পদ্য-লেখা কবিদেরও কত সম্মান; অথচ মুসলিম উম্মাহর শিরায়-ধমনীতে যারা নির্মল রক্তপ্রবাহ অব্যাহত রাখছেন, তাদের কোন মূল্যই নেই। কী ভারসাম্যহীন এই জনপদ! ন্যূনতম সুস্থতা থাকলেও এমন মাত্রাজ্ঞান বিবর্জিত ভারসাম্যহীনতা কখনো প্রশ্রয় পেতে পারে না।·আমাদের প্রস্তাব, যারা তাদের শ্রম অধ্যবসায় ও কোরবানী, মেধা ও মুহাব্বতকে আল্লাহর রাহে একীভূত করে এই জনপদে ইসলামী সাহিত্য রচনায় নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলেছেন, তাদের প্রতি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন করা অতীব জরুরি।

কিন্তু বড়ই দুর্ভাগ্য, আমাদের এ সকল কথায় কর্ণপাত করার মত কর্তৃপক্ষীয় মানুষের খুব অভাব; আর লেখকের তো একেবারেই অভাব। বরং এমন মানুষ এবং এমন লেখকের সংখ্যাই তো বিপুল, যারা যুগপৎ ক্রোধ ও গাম্ভীর্য নিয়ে বলবেন, 'অসহ্য! এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও রবীন্দ্রভ্রষ্ট মৌলবাদকে উৎখাত করার জন্যই তো বাংলাদেশ।' সত্যই কি তাই? তা যদি হয়, তাহলে তো বাংলাদেশের পরম কর্তব্য হলো, আর অযথা কালবিলম্ব না করে 'ভারতমাতার রাতুল চরণে' মাথা রেখে কোরবানী হয়ে যাওয়া। আফসোস! আমাদের অনেক পুণ্যবতী ধর্মপ্রাণা জননীর গর্ভে এমন সব সন্তানই জন্মগ্রহণ করেছে, যারা-যখন তখন যাকে-তাকে কারণে-অকারণে 'ধর্মান্ধ' 'সাম্প্রদায়িক' 'মৌলবাদী' বলে বদ্ধ উম্মাদের মত গালিগালাজ করা প্রিয় জ্ঞান করে। একবারও ভেবে দেখে না, কী বলছি কাকে বলছি কেন বলছি; সত্যই অন্ধত্ব একটি অভিশাপ। কিন্তু দুর্বাক্যে অনভ্যস্ত আমাদের রসনায় তো কোন কটুকাটব্য নেই; জবাবে আমরা কী বলি?

আমাদের একটা বক্তব্য, ভাষার প্রশ্নে আমরা যা কিছু সঠিক ও সত্য এবং এতদ্দেশীয় মুসলিম উম্মাহর জন্য হিতকর বলে অনুধাবন করেছি, সেই কথাগুলিই বলেছি এবং এই কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি, প্রাগুক্ত সুপারিশসমূহ যদি গুরুত্বের সাথে গ্রাহ্য ও কার্যকর হয়, কলকাতা-প্রভাবিত হিন্দু-বাংলার একাধিপত্য

www.pathagar.com

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসবে, ধীরে ধীরে বাংলাভাষার ধমনীতে সঞ্চালিত হবে মুসলিম মিল্লাতের প্রাণস্পন্দনে সদা-নিস্বনিত তাওহিদী প্রাণরস। এই কথা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যারা মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পান, তাদের ঘ্রাণ শক্তিকে প্রশংসা জানিয়ে বলি, কারো মনরক্ষা করা আমাদের কাজ নয়; কোন ক্ষমতা কি আনুকূল্যের কাছে আমরা কোন দাসখত লিখে দেইনি। আমাদের দাসখত লেখা আছে একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহর সন্তুষ্টিই আমাদের লক্ষ্য এবং তার কাছে জবাবদিহিতার ভয়ই আমাদের একমাত্র ভয়। আর আমরা আদৌ এতটুকু ধর্মান্ধ নই, আমরা ধর্মপ্রাণ। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের হিংসা দ্বেষ বলে কিছু নেই এবং আমরা কিছুমাত্র সাম্প্রদায়িকও নই। আমাদের 'অপরাধ', আমরা আমাদের স্ব-সম্প্রদায়কে ভালোবাসি, আপন সম্প্রদায়ের হিতাহিত নিয়ে বিচলিত হই। আর মৌলবাদকে যদি আমাদের 'পাপ' বলে চিহ্নিত করা হয়, আমরা সেই পাপকে আমাদের পরম সৌভাগ্য বলে স্বীকার করে নেব। আমরা কোন 'হলিউডি কমরেড' নই; আমরা হাওয়া বুঝে রং বদলে অভ্যস্ত কোন মৌসুমি আদর্শবাদী নই। আমাদের কোন গোপন সওদাগরি নেই, অতএব কোন গোপন অভিপ্রায় বা মাকসুদও নেই। রাসূল (স)-এর জীবৎকালে আমরা যা বলেছি, সাহাবাদের (রা) যামানায় আমরা যে সত্যকে জীবন দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিলাম, যে সত্যের আলোকবার্তা নিয়ে আমরা স্পেনে গিয়েছি, এসেছি ভারতবর্ষে; আজও সেই একই কথা বলি, আজও সেই একই সত্যের প্রতিষ্ঠা দেখতে চাই। এ হলো এমন এক শাশ্বত মৌলবাদ, যা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত অটুট ও অপরাজিত থাকবে। অতএব আমাদের এই এমন পরিষ্কার অবস্থান সত্ত্বেও, যারা আমাদের বক্ষদেশে শরবর্ষণ করে স্বর্গসুখ লাভ করেন, তারাই তারা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, 'চক্ষু তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়'। সূরা হজ্ব- আয়াত ৪৬); এবং 'বস্তুত আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার হেদায়াতের জন্য তোমরা কোন পথ আবিষ্কার করতে পারবে না।' (সূরা নিসা– আঃ ৮৮)। সত্যই দুঃখ হয়, আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম বাংলাভাষী বহু লেখকের বক্ষস্থিত হৃদয়ও অন্ধ, তাদের জন্য হেদায়াতের সকল পথও রুদ্ধ।

www.pathagar.com

কলির কেষ্টো

শফীউদ্দীন সরদার

একগুলো পয়গম্বর আরগুলো অবতার। চালচলন আদব-আখলাক আলাদা হলেও, কাজটা দুইয়ের প্রায় একই। অর্থাৎ, মানুষের মনের ময়লা পরিষ্কার করে তার পরম কল্যাণ সাধন করা। সূক্ষ্ম পার্থক্যটা হলো ঃ পয়গম্বরেরা পরকাল ও পরমজন প্রত্যাশী আর অবতারেরা ইহলোকে আত্মপ্রচারে বিশ্বাসী। পয়গম্বর পাঠান আল্লাহ। অপরদিকে পরম প্রভু নিজেই নাকি অবতার হয়ে ইহলোকে আসেন। শাস্ত্রকারদের কথা।

তা আসুন। তবে পয়গম্বর আর আসবেন না। শেষ পয়গম্বরের মাধ্যমেই পয়গম্বর পাঠানো শেষ করেছেন আল্লাহ। রইলো এখন অবতার। পরম প্রভু বিশ্ববাজার গরম করে কতবার যে অবতার হয়ে এ বিশ্বে অবতরণ করলেন, তার ইয়ত্তা নেই। তবে ভাব দেখে ধরে নেয়া হয়েছিল– শরম পেয়েই পরম প্রভুও শেষমেশ চরম অবস্থান নিয়েছেন। মেকার হয়ে এসে বেকার মানুষকে দেখার মতো করে মেরামত করার খাহেশ তাঁর মিটেছে। কয়লার ময়লা যে ধুলেও যায় না, এটা শেখার মতো আক্কেল তার হয়েছে। অমানুষকে মানুষ বানানোর ঠেকা আর তার নেই।

কিন্তু ওরে বাবা! একি উল্টা দৃশ্য! পরম পুরুষ তো পরম পুরুষ, তেত্রিশ কোটি দেবতারাই যে গুষ্টিসমেত অবতার হয়ে এ দুনিয়ায় অবতীর্ণ হবেন– এটা কি ভাবার কথা? কিন্তু বাস্তবে তাই হয়েছে। স্বর্গীয় মালগাড়িভর্তি হয়ে এসে তাঁরা এ দুনিয়ায় অবতরণ করেছেন। তা করবেন করুন আর অন্যের ঘাড়ে পড়ুন। কিন্তু না, সবার আগে পড়েছেন একদম আমাদের ঘাড়ে। এই অবতরণ করার পথে এ্যাকিসডেন্টের কারণে মালগাড়ির কয়েকটা বগি হঠাৎ করে উল্টে একদম আপসাইড ডাউন। ফলে, মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ার মতো কয়েক লক্ষ অবতার আগেই ঝরঝর করে ঝরে পড়েছেন এই সোনার বাংলার বুকে। ব্যস্, কর্মকাবার। অবতারগণ কোমর বেঁধে এখানেই স্বকর্মে মনোনিবেশ করেছেন। সোনার বাংলার মানুষকে সোনার মানুষ বানানোর দুর্মদ মানসিকতা নিয়ে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। স্বর্গের সুখ মর্তেই তাঁরা দিতে চান সোনার বাংলার মানুষদের। বাংলাটাকে বানাতে চান আনন্দভরা স্বর্গের নন্দন কানন। ছুটাতে চান এখানে ডু-ফুর্তির ফোয়ারা। বিভিন্ন নামে আর বিভিন্ন পরিচয়ে তাঁরা কর্মরত আছেন মানুষের রূপ ধরে। ছোট্ট বাংলাদেশ আর কয়েক লক্ষ অবতার। তাই, ঘুরতে ফিরতে প্রায়শই সাক্ষাত ঘটে এঁদের।

এমনই একজন অবতার কৌশিক আহমদ কেদার। বড়ই বিজ্ঞজন। পেশায় স্কুলের পণ্ডিত। লোকে বলে, উনি পণ্ডিত নন, উনি স্কুলের প্রভাষক। মিন্-মিন্ করে ছাত্র পড়ান

www.pathagar.com

না কৌশিক আহমদ কেদার। মহাপ্রভুর ভাষণ দেন ক্লাশে। তাক্ লাগান নাবালক ছাত্র-ছাত্রীদের। ভাষণ দেন সহকর্মীদের মাঝেও। অনগ্রসর, ধর্মান্ধ আর কূপমণ্ডুক মানুষেরাই অগ্রগতির বাধা– এই তথ্যই এই অবতার অহরহ প্রচার করে বেড়ান। বলা বাহুল্য, এটা ঐকতানে প্রচার করে বেড়ান এই কয়েক লক্ষ অবতারেরা সকলেই। এঁরা জরাজীর্ণ সমাজটাকে একটা ফূর্তিভর্তি বাগানবাড়ি বানানোর বাণী শুনান সবাইকে। কৌশিক আহমদ কেদারও সেই বাণী মানুষকে শুনান আর সেই স্বর্গীয় বাণী বিনামূল্যে দ্বারে দ্বারে ফেরি করে বেড়ান।

ভাষণ তাঁর গুরুগম্ভীর। মোহন্তজীর মতো ভাব গম্ভীর তাঁর চালচলন। স্বদেশী আন্দোলনের নেতার মতো এই কেদার মিয়া কাঁধে রাখেন সাইড ব্যাগ, মাথায় রাখেন কাঁধ ছোঁয়া বাবরী চুল, গায়ে দেন খদ্দরের লম্বা পাঞ্জাবী, পরিধান করেন ইয়াংকিদের পরিত্যক্ত তালি দেয়া জিনসের প্যান্ট। ভাবটা কবি-কবি, মুখে চটুল কবিতা। লেখা পড়েন কালকূটের, বুলি কপ্‌চান কার্লমার্ক্সের। অস্তিত্বে তাঁর ডারউইন, মস্তিষ্কে ফ্রয়েড্।

এহেন জনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার বাঙ্গালী কি কম আছে সোনার বাংলায়? অল্প দিনেই বেশ কিছু সাহাবা, তওবা, নন্দী ফিরিঙ্গী জুটে গেছে কেদার নাথের, থুড়ি, কেদার মিয়ার চারপাশে। নূর মুহম্মদ পার্থ কেদার মিয়ার এমনই একজন সদ্য দীক্ষিত সাগ্‌রেদ। পার্থ নামটা কৌশিক মিয়াই জুড়ে দিয়েছেন তার মূল নামের সাথে। এতে নাকি জৌলুশই বাড়ে নামের। অসাম্প্রদায়িকতার খোশবু ছড়ায় ভুর ভুর করে। তবে নূর মুহম্মদ পার্থ কৌশিক আহমদ কেদারের সদ্য দীক্ষিত শিষ্য হেতু গুরুর আদর্শ এখনও সে পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেনি। মাঝে মাঝেই নানারকম প্রশ্ন করে বসে।

একদিন খবরের কাগজ হাতে কেদার মিয়া মুড্ নিয়ে বসেছিল। নূর মুহম্মদ পার্থ এসে বলল– কি গুরু, খুব খুশি-খুশি ভাব যে?

বিজয় গর্বে কেদার মিয়া বললেন– ঠুকে দিয়েছি একখানা। কাঠমূর্খ এক নাদান, সাহিত্যের সংগাটাই জানে না, সেই ব্যাটা কয়দিন আগে কাগজে এক আর্টিকেল্ লিখেছিল। দিয়ে দিয়েছি তার এই দাঁত ভাঙ্গা জবাব।

হাতে ধরা কাগজটা নাচাতে লাগলেন কেদার মিয়া। পার্থ প্রশ্ন করলো– কি রকম, কি রকম?

কেদার মিয়া বললেন– আরে সে কথা আর কি বলবো! বইপুস্তক পড়ে না, সাহিত্যের খবর রাখে না, বিদ্যাবুদ্ধি দ্যাড় চোঙ্গা– সেই মূর্খ লিখেছে, অবসর বিনোদনের জন্যে খেলাধূলার প্রতি মানুষের আজকাল অধিক আকৃষ্ট হওয়ার কারণটা কি, সেই কথা। লিখেছে ঃ "ভাল গল্প উপন্যাস আর ভাল সিনেমা ছবি বাজারে এখন দুর্লভ বস্তু। বইপুস্তক সব যৌনতত্ত্বে ভরা আর সিনেমা-ছবি যাত্রা-নাটক সব অশ্লীলতায় ভরপুর। ছেলেমেয়েদের সাথে নিয়ে কোন সিনেমা-ছবি আজকাল আর দেখার উপায় নেই পিতামাতার। গল্প-উপন্যাসে কেবলই যৌন আবেদনের ছড়াছড়ি। কতকগুলো আবার

www.pathagar.com

এমন যে, ঘরে দুয়ার দিয়ে একা একা পড়া ছাড়া, প্রকাশ্যে পড়া যায় না। এসব কারণেই রুচিশীল মানুষেরা অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছেন খেলাধূলা। তাঁরা এখন বাধ্য হয়েই টি.ভি.তে ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা এসব দেখেন। অশ্লীলতার কারণে গল্প-উপন্যাস পড়া আর ছবি দেখা ছেড়েই দিয়েছেন প্রায়।" শোনো এবার মুর্খের কথাগুলো।

নড়েচড়ে উঠে পার্থ বলল– আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ লেখা তো আমিও পড়েছি কাগজে। কিন্তু লেখকটা তো কোন অজ্ঞ বা মূর্খ ব্যক্তি নন! বিলেত ফেরত আর বিজ্ঞজন তিনি। লেখালেখিতেও ইতিমধ্যে নাম করেছেন যথেষ্ট।

নাসিকা কুঞ্চিত করে কেদার মিয়া বলল– আরে ছোঃ! ও আবার একটা লেখক নাকি? জ্ঞানের কোন গভীরতাই নেই যার, তার লেখা গরুছাগল ছাড়া কোন মানুষে পড়ে?

পার্থ বলল– কেন পড়বে না। অশ্লীলতার ব্যাপারে উনি যা লিখেছেন তাতো মিথ্যা নয়?

কেদার মিয়া রুষ্ট কণ্ঠে বললেন– একশোবার মিথ্যা, হাজারবার মিথ্যা।

মিথ্যা! মিথ্যা কি করে? সিনেমা-ছবির কথাটা তো বলাই অবান্তর। আজকাল সাহিত্যেও যে অশ্লীলতা ঢুকেছে, যৌনতত্ত্বের যে উৎকট প্রচার শুরু হয়েছে, তাতে সাহিত্য যে আজ অশ্লীলতা মুক্ত– এ কথা বলবে কে?

বলতেই হবে। অশ্লীলতা বলে সাহিত্যে কোন কথা নেই। শ্লীল অশ্লীল– যে কথাই লেখা হোক, তা সবই সাহিত্য। সব কথাই মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আর সাহিত্য মানুষের জীবনের কথাই বলে, বুঝেছো?

পার্থ বলল– কিন্তু মানুষের জীবনে এমন অনেক গোপন ব্যাপার স্যাপার আছে যা খোলামেলা বলা যায় না আর বললে শিষ্টাচার থাকে না। ঐ লেখকের সাথে এ নিয়ে কথা বলেছি আমি। উনি বলেন, চোখ আছে বলেই সবকিছু দেখা যায় না আর নাক আছে বলেই সবকিছুর ঘ্রাণ নেয়া যায় না। রুচিশীল মানুষেরা তা পারে না। চোখ, নাক আছে বলেই ঢাকনা খুলে ডাস্টবিন দেখা আর তার ঘ্রাণ নেয়া রুচি ও স্বাস্থ্য এই দুইয়েরই বিরোধী। অশ্লীল সাহিত্য তাই সমাজের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

এসব সংকীর্ণ মনের কথা আর কূপমণ্ডুক মানুষের উক্তি। এইসব দুষ্ট লোকেরাই মানুষের মনের প্রসার ঘটতে দিচ্ছে না।

পার্থ প্রতিবাদ করে বলল– না না, উনি মোটেই দুষ্টলোক নন। খুবই সৎ, সরল আর পরহেজগার মানুষ। পরকালের ভয় তার ভীষণ।

প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে কৌশিক আহমদ বললেন– ওহ্‌হো! তোমাকে এখনও মানুষ করা গেল না! এতদিন ধরে তাহলে বলছি কি আর শিখলে কি? পরকাল বলে কোনকিছুই নেই।

নেই?

না। ঐ আল্লাহ-ঈশ্বর গড্-ফড্ সবই বোগাস। চরম ধাপ্পা। ওসব কোন কিছুই নেই। সবই মানুষের মনগড়া কথা।

www.pathagar.com

সেকি! ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য– এসবও কিছু নেই?

নেই-নেই, কিছুই নেই। ধর্মটা হলো মানুষকে ধোকা দেয়ার কেবলই একটা কৌশল। সবই গুল্ বুঝলে, প্রচণ্ড প্রতারণা।

তাহলে আমরা এই পৃথিবীতে এলাম কি করে?

আটোম্যাটিক্যালী। ডারউইনের "আরজিন অফ স্পেসিস্" থিওরী পড়োনি? বানর থেকেই দিনে দিনে আমরা মানুষ হয়ে গেছি।

তাহলে ঐ আদম হাওয়ার ব্যাপারটা?

কেবলই একটা গালগপ্পো। আস্ত একটা ব্লাফ্। মানুষকে ভুলিয়ে রেখে ধর্ম ব্যবসায়ীদের লুটেপুটে খাওয়ার সেরেফই একটা ফন্দি।

তাই?

তবুও সন্দেহ? নাঃ! এখনও তুমি অনঅগ্রসরই রয়ে গেলে, অগ্রসর মানুষ এখনও হতে পারলে না। প্রগতির সুবাতাস এখনও তোমাকে বিধৌত করতে পারেনি।

প্রগতির সুবাতাস?

হ্যাঁ। এই পৃথিবীকে সুন্দর আর আনন্দঘন করতে পারে একমাত্র প্রগতির প্রবাহ। কিন্তু অনগ্রসরতা, কূপমণ্ডুকতা আর ধর্মান্ধতা হলো প্রগতির পথের সবচেয়ে বড় বাধা। এই বাধাগুলো উৎখাত করতে পারলে তবেই এই পৃথিবীটা মানুষের নিরাপদ আবাসে আর নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আলয়ে পরিণত হবে।

তা হবে কি করে? পরকাল আর পাপপূণ্যের ভয় মানুষের মনে না থাকলে, মানুষ ন্যায় পথে আর সৎপথে চলবে কেন? মানুষ তো বাই নেচার একটা পশু। এ্যান্ এ্যানিম্যাল, বন্য পশুর তামাম বর্বরতা তার মধ্যে বিদ্যমান। একমাত্র পরকালের কথা, অর্থাৎ পাপের শাস্তির ভয়ই মানুষকে সৎ থাকতে বাধ্য করে। সেই ভয়ই যদি না থাকে, তাহলে তো মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে হানাহানিতে। পশুর আচরণ করবে।

কেদার মিয়া বললেন– করবে না, করবে না। প্রগতিই সব দাওয়াইয়ের বড় দাওয়াই, বুঝলে? প্রগতিশীল মানুষ মানেই অগ্রসর মানুষ আর অগ্রসর মানুষ মানেই সভ্য ও মুক্ত চিন্তার মানুষ। সভ্য মানুষের মুক্ত চিন্তা আর রুচিই তাকে তামাম অন্যায় থেকে বিরত রাখবে।

এ কথা আমি মেনে নিতে পারলাম না গুরু। মানুষ নামের ঐ পশুর ঠুনকো রুচি আর মুক্ত চিন্তা নামের কল্যাণহীন খেয়াল খুশি কখনো মানুষকে সৎ রাখতে পারে না। বড় রকমের স্বার্থ আর লোভ-লালসা সামনে পড়লে ঐসব কাল্পনিক বন্ধন এক পলকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। জবাবদিহিতা না থাকলে, কোন রেষ্ট্রিক্শানই রেষ্ট্রিক্শান নয়। পশুকে বশে রাখতে প্রয়োজন শক্ত মুগুর আর পরকালের ভয়ই সেই মুগুর। পূণ্যের পুরস্কার আর পাপের কঠোর শাস্তির প্রশ্নই, অর্থাৎ স্রষ্টার প্রতি ভয় আর ভক্তিই পারে পশু মানুষকে পশুত্ব থেকে মুক্ত রাখতে। অন্য কিছুই পারে না।

www.pathagar.com

অবশ্যই পারে। এ লাইনে তুমি একেবারেই নতুন। জ্ঞানবুদ্ধি পোক্ত হয়নি এখনও। পোক্ত হলেই বুঝতে পারবে সবকিছু। ওহো, অসময় হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠি। এখনই আমাকে মহিলা ক্লাবে যেতে হবে।

মহিলা ক্লাবে? সেখানে কি হয়?

নাচ হয়, গান হয়, নাটকের রিহেয়ার্সেল হয়, কাব্য-কবিতার প্রতিযোগিতা হয়। এক কথায়, যাবতীয় বাধা-বন্ধন আর কুসংস্কার থেকে মেয়েদের মুক্ত করা হয়। পর্দা আব্রু সরিয়ে মেয়েদের পুরুষের কাতারে দাঁড় করানো হয় আর পুরুষের সমঅধিকার দান করা হয়।

সেকি! পর্দা-আব্রু সরিয়ে একদম ফ্রি মিক্সিং?

অফকোর্স। মৌলবাদী আর ধর্ম ব্যবসায়ীদের ভণ্ডামী উৎখাত করতে না পারলে, নারী স্বাধীনতা আসবে কি করে? প্রগতির পরশ তারা পাবে কি করে?

তাহলে লীড্ টুগেদারও বুঝি এই প্রগতির একটা অংশ?

অবশ্যই। নারী-পুরুষ সকলেই স্বাধীন হয়ে জন্মেছে। নিজের ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে চলবে তারা– এই তো অগ্রসর আর সভ্য মানুষের কথা। প্রগতির পরিচয়। পশ্চিম দেশগুলোর দিকে তাকাও তাহলেই বুঝতে পারবে।

একটু থেমে নূর মহম্মদ পার্থ ইতস্তত করে বলল– দেখুন গুরু, প্রগতির পরিচয় আর শিক্ষা যাই হোক, আপনি একজন শিক্ষক। ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ। অনৈতিক আর অসামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে আপনি জড়িত থাকলে, সে আদর্শ কিন্তু মিস্‌মার হয়ে যাবে।

পাগল! তাই কি আমি মিস্‌মার হতে দেই? আমি কি প্রগতিশীল মানুষ নই? মৌলবাদীদের মতো আমি কি নোংরা আর নির্বোধ? রুচি নেই আমার? আমি অগ্রসর মানুষ।

একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে এসব মনোয়ারের জানার কথা নয়। প্রগতির প্রাণপুরুষ কৌশিক আহমদ কেদারের রুচি, চরিত্র আর আদর্শের বড়াই লোক মারফত একদিন মনোয়ারের কানে এসে পড়লো। শুনে বরং খুশিই হলো সে। মানুষ আদর্শবাদী হোক, আদর্শ চরিত্রের হোক– এই তো চাই।

সেবারে বাড়িতে ছিল এক সপ্তাহের ছুটিতে। আরো চার-পাঁচ দিন কোর্টে বসতে পারেনি না নানা রকম সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ। শেষে কোর্টে এসে চেম্বারে ঢুকতেই বেশ কয়েকটি নতুন কেসের কাগজপত্র এনে টেবিলে দিলো পেশকার সাহেব। জানতে চাইলো, আজ এজলাসে বসার সময় হবে কিনা। সময় হবে এ কথা জানিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম– এতগুলো নতুন কেস্, সবগুলো কি আজই হলো?

www.pathagar.com

পেশকার সাহেব বললো– না স্যার। এ দুটি একশো সাত ধারার কেস এসেছে আজ। এ তিনটি মেয়েছেলের কেস্ দাখিল হয়েছে বিগত পৃথক পৃথক তিন দিনে। কেসগুলো জটিল বলে যিনি আপনার চার্জে ছিলেন, তিনি আপনার জন্যেই কেস তিনটি রেখে দিয়েছেন। কোন অর্ডার তিনি অর্ডার শিটে লেখেননি।

জটিল কেস শুনে মেয়েদের আর্জিগুলো পরপর একটানা পড়ে ফেললো মনোয়ার। অবাক হয়ে দেখলো, দুটি মেয়ের অভিযোগ একেবারেই এক ও অভিন্ন। বিয়ের লোভ দেখিয়ে তাদের সম্ভোগ করা হয়েছে এবং মেয়ে দু'টি এখন গর্ভবতী। কিন্তু তাদের বিয়ে করতে এখন অস্বীকার করেছে আসামী। তৃতীয় মেয়ের অভিযোগও প্রায় কাছাকাছি। দীর্ঘদিন লীভ-টুগেদার করার পর কেটে পড়েছে আসামী, আর ধরা দিচ্ছে না। আরো তাজ্জব হয়ে লক্ষ্য করলো সে– তিন কেসেরই আসামী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। আর সে ব্যক্তিটি হলেন প্রগতির প্রবক্তা ঐ কৌশিক আহমদ কেদার। বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো মনোয়ার– একি পেশকার সাহেব, প্রগতির ঢোলবাজানো কেদারের এই চরিত্র শেষ পর্যন্ত! এত সভ্যতার কথা বলতেন আর নীতি আদর্শ কপ্চাতেন– সেই কৌশিক আহমদ তিনটি কেসেরই আসামী?

পেশকার সাহেব ঈষৎ হেসে বললো– আর একটা কেসেরও আসামী স্যার। পুলিশেরা সে কেস্ নিয়ে আসছে আজই।

কি রকম?

শিক্ষকতা পেশার মুখে নূড়ো জ্বালিয়ে দিয়ে কৌশিক আহমদ কেদার মিয়া আজ মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়েছিলেন শুড়ি খানার সামনে। অর্ধোলঙ্গ অবস্থা। টের পেয়ে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। কোর্ট সাব্ইন্স্পেকটার সাহেব আজ এজলাসে দাখিল করবেন সে কেস্। হাজির করবেন আসামীকেও।

হুঁশবুদ্ধি হারিয়ে ফেললো মনোয়ার। কিছুটা অজ্ঞাতেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল– "জয় বাবা প্রগতির পোলা, সাব্বাশ বাবা কলির কেষ্টো ঠাকুর, তুম্ যুগ যুগ জিও"।

www.pathagar.com

ইকবাল সাহিত্যের আদর্শ

আবদুল মান্নান তালিব

মানুষ নিজে সৃষ্টি হয়নি। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের স্রষ্টা তাঁর ইচ্ছামতো মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এই বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিস মানুষ ব্যবহার করছে। এগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতাও তার আছে। এ থেকে বোঝা যায়, এগুলো সেই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সেই একজন স্রষ্টা মানুষকে দুনিয়ায় চলার জন্য জীবন বিধানও দিয়েছেন। মানুষের নিজের প্রকৃতি এবং বিশ্ব জাহানের সমস্ত জিনিসের প্রকৃতি, শক্তি, প্রবণতা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই জীবন বিধান তৈরি করা হয়েছে। তাই এর নাম ইসলাম অর্থাৎ সেই স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পন এবং যেভাবে তিনি চলার বিধান দিয়েছেন সেভাবে চলা। জীবনের কোনো ক্ষেত্রকে তিনি এই বিধানের বাইরে রাখেননি। কোনো ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনভাবে চলার অনুমতি দেননি। কারণ সকল ক্ষেত্রে যদি এই বিধান মেনে চলা হয় এবং একটি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চলা হয় তাহলে সমস্ত জীবনে বিশৃংখলা দেখা দেবে। জীবনের একটি ক্ষেত্রে অসমঞ্জস কার্যকলাপ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের সামঞ্জস্য বিনষ্ট করবে।

এ বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করলে বোঝা যায়, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রবণতা সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সাহিত্য প্রবণতা। এই সাহিত্য প্রবণতার চাহিদা পূরণ করার জন্য তিনি বিধানও দিয়েছেন। কুরআনে তিনি এই সাহিত্য প্রবণতাকে সঠিক পথে চলার জন্য দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

'বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। কারণ তারা উদভ্রান্ত পথহারাদের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এবং তারা যা করে না তাই বলে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে বারবার আর জুলুমের প্রতিবিধান করে। (শু'আরা ঃ ২২৪-২২৭)

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ প্রবণতাটাকে সঠিক পথে চলার ব্যবস্থা করেছেন। নবী তাঁর যুগের এক জাহেলী কবির কবিতার একটি চরণ– আলা কুল্লু শাইয়িন মা খালাল্লাহ্ বাতিলু– 'জেনে রাখো আল্লাহ ছাড়া বাকি সবই মিথ্যা'- উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, এই কবির এই চরণটি সত্য। একদিন সাহাবী শারীদ (রা) নবীর পেছনে সওয়ার ছিলেন। নবী (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উমাইয়া ইবনে আবিস্ সাল্তের কোনো কবিতা জানো? তিনি বললেন, জানি। আদেশ করলেন, তাহলে একটি শোনাও। শারীদ উমাইয়ার একটি কবিতা শোনালেন। বললেন, আর একটি

www.pathagar.com

শোনাও। তিনি আর একটি শোনালেন। বললেন, আর একটি। এভাবে একটি একটি করে একশটি কবিতা শোনালেন। অন্য একদিন সাহাবী আবু সাঈদ খুদবীর (রা) সাথে তিনি যাচ্ছিলেন 'আরজ' এলাকা দিয়ে। পথে এক কবি তার (অশ্লীল) কবিতা আবৃত্তি করতে করতে চলছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, ধরো শয়তানটাকে অথবা আটক করো শয়তানটাকে। তারপর বললেন ঃ

'মানুষের পেট কবিতায় ভর্তি থাকার চাইতে বমিতে ভরে থাকা ভালো।'

এভাবে নবী নিজেই সাহিত্যের দিকনির্দেশ করেছেন। বিগত চৌদ্দশ বছর ধরে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় যে সাহিত্য চর্চা করেছেন, সেখানে রসূলের এই দিকনির্দেশনাই মোটামুটি তাদের সামনে থাকে। এটাই তাদের জন্য আলোকবর্তিকা। তাই বিশ্বাসহীনতা, অনাচার, নৈরাজ্য তাদের সাহিত্যে আদর্শ হতে পারেনি। এদিক দিয়ে বিশ শতকের সাহিত্য অংগনে ইকবালই ইসলামী আদর্শের সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন। ইসলামী আদর্শের কারণে ইকবালের সাহিত্যে যে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে সেদিক দিয়ে বিচার করে বলা যায় ঃ

এক. ইকবালের সাহিত্য পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের জন্য। তিনি কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ গোষ্ঠীর ও জাতির জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। মর্দে মুমিন তাঁর আদর্শ, মুসলমান জাতির একজন সদস্য হিসাবে নয়, বরং আল্লাহর নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ বান্দা হিসাবে। জাতি বা ন্যাশন বর্তমান বিশ্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ ও ট্রাডিশনের সাথে তাকে যেভাবে সংযুক্ত করা হয়, মুসলমান আসলে সে অর্থে কোনো জাতির নাম নয়। মুসলমান শব্দটিও এসেছে 'ইসলাম' ও 'সালাম' শব্দ থেকে। এর অর্থ হয় মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর অনুগত হওয়া এবং তাঁর নির্দেশ মতো জীবনের পথ পরিক্রমা করা। এই অর্থে মুসলমানও সংকীর্ণ 'জাতি' শব্দের গণ্ডীর আওতায় পড়ে না। আর মুমিনের তো কোনো বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হবার প্রশ্নই ওঠে না।

দুই. ইকবালের সাহিত্যে বিশ্বাসকে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবনের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও লয় তিনটিই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ঈমানেরই ফল। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া এ তিনটির কোনো অস্তিত্বই নেই।

তিন. মানুষ যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, যে সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে শোষণ ও নিপীড়নের ধারাকে মানবিক মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে এবং সমাজ ব্যবস্থায় যে বৈষম্য, জুলুম, বিদ্বেষ ও স্বার্থপূজার প্রচলন করেছে ইকবাল তার পুনরমূল্যায়ন করতে চান এবং তাকে নেকী, সততা, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সুগঠিত করার পরামর্শ দেন।

চার. ইকবাল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে চান। তিনি বলেন ঃ

www.pathagar.com

'মিল্লাতের সংযোগেই ব্যক্তির অস্তিত্ব
একাকী কিছুই নয়,
তরংগ প্রাণবন্ত সাগরের বুকে
সাগরের বাইরে কিছুই নয়।'

ব্যক্তি যেন এত বেশি ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে যায় যা তাকে ডিক্টেটরের আসনে বসিয়ে দেয়, আবার সমাজ ব্যক্তি স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করে ব্যক্তিকে সমাজের একান্ত দাসে পরিণত করতে না পারে, এদিকেও ইকবাল দৃষ্টি রেখেছেন।

পাঁচ. প্রত্যেক ব্যক্তি মূলত একটি স্বাধীন ও পূর্ণাংগ সত্তা। তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে একটি উদ্দেশ্যে ও লক্ষে পৌঁছার জন্য। এই লক্ষে পৌঁছাতে হলে তার নিজস্ব গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে তাকে উত্তরোত্তর অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। আল্লাহর দুনিয়ায় কারোর সে বান্দা নয়। সে একমাত্র আল্লাহর গোলাম। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সে মাথা নত করে না। আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার সব কিছুর গোলামী অস্বীকার করার ক্ষমতা ব্যক্তিকে পূর্ণাংগ মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত করে এবং এভাবেই সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হয়।

বলা যায়, সাহিত্য ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারাকে ইকবাল কেবল পুনরুজ্জীবিতই নয়, প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। আধুনিক বিশ্বে ফরাসী বিপ্লব ও রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লব সাহিত্যকে যে ভাবধারা সরবরাহ করেছে তা মানবতার জন্য কল্যাণকর হয়নি। বিশ্বব্যাপী তা এক বিশ্বাসহীনতা এবং তা থেকে সৃষ্ট নৈরাজ্যের প্লাবন ডেকে এনেছে। সে ক্ষেত্রে ইকবালের সাহিত্যের আদর্শ মানুষকে বিশ্বাসী, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্মঠ হবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। তাই বিশ্বব্যাপী ইকবালের কদর বেড়ে যাচ্ছে। এই উপমহাদেশে ও এশিয়া আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর সীমানা পেরিয়ে শুধু ইংল্যান্ড ও জার্মানীতেই নয়– ফ্রান্স ও রাশিয়াতেও ইকবালের সাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কবির সমকালীন বিশ্ব তাঁর কবিতাকে যথার্থ মর্যাদা দেয়নি বলে কবি মোটেই ক্ষুব্ধ ছিলেন না; বরং তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, আগামীর বিশ্ব তাঁর কবিতার মর্ম বুঝতে পারবে এবং তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দেবে। কবির এ আশা আজ পূরণ হয়েছে এবং হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের দেশে জাতীয় পর্যায়ে ইকবাল সাহিত্যের চর্চার বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিগত শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে যতটুকু চর্চা শুরু হয়েছিল পরবর্তী সময়গুলিতে তার ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থেকেছে। মনে হয়, ইকবালের রাজনৈতিক আদর্শের একটা বাহ্যিক খোলসকে এখানে অনর্থক বড় করে দেখাবার প্রবণতা কাজ করেছে। কালের গতিময়তাও চিরন্তনতায় তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করা হয়নি। তাঁর সাহিত্যের আদর্শ আজ যেখানে বিশ্ব সাহিত্যের আদর্শ হবার যোগ্যতায় অভিসিক্ত হতে চলেছে, সেখানে আমরা তা থেকে দূরে থেকে শুধু নিজেদের ক্ষতির পসরা কেবল বাড়িয়েই চলছি।

www.pathagar.com

ইকবাল চিন্তার একটি দিক

ইকবাল শুধু একজন কবিই নন, একজন দার্শনিক এবং চিন্তাবিদও। কিশোর বয়স থেকেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। প্রথম বয়সে তাঁর চিন্তায় যে অপরিপক্কতা ছিল তাঁর সে সময়কার কবিতাগুলোতে তার ছাপ রয়েছে। ধীরে ধীরে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে তিনি পরিচিত হতে থাকেন এবং জীবন, জগত, মানুষ, সৃষ্টি, কর্ম ও কর্মফল ইত্যাদি জীবনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ হতে থাকে।

জীবন তাঁর কাছে এমন এক শক্তির নাম যা অনবরত গতিশীল থাকে। আর গতিশীলতার মধ্য দিয়েই সে উন্নতির সোপান অতিক্রম করতে থাকে। কিন্তু যে শক্তিটি জীবনকে গতিশীল রাখে এবং তার অস্তিত্বকে অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে টেনে বের করে এনে জীবনের ক্রমোন্নতির পর্যায় অতিক্রম করায় সেটি হচ্ছে তার খুদী বা অহংবোধ। ইকবাল চিন্তা ও ইকবাল সাহিত্যের দুটি কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে, মানুষের জীবনের সীমাহীন সম্ভাবনা এবং বিশ্ব জাহানের ওপর মানুষের প্রাধান্য। আর এ দুটিরই পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে তার খুদী। মানুষের এই খুদীর অন্তরনিহিত শক্তিকে আল্লাহ কুরআন মজীদে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

'মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু থেকে তারপর কালক্রমে সে হয়ে উঠেছে একজন প্রচণ্ড বিতর্ককারী।' –(আন নহল ঃ ৪)

এর মানে হচ্ছে, নিজের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা, নিজের কথা ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বীকৃতি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আদায় করে নেয়া এবং প্রতিপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা তার রয়েছে। মানুষের এসব আভ্যন্তরীণ শক্তি ও গুণাবলী মূলত তার খুদীরই অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষের মধ্যে তিনি এ ধরনের খুদীর শক্তি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ইকবালের মতে দুনিয়ায় চলছে একটি নিরন্তর দ্বন্দ্ব সংঘাত। এখানে সংঘাত মুখরতা, কঠোর পরিশ্রম ও লাগাতার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের নামই জীবন। কবি মানুষের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা শক্তিগুলিকে সচেতন করে তাদেরকে দুনিয়ার এই কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে কাজে লাগাবার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ শুধুমাত্র এই দুনিয়ায় জন্ম নেবার কারণেই একজন মানুষ জীবন লাভের হকদার হয়ে যায় না। বরং তাকে নিজের শক্তি ব্যবহার করে এই দুনিয়ায় স্থান করে নিতে হয়। এভাবে সে নিজের জীবন লাভের প্রমাণ পেশ করে। তুচ্ছ বালুকণাও যদি প্রেমের পাঠ গ্রহণ করে জীবন সচেতন হয়ে ওঠে তাহলে তার আভায় চন্দ্র ও সূর্যের ঔজ্জ্বল্যও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কবির ভাষায় ঃ

'প্রেমের অক্লান্ত প্রয়াস যাকে দেয় উড়ে বেড়াবার স্বাদ
সে তুচ্ছ বালুকণাও করতে পারে চন্দ্র ও সূর্যকে বিধ্বস্ত।'

www.pathagar.com

ইকবালের মতে জীবন হচ্ছে আশা আকাংখার আর এক নাম। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন আকাংখার জন্ম দেয়াই জীবনের কাজ। আশা-আকাংখার জন্ম ব্যাহত হলে জীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। আর এই জীবনের মূল পরিচালিকা শক্তি হচ্ছে খুদী। খুদী হচ্ছে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। খুদী আল্লাহর নূর। সে মানুষের আলস্য ও কর্মবিমুখতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাকে দান করে স্বাধীন কর্মক্ষমতা। আর এটি এমন একটি গুণ যার মাধ্যমে প্রত্যেক বস্তু তার মূল অস্তিত্বের সাথে পরিচিতি লাভ করে এবং তার আশা-আকাংখাকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করে। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য-লক্ষ সুলভ, নিম্নমুখী ও তুচ্ছ-নগণ্য না হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য ও লক্ষ যতই উচ্চ, বুলন্দ ও শ্রেষ্ঠতর হবে ততই খুদীর গুণাবলীর মধ্যে ঔজ্জ্বল্য ও শক্তি সঞ্চারিত হবে। কারণ নতুন নতুন ও নিষ্পাপ-পরিচ্ছন্ন উদ্দেশ্য লাগাতার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম এবং অশেষ আশা আকাংখাকে জাগ্রত করে। আর জীবন গঠনে আশা-আকাংখা-কামনা-বাসনাই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তবে খুদীকে যথাযথভাবে লালন করতে হবে। তাকে জীবনের পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত করার জন্য তার লালনকে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করতে হবে।

প্রথম পর্যায় আনুগত্য,
দ্বিতীয় পর্যায় আত্ম সংযম এবং
তৃতীয় পর্যায় আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব।

কবি জীবনকে ঝিনুক এবং খুদীকে বহুল প্রত্যাশিত বসন্তকালীন দুর্লভ বারিবিন্দুর সাথে তুলনা করেছেন, যে বারিবিন্দুর পতনে ঝিনুকের গর্ভে দুর্লভ মুক্তো জন্ম নেয় বলে কথিত আছে। কবির ভাষায় ঃ

'জীবন ঝিনুক যেন
খুদী যেন দুর্লভ বারিবিন্দু,
সে আবার কেমন ঝিনুক
বিন্দুকে যে মুক্তো বানাতে অক্ষম!
খুদী যদি হয় আত্ম প্রত্যয়ী
আত্ম সংযমী ও আত্মবিশ্লেষক
তাহলে এটাও সম্ভব
মৃত্যু তোমাকে মারতে অক্ষম হবে।'

পার্থিব জীবনে আল্লাহর বিধান মেনে চলে খুদীকে এই পর্যায়ে উন্নীত করা যেতে পারে।

খুদীর সাথে সাথে ইকবাল ফকরকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ খুদীর উন্নয়ন ও তাকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছানো ফকর ছাড়া সম্ভবপর নয়। ফকরের একটি মানে দারিদ্র এবং এর দ্বিতীয় মানে আল্লাহ নির্ভরতা। অর্থাৎ অভাব বোধ না করা এবং তা দূর করার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা। এই ফকর সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'ফকর' তথা অভাবহীনতা ও আল্লাহ নির্ভরতাই আমার অহংকার।

ইকবাল একে বলেছেন ইসলামের প্রাণ। আর এই প্রাণবস্তুটিই খুদীকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়। ফকরকে তিনি বলেছেন 'যিকির' ও 'ফিকির' এর সমষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে দুনিয়ার শাসনদণ্ড লাভ করা। এভাবে ফকর যখন খুদীকে পূর্ণতার পর্যায়ে উন্নীত করবে তখন–

'খুদীর তরবারি চড়ে যখন ফকরের শান প্রস্তরে
এক সিপাহীর আঘাত হয় একটি সেনাদলের সমান।'

খুদীকে যদি তলোয়ার ধরা হয় তাহলে সেই তলোয়ারের শান প্রস্তর হয় তওহীদ। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শান প্রস্তরে ঘসে খুদীকে পূর্ণতা দান করতে হবে। এই লা-ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ তথা তওহীদকেই কবি ফকর হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মুমিন দুনিয়া ও আখেরাতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর সকল শক্তিকেই অস্বীকার করে। দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে এবং তাঁরই ওপর ভরসা করে। আর কোনো শক্তিকে সে ভরসার যোগ্য মনে করে না। এই ফকরের শক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার অসভ্য, বর্বর, অশিক্ষিত জাতিদের পুরোধায় অবস্থানকারী আরবরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে দুনিয়ার শাসকে পরিণত হয়ে গেলো এবং বিশ্ববাসীকে সভ্যতার শিক্ষাদান করলো।

সবশেষে বলবো, বাংলা ভাষায় ইকবাল চর্চা আমাদের সাহিত্যের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি করবে এবং তাকে দেবে নতুন দিগদর্শন।

www.pathagar.com

জাতীয় ভাবাদর্শের কবি গোলাম মোস্তফা

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের প্রদোষ-কালে কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম। কবি হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত হলেও, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। একাধারে তিনি কবি, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, শিশুতোষ-রচয়িতা, অনুবাদক, পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রবিকরোজ্জ্বলে উদ্ভাসিত বাংলা সাহিত্যাকাশে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। অন্যদিকে, তাঁর সমসাময়িক কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার খর-রৌদ্রতাপে বাংলা সাহিত্য যখন দীপ্ত-সমুজ্জ্বল, গোলাম মোস্তফা তখনো একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে সমাদৃত। মূলত নজরুলের আবির্ভাবের বেশ খানিকটা আগেই গোলাম মোস্তফার কবি-খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি হিসাবে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

১৮৯৫ ঈসায়ী মুতাবিক বাংলা ১৩০২ সন ৭ই পৌষ রবিবার মনোহরপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহতে কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম। অনেকে তাঁর জন্ম সন ১৮৯৭ বলে উল্লেখ করে থাকেন। এর কারণ তাঁর প্রকৃত জন্ম সন আর সার্টিফিকেট লিখিত জন্ম তারিখ এক নয়। তাঁর সার্টিফিকেটে উল্লিখিত জন্ম সন ১৮৯৭ কিন্তু প্রকৃত জন্ম সন ১৮৯৫। এ সম্পর্কে 'আমার জীবন স্মৃতি'তে কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন ঃ

'আমার জন্ম পল্লী হলো ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) শৈলকুপা থানার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে। আমার ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের বর্ণনানুসারে দেখা যায় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার মনে আছে শৈলকুপা হাইস্কুলে ভর্তি হবার সময় আমার আব্বা আমার বয়স প্রায় বছর দুই কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্রকৃত জন্ম হয়েছিল সম্ভবত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। তবে এটা ঠিক যে, যেদিন আমার জন্ম হয় সেদিন বাংলা তারিখ ছিল ৭ই পৌষ রবিবার।'

বিখ্যাত কুমার নদীর তীরবর্তী মনোহরপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রাখ্যাত কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম। কবির পিতার নাম কাজী গোলাম রব্বানী এবং দাদার নাম কাজী গোলাম সরোয়ার। তাঁরা উভয়েই শিক্ষিত ও কাব্য-রসিক ছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষায়ও তাঁদের যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। কবির আদি পিতৃভূমি ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত নিভেকৃষ্ণপুর গ্রামে। এ সম্পর্কে কবির দ্বিতীয় পুত্র মোস্তফা আজিজ লিখেছেন ঃ

'বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি গোলাম মোস্তফা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে (?) যশোর জেলার (সাবেক ঝিনাইদহ মহকুমা, বর্তমানে জেলা) মনোহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী গোলাম রব্বানী আর দাদার নাম কাজী গোলাম সরোয়ার। তিনিও ছিলেন আরবী ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত। তখন তাঁর আদি বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে রাজবাড়ী জেলা) অন্তর্গত পাংশা থানার 'নিভেকৃষ্ণপুর' গ্রামে।.....এরপরে আমার দাদা মরহুম কাজী গোলাম রব্বানী মনোহরপুরে বিয়ে করে এখানেই বসতবাটি হিসাবে বসবাস করার পরিপ্রেক্ষিতে মনোহরপুরই আমাদের জন্মভূমি নামে সুপরিচিতি লাভ করেছে।'

মনোহরপুর কাজী পরিবারে পূর্ব থেকেই বিদ্যাশিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা চলে আসছিল। বাংলা ছাড়াও আরবী ফারসী ভাষার চর্চা ছিল সেখানে। কবির পিতা ও পিতামহ উভয়েরই গ্রাম্য কবি হিসেবে বিশেষ খ্যাতি ছিল। মনোহরপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী বিজুলিয়া গ্রামে এক সময় নীল কুঠি ছিল। ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে নিরীহ গ্রামবাসী কৃষক অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন কবির পিতামহ কাজী গোলাম সরেয়ার। তিনি নীলকরদের অত্যাচার-নির্যাতনের বর্ণনা সংবলিত একটি গান রচনা করেন, যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কথিত আছে, কবির পিতা গোলাম রব্বানী তৎকালে প্রকাশিত হিতবাদী, মিহির ও সুধাকর, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন এবং নিয়মিত সাহিত্য-চর্চা করতেন। তৎকালে মুসলিম সমাজে রাত্রিবেলা বাড়ী বাড়ী পুঁথি পাঠের আসর বসতো। কবির পিতা গোলাম রব্বানী নিজ বাড়ীতে পুঁথি পাঠের আসরে সুর করে পুঁথি পাঠ করতেন। এসব পুঁথির মধ্যে জঙ্গনামা, আমীর হামজা, কাসাসুল আম্বিয়া, গুলে বকৌলি ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির পরিবার ও তাঁর পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে কবির জ্যৈষ্ঠা কন্যা ফিরোজা খাতুন তাঁর লেখা 'আমার আব্বা কবি গোলাম মোস্তফা' নামক স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ

'কবি গোলাম মোস্তফার পিতার জন্ম কাজী বংশে। তিনি মুন্সীগিরি করতেন পোস্ট অফিসে, তাই তাঁর নাম ছিল মুন্সী গোলাম রব্বানী। পুঁথি পড়ার আসর বসাতেন, বিয়ের উপহারপত্র লিখতেন, নীলকর বিরোধীদের কবিতা ও শ্লোগান লিখে দিতেন। তবু আমার মনে হয় আব্বার প্রতিভা ও পরিবেশ দাদীর কাছ থেকেই বেশি প্রভাবিত। .....এক দিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে, আব্বাস উদ্দীন সাহেবকে নিয়ে আমাদের দেশের বাড়িতে আব্বা সাত দিন ধরে এক বিরাট গানের জলসা বসিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের মান্যগণ্য গায়ক, শ্রোতা, সাধারণ মানুষের ভিড়ে বাড়ীসহ সারা গ্রাম মুখরিত। প্রতিদিন গরু-ছাগল-মুরগী পুকুরের মাছ রাঁধা হত, খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, গল্প গুজবের সে যে কি আনন্দমুখর পরিবেশ– তা উপভোগ করা ছাড়া বর্ণনায় বলা সম্ভব নয়। তখন গায়ক আব্বাস চাচা গিয়েছেন দাদীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ির মধ্যে। দাদী বললেন, 'কি দেখতে আসছো বাবা। খোকা (আব্বার ডাক নাম) আমার সরোবরের পদ্মফুল– ওপর থেকে দেখাই ভাল.....বোঁটা বেয়ে গোড়ায় গেলে শুধু পাঁক (কাদা) পাবে'। চাচা মুগ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন– 'যে স্থান থেকে ঐ পদ্মফুলের উৎপত্তি সেই পাক স্থানকেই

www.pathagar.com

(পবিত্র) সালাম করতে এলাম'। এ রকমভাবে সব সময় তিনি শ্লোক, উপমা, ছড়া ও স্বরচিত সুরসিক, সুমধুর বাক্যে কথা বলে মানুষ আকর্ষণ করতেন।' (নতুন কলম, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ১৯)

মাত্রও চার বচর বয়সে পিতার নিকট কবি গোলাম মোস্তফার লেখাপড়ায় বিসমিল্লাহখানি। তারপর প্রথমে পার্শ্ববর্তী দামুকদিয়া গ্রামের পাঠশালা অতঃপর ফাজিলপুর গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। এরপর কবি শৈলকুপা হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯১৪ ঈসায়ীতে। অতঃপর ১৯১৬ সনে খুলনার দৌলতপুর কলেজ থেকে আই.এ.ও ১৯১৮ সনে কলকাতর রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এরপর তিনি শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকাকালে কবি ১৯২২ সনে কলকাতা ডেভিড হেয়ার কলেজ থেকে বি,টি পাশ করেন।

শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হয়ে কবি প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর সরকারী হাইস্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯২৪ সনে সেখান থেকে কলকাতা হেয়ার স্কুলে বদলী হন। এরপর ১৯৩২ সনে কলকাতা মাদ্রাসায় যোগ দেন। সেখান থেকে ১৯৩৫ সনে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট ডিমনস্ট্রেশন হাইস্কুলে প্রথম সহকারী প্রধান শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর কিছুকাল হুগলি কলেজিয়েট হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক, বাঁকুড়া জেলা স্কুলে (১৯৪০-১৯৪৬) প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষে ফরিদপুর জেলা স্কুলে ১৯৪৬-১৯৫০ সন পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ঢাকায় শান্তিনগরে বাড়ি করে সেখানেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। এ সময় তাঁর বাড়ি 'মোস্তফা মঞ্জিল' সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৯৬৪ সনের ১৩ অক্টোবর সেরিব্রাল থ্রম্বসিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ৬৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি কবি গোলাম মোস্তফা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথেও জড়িত ছিলেন। ১৯২৭ সনে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র মুখপত্র 'সাহিত্যিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি সুসাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরীর সাথে যৌথভাবে এর সম্পাদনা করেন। ১৩৬৭ সনে প্রকাশিত পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পূরবী'র তিনি যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ আব্দুল হাই। 'পূরবী'র মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর গোলাম মোস্তফার একক সম্পাদনায় রাইটার্স গিল্ডের মুখপত্র 'লেখক সংঘ পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। 'নও বাহার' পত্রিকাটিও তিনি পরিচালনা করতেন। এ পত্রিকাটির সম্পাদিকা ছিলেন কবির দ্বিতীয় স্ত্রী মাহফুজা খাতুন।

কবি গোলাম মোস্তফা প্রকাশনা ও পুস্তক পরিবেশনার কাজেও কিছুটা জড়িত ছিলেন। কলকাতার ৪৫নং মির্জাপুর স্ট্রীটে 'মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী' নামে তাঁর একটি

www.pathagar.com

লাইব্রেরী ছিল। ১৯৪৫ সনে তিনি একই নামে ঢাকায় ৯৫নং ইসলামপুর রোডে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করেন এবং সে সাথে জিন্দাবাহার লেনে স্থাপন করেন 'মুসলিম বেঙ্গল প্রেস'। এ লাইব্রেরী ও প্রেস যতটা না তাঁর জীবিকার্জনের সহায়ক ছিল, তার চে' বেশি সহায়ক ছিল তাঁর গ্রন্থাদি প্রকাশ ও পরিবেশনার কাজে।

কবি গোলাম মোস্তফা বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রেখেছিলেন। কলকাতার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি', 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি', বিভাগ-পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে ঢাকায় 'পাকিস্তান মজলিশ', 'রওনক', 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড', প্রভৃতি সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থার সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। রাইটার্স গিল্ড-এর পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান শাখার তিনি অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। 'রওনক'-এর বেশির ভাগ অনুষ্ঠান তাঁর নিজ বাড়ি 'মোস্তফা মঞ্জিলে'ই অনুষ্ঠিত হতো।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায় ঃ 'আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার মোসলেম ইনস্টিটিউটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম। সেই সভায় গোলাম মোস্তফা সাহেব 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি আমার এত ভাল লেগেছিল যে আমি আমার গলার হার তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম।' (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ কবি গোলাম মোস্তফা ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজ)।

এভাবে দেখা যায়, বহু সাহিত্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৯৪১ সনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে'র সপ্তম অধিবেশনের কাব্য শাখার তিনি সভাপতি ছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি যে উদ্দীপনাপূর্ণ মূল্যবান বক্তৃতা দেন প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক ও ভাষা-সৈনিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাঁর 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে সে সম্পর্কে লেখেন ঃ

'কবি গোলাম মোস্তফা কাব্য-সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। তিনি মুসলমান কবিগণকে তাঁদের কাব্য কৃষ্টিকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, হিন্দু কবিদের অনুকরণ নয় বরং মুসলমানের বিশিষ্ট অনুভূতির রূপায়ণেই মুসলিম কাব্য-সাধনা সার্থক ও স্বকীয়তামণ্ডিত হবে।'

সাহিত্য-সংগঠক হিসাবে গোলাম মোস্তফার আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর উক্তি ঃ

'সমাজের জন্য কবির কতখানি দরদ ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম ১৯২৪ সনে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রক্ষাকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার ভিতর। এ সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (তখন অবশ্য ডক্টর হননি) কলকাতা ছেড়ে সম্ভবতঃ ঢাকায় আসেন। কাজী আব্দুল ওদুদও চাকরি নিয়ে ঢাকা কলেজে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খান (তখন অধক্ষ্য হননি) ল. পাস করে ময়মনসিংহ যান। কবি মোজাম্মেল হক (বরিশালী)

www.pathagar.com

নিজস্ব এক পাবলিকেশান কোম্পানী খুলে তাই নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। এইভাবে পুরাতন উদ্যোগী সদস্যগণ সকলেই দূরে যাওয়ায় সমিতি অচল হয়ে পড়ে। বাড়ী ভাড়ার দায়ে তার লাইব্রেরী নিলামে ওঠে। তখন অবশিষ্ট সভ্যেরা লাইব্রেরীর মূল্যবান বইগুলি মীর্জাপুর স্ট্রীটের এক বাড়ীতে সরিয়ে এনে কোনও মতে রক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সমিতি চালাতে হলে অর্থের প্রয়োজন। কবি তখন হুগলী জেলা স্কুলে চাকরি করেন। সভ্যেরা তাঁকেই সম্পাদক করে অর্থের চেষ্টায় বের হন। কবি প্রতি রবিবারে হুগলি হতে কলকাতা এসে সমিতিরি জন্য পরিশ্রম করতেন।.... কবির যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে আমি নিজে এবং আরও কতিপয় সদস্য কবির সঙ্গে চাঁদার খাতা নিয়ে কলকাতার সাহিত্যামোদী ও শিক্ষিত মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি।' (মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯)

গোলাম মোস্তফা প্রধানত কবি হিসাবে সুপরিচিত হলেও তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমাত্রিক। তিনি একাধারে কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী গ্রন্থ, অনুবাদ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিচিত্র। তিনি একাধারে গীতি কবিতা, মহাকাব্য, শিশুতোষ কাব্য, গান ইত্যাদি রচনা করেন। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করার ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তবে ক্রমান্বয়ে তিনি সে প্রভাবের উর্ধে ওঠার প্রয়াস পান। এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রচিত 'আমাদের জাতিসত্তার কবি গোলাম মোস্তফা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন ঃ

'এ কবির জন্মের পরেই ১৯১৩ সালে কবিগুরু নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং এদেশীয় সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বশালী প্রতিভাধর বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। রবীন্দ্র-প্রভাব ক্রমে এ দেশীয় কবি সমাজে অত্যন্ত অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় এবং আমাদের কবিদের মধ্যে একটা বলয়ের সৃষ্টি করেন। এ বলয়ের মধ্যে তখন চারজন কবি অবস্থান করেও স্বকীয় প্রতিভার দওলতে আমাদের ভাষাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা হচ্ছেন ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় ও যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। সেই বলয়ের মধ্যে অবস্থান করেও পূর্বোক্ত কবিগণ তাঁদের চিন্তা-ধারণা ও প্রত্যয়কে তাঁদের নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হন। তাঁদের মধ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিগুরু থেকে স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করেছেন। কবি গোলাম মোস্তফা এ বলয়ের মধ্যেও ছিলেন। তাঁর 'রক্তরাগ' প্রকাশের পর তাঁকেও কবিগুরু স্নেহ ও উৎসাহ দান করেছেন।'

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ বলেন ঃ 'গোলাম মোস্তফা যে নিঃসন্দেহে কাব্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, সে সম্বন্ধে কারো মতভেদ নাই। তার প্রতিভা কোন স্তরের অন্তর্গত ছিল, তাঁর সৃষ্টির কোন এবং কত অংশ নিছক কাব্য হিসাবে মহাকালের পরীক্ষায় অনাগত ভবিষ্যতের অমর ফলকে স্থান লাভ করবে, সে আলোচনায়

www.pathagar.com

আপাতত না গিয়ে আমরা অকুণ্ঠ-কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি যে, প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল তক তিনি মুসলিম বাংলার তরুণদের চিত্তে উদ্দীপ্ত প্রেরণার অন্যতম প্রতীক হিসাবে বিরাজমান ছিলেন। যেকালে বাংলা সাহিত্যের আকাশে নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীন কারো আবির্ভব ঘটে নাই, সেকালে মুসলিম বাংলায় গোলাম মোস্তফাই প্রায় একমাত্র কাব্য-পথযাত্রী, যাঁর কবিতা দেশময় ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা ক্লাসে পড়তো, বাইরে আবৃত্তি করতো, মজলিশ-মহফিলে সুর সংযোগে গাইতো। বাংলার সে অবসাদক্লিষ্ট মুসলিম সমাজের ভীরু সমাজে গোলাম মোস্তফার কবিতা ছিল ভ্রাম্যমান চারণের উদ্দীপ্ত কণ্ঠের জাগরণী গান।' (ইব্রাহীম খাঁ ঃ কবি গোলাম মোস্তফার আদর্শ ও অন্তরঙ্গতা)।

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও গোলাম মোস্তফার জীবনীকার মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বলেন ঃ 'বাংলা সাহেত্যে বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কাব্যে গোলাম মোস্তফার ভূমিকা ও অবদানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর আবির্ভাবকালের পটভূমি এবং মুসলিম সমাজ প্রেক্ষিতের দিকে অবশ্যই বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।.... যে কালে অতি অল্প বয়সেই তিনি কাব্য চর্চা শুরু করেন, সেকালে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাঙালী মুসলিম সমাজ ছিল শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ।' (গোলাম মোস্তফা/মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পৃ. ১০)

রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্র কবি-প্রতিভার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও গোলাম মোস্তফা ছিলেন উপরোক্ত চার কবির মতই কিছুটা স্বতন্ত্রধর্মী। এ স্বাতন্ত্র্য নিজস্ব ভাব ও মননের ক্ষেত্রে। মুসলমান হিসাবে কবি এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, তৌহিদী চেতনা ও ভাব-সম্পদে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত হন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যে ও গদ্য-রচনায় এর সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। তাই উপরোক্ত বলয়ের মধ্যে থেকেও রবীন্দ্রনাথ ও উপরোক্ত চার কবি থেকে গোলাম মোস্তফা ক্রমান্বয়ে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। এ সম্পর্কে কবির নিজস্ব মতামত উদ্ধৃত করছি। তিনি তাঁর এক অভিভাষণে বলেন ঃ

'যে যুগে আমার জন্ম, সে যুগ বাংলার মুসলমানদের অবসাদের যুগ। সে যুগে আমাদের সাহিত্যের না ছিল কোন স্বাতন্ত্র, না ছিল কোন স্বকীয়তা। প্রত্যেক জাতির মননশক্তি, ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয় মাতৃভাষার মধ্যে। জাতির অন্তরমূর্তি ছায়া ফেলে তার সাহিত্যের মনোমুকুরে। সাহিত্য তাই জাতির মনের প্রতিধ্বনি। সাহিত্যের ভিতর দিয়েই গোটা জাতির সাচ্চা চেহারা দেখা যায়। সেই হিসাবে বাংলার মুসলমানদের কোন সাহিত্যই তখন রচিত হয়নি। আমি তাই ছোটবেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী হলেও আমার মনে জেগেছিল আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির একটা দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তাগিদে নয়, সহজভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ণ। মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ এঁরা

www.pathagar.com

প্রত্যেকে ছিলেন হিন্দু জাতির মর্মবাণীর উদ্গাতা।.... বাঙ্গালীর অর্ধেকের বেশি হলো মুসলমান। কাজেই বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের জীবনের প্রকাশ যদি না থাকে তবে সে সাহিত্য কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের রূপায়ণ তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অনিবার্য হয়েছিল এবং এখনো আছে।'

গোলাম মোস্তফার সাহিত্য-চর্চার তাগিদ উপরে বিধৃত হয়েছে। সাহিত্য-চর্চার এ তাগিদই তাঁর মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আবেদন সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ ও উপরোক্ত চার কবির চিন্তা-চেতনা, ভাব-বিষয় ও ঐতিহ্যিক অনুপ্রেরণা থেকে গোলাম মোস্তফার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। তাই রবীন্দ্র-বলয়ের মধ্যে থেকেও তিনি তাঁর স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধারা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর লেখায় সঙ্গতভাবেই তাঁর কাঙ্ক্ষিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের রূপায়ণ' তথা 'মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য' সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় গোলাম মোস্তফার বিচিত্র অবদান নিম্নরূপ ঃ

কাব্য ঃ রক্তরাগ (১৯২৭), হাস্নাহেনা (১৩৩৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্য-কাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৩৩৬), শেষ ক্রন্দন, তারানা-ই পাকিস্তান (১৯৪৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯)।

মহাকাব্য ঃ বনি আদম (১৯৫৮)।

গান ঃ গীতি-সঞ্চয়ন (১৯৬৮)

শিশুতোষ কাব্য ঃ আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি।

অনুবাদ কাব্য ঃ এখওয়ানুস সাফা (১৯২৭), মুসাদ্দাস-ই-হালী (১৯৪১), কালামে ইকবাল (১৯৫৭), আল-কুরআন (১৯৫৭), শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া (১৯৬০)।

উপন্যাস ঃ রূপের নেশা (প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ), ভাঙ্গাবুক (১৯২৮)।

জীবনী গ্রন্থ ঃ হজরত আবু বকর।

প্রবন্ধ ঃ বিশ্বনবী (১৯৪২), মরুদুলাল (বিশ্ব নবীর কিশোর সংস্করণ), আমার চিন্তাধারা, গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন (১৯৬৮), ইসলাম, বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও কমিউনিজম, ইসলামে জেহাদ।

পাঠ্য-পুস্তক ঃ আলোকমালা (সিরিজগ্রন্থ), আলোক-মঞ্জুরী (সিরিজ গ্রন্থ), মঞ্জু-লেখা (কথাশিল্পী মনোজ বসু সহযোগে), মণি-মুকুর (কথাশিল্পী মনোজ বসু সহযোগে), খোকা খুকুর বই, নতুন বাংলা ব্যাকরণ, School Boys Translation.

এছাড়া, শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত তাঁর অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এগুলো এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

বয়সের দিক দিয়ে গোলাম মোস্তফা কাজী নজরুল ইসলামের চার বছরের বড়। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান লিখেছেন ঃ 'কাব্য জগতে গোলাম মোস্তফা নজরুল ইসলামেরও বহু পূর্ব হইতে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। আধুনিক কালের অনেক কবির নামও যখন শোনা যায় নাই, গোলাম

www.pathagar.com

মোস্তফা সেইকাল হইতেই কবিতা রচনা করিয়া আসিতেছেন।' (বাঙ্গালা সাহিত্যের নুতন ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬১০)

১৩১৩ সনে গোলাম মোস্তফা যখন মাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'আন্দ্রিয়ানোপল উদ্ধার' শীর্ষক একটি কবিতা 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে ছাপা হয়। এটাই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। এ প্রথম প্রকাশিত কবিতার মাধ্যমেই তিনি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কবি হিসাবে তাঁর ভবিষ্যত সম্ভাবনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। এ সম্পর্কে কবি বন্দে আলী মিয়ার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

'সেই সময় ইউরোপ খণ্ডে বলকান যুদ্ধ চলছিল। তুরস্ক সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ানদের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সমগ্র মুসলিম জাহানে একটি বিমর্ষতার ছায়া নেমে এসেছিল। এমন সময় সহসা সংবাদ পাওয়া গেল, কামালপাশা বুলগেরিয়ানদের নিকট থেকে 'আন্দ্রিয়ানোপল' পুনরুদ্ধার করেছেন, এই খবরে স্বজাতিবৎসল কিশোর কবির প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। তিনি 'আন্দ্রিয়ানোপল' পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে কবিতাটি মুদ্রিত হলো। কবিতাটির সূচনা ছিল এইরূপ ঃ

'আজিকে প্রভাত কি বারতা নিয়া
ধরায় আসিলি নামিয়া।'

কবিতার ছন্দ, ভাব এবং প্রকাশভঙ্গী তখনকার দিনে সবই ছিল নতুন। এই কবিতায় পাঠক মহলে তাই একটা সড়া পড়ে গেল। বাংলার মুসলিম সমাজে যে একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছে, একথা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করলো। গোলাম মোস্তফাও নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। সেই থেকে তিনি কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে শুরু করলেন।

মূলত কবি হলেও গোলাম মোস্তফার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হলো একট উপন্যাস 'রূপের নেশা'। কবি তখন সবেমাত্র বি.এ. ক্লাসের ছাত্র। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভাঙাবুক' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সনে। এতে সমকালীন বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত জীবনের আলেখ্য রূপায়িত হয়েছে। ঔপন্যাসিক হিসাবে গোলাম মোস্তফা খুব একটা সাফল্য অর্জন করেছেন বলে মনে হয় না। তবে এর দ্বারা কবির বহুমুখী প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তরাগ' প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সনে। প্রকাশের পর তিনি এর একটি কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জবাবে তাঁকে দু'লাইনের একটি চমৎকার কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। লাইন দুটো এই ঃ

'তব নব প্রভাতের রক্তরাগখানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময় বাণী।'

'রক্তরাগ' পাঠক সমাজে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বিশেষত মুসলিম পাঠক সমাজে। অবশ্য এই বইটি প্রকাশিত হবার বেশ আগে থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম

www.pathagar.com

তাঁর প্রতিভার সূর্যকান্তি নিয়ে বাংলা কাব্য-জগতকে আলোড়িত করে তোলেন। সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি তখন নজরুল ইসলামের দিকেই আবদ্ধ। তাই 'রক্তারাগে'র মাধ্যমে গোলাম মোস্তফা সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম না হলেও এ গ্রন্থে তাঁর কবি-প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত দু'লাইনে এ উক্তির সমর্থন মেলে। ১৩৩৮ সনের কার্তিক সংখ্যায় 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় ঃ 'রক্তরাগ' তাঁহার কবি পরিচয় বাঙ্গালী পাঠক সমাজে পূর্ণভাবেই করিয়া দিবে।'

'রক্তরাগ' কাব্যে মোট ২৮টি কবিতা স্থান লাভ করেছে। কবিতাগুলো মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ধর্মীয় ভাবধারাসম্পন্ন কবিতা যেমন ঃ মরুর মহিমা, ঈদ উৎসব, মোস্তফা কামাল, বিজয় উল্লাস, স্বাধীন মিসর, হযরত মোহাম্মদ ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে প্রেমের কবিতা যেমনঃ প্রেমের জয়, পাশের বাড়ীর মেয়ে, প্রথম চিঠি ইত্যাদি। ফলে এ প্রথম কাব্যেই গোলাম মোস্তফার অনেকটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। ইসলামী চেতনা, স্বাজাত্যবোধ, প্রেম ও মানবতা গোলাম মোস্তফার সমগ্র সাহিত্যে মূলত এ কয়টি ভাবধারাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'রক্তরাগ' সম্পর্কে বিশিস্ট কবি সমালোচক আব্দুল কাদির বলেন ঃ

'তাঁর 'রক্তরাগ' কাব্যখানি 'জাগরণ', 'প্রীতি' ও 'প্রেম' এই তিন ভাগে চিহ্নিত। 'জাগরণ' বিভাগে জাতীয় চেতনা পেয়েছে প্রধান সুর, 'প্রীতি বিভাগে নিসর্গ-প্রীতি ও মানবতা হয়েছে সোচ্চার এবং 'প্রেম' বিভাগে 'চির সঙ্গিনী মহিয়ষী নারী নমস্কার' স্থান লাভ করেছে।

গোলাম মোস্তফার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হাস্নাহেনা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সনে (ইংরেজী ১৯২৭) এ গ্রন্থের কবিতাগুলো প্রধানতঃ গীতিধর্মী। এ গ্রন্থে ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন কবিতা নেই বললেই চলে, প্রেম ও সমসাময়িক জীবনচিত্র এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর 'সওগাত' পত্রিকা এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ

'ইহা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক।– 'রক্তরাগে' তাঁহার যে শক্তি 'ফুটেও ফুটে না' অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, 'হাস্নাহেনা'য় তা অনেকটা ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হইল। কবি গোলাম মোস্তফার কাব্য সাধনা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা আমরা আজ আনন্দ সহকারে ঘোষণা করিতেছি। প্রার্থনা করি কবির শক্তি দিন দিন পরিবর্ধিত হউক এবং তাহতে দরিদ্র মুসলিম বঙ্গ সাহিত্য উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক।' (সওগাত, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৪)

গোলাম মোস্তফার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খোশরোজ' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সনে। এ গ্রন্থে কবির ধর্মীয় চেতনার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ফাতেহা-ই দোয়াজদহম, শবে বরাত, কোরবানী, আল হেলাল, তরুণের অভিযান, তরুণের গান প্রভৃতি কবিতায় কবির ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কবির অন্যান্য কাব্যেও ইসলাম, জাতীয় চেতনা, প্রেম ও মানবতাবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফার একমাত্র মহাকাব্য 'বনি আদম' (অসম্পূর্ণ) প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সনে। ইংরেজ কবি মিল্টনের Paradise Lost and Paradise Regained-এর কাব্যাদর্শ, ভাব ও কাহিনীর অনুসরণে তিনি এ মহাকব্য রচনার প্রয়াস পান। এতে হযরত আদমের (আ) বেহেশত থেকে বহিষ্কার ও পুনরায় সেখানে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কবি হিসাবে এতে তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি মূলত রোমান্টিক। রোমান্টিক কবিদের পক্ষে ক্লাসিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মহাকাব্য রচনা করা সত্যিই দুরূহ, এক রকম দুঃসাধ্যই বলা চলে। তাছাড়া, আধুনিক যুগ-পরিবেশ মহাকাব্য রচনার উপযোগী নয় বলেই কলাবিদদের ধারণা। তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে বনি আদম একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

অনুবাদক হিসাবে গোলাম মোস্তফা বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অনুবাদ কাব্যের মধ্যে 'আল-কুরআন' মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কতিপয় নির্বাচিত সূরা ও আয়াতের অনুবাদ। বাকি সবই উর্দু কাব্য ও কবিতার অনুবাদ। তাঁর সূরা ফাতিহার অনুবাদ এত মনোমুগ্ধকর ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, পাকিস্তান আমলে এটি সকল বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে ক্লাস শুরুর পূর্বে সমবেত কণ্ঠে গীত হতো। তাঁর উর্দু কাব্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মন্তব্য স্মরণীয় ঃ

'বাঙ্গালী হিসাবে একদিকে এ বাংলার জনগণ, আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, ষড়ঋতু তাঁকে যেমন প্রভাবান্বিত করেছে– তাঁর পূর্ববর্তী মহাজ্ঞানী-মহাজনেরা যেমন তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছেন তেমনি এ উপমহাদেশে তখনকার মুসলিম কবিদের মধ্যে শেখ আলতাফ হোসেন হালী, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।..... এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, গোলাম মোস্তফা রবীন্দ্রনাথ থেকে ক্রমেই মুক্ত হয়ে ইসলামী রেনেসাঁর দ্বারা ক্রমেই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এ উপমহাদেশে মুসলিম রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা ইকবালের প্রধান কাব্যগুলোর তিনি কেবল অনুসরণ করেননি অনুবাদও করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যসাধনার দ্বারা প্রমাণ করে গেছেন স্বদেশের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কবি ও সাহিত্যিকগণ এক সঙ্গে এ দুটো ঐতিহ্যের গৌরবে অনুপ্রাণিত হতে পারেন।' (প্রাগুক্ত)

গান রচয়িতা হিসাবে গোলাম মোস্তফার জনপ্রিয়তা অসাধারণ। ইসলামী গান– হামদ্, নাত ও দেশাত্ববোধক সঙ্গীত রচনায় তিনি যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেন। গোলাম মোস্তফা রচিত 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি' 'বাদশাহ তুমি দীন ও দুনিয়ার', 'নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি' 'হে খোদা দয়াময় রহমানুর রহিম', 'আমার মোহাম্মদ রসূল', 'তুমি যে নূরের রবি নিখিলের ধ্যানের ছবি' প্রভৃতি হামদ্ ও নাত বাংলার ঘরে ঘরে সকলের মুখে মুখে এখনো প্রচলিত। এসব ইসলামী গানের জনপ্রিয়তা একমাত্র গানের সম্রাট নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তার সাথেই তুলনীয়। গোলাম মোস্তফা পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের বাংলা অনুবাদক। পাকিস্তান আমলে এ গানটি ব্যাপকভাবে গাওয়া হতো। এছাড়া,

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফা আরো বিপুল সংখ্যক হামদ্, নাত, দোশাত্মবোধক ও প্রেমের গানের রচয়িতা হিসাবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সুরকার ও গায়ক হিসাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁর নিজের বিশাল বৈঠকখানায় বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ছিল। ঘরোয়া পরিবেশ বিশেষত সমঝদার অতিথি-অভ্যাগতদের আগমনে আবেগপ্রবণ কবি স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি ও গানের চর্চায় বিভোর হয়ে যেতেন। ১৯৬১ সনে আমি প্রথম যেদিন 'মোস্তফা মঞ্জিলে' তাঁর সাথে দেখা করতে যাই সেদিন আমিও এরূপ আবেগ-তাড়িত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তাঁর অনবদ্য আবৃত্তি ও গানে বিস্মিত-বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। ঘরোয়া অনুষ্ঠান ছাড়া বাইরে জনসমক্ষেও তিনি মাঝে-মধ্যে গাইতেন এবং শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করে দিতেন। এরূপ একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন বিশিষ্ট কবি-সমালোচক-গবেষক আব্দুস সাত্তার। 'কবি গোলাম মোস্তফা ও আমি' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

'সময়টা খুব সম্ভব ১৯৮৫ সাল। চট্টগ্রামে সাহিত্য সম্মেলনের তোড়জোড় চলছে। দর্শক শ্রোতা হিসেবে আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অগণিত জনসমুদ্রে আমরাও ছোট ঢেউ হিসেবে মিশে গিয়েছিলাম সেইখানে। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা শুনলাম। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপুর্ণ বক্তব্য রাখলেন সবাই। কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন কবি গোলাম মোস্তফা সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে এবং নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে। চট্টগ্রামের স্থানীয় শ্রোতা দর্শকরা যারা কোনো দিন গোলাম মোস্তফা কিংবা সুরসম্রাট আব্বাস উদ্দীনকে দেখেননি, তারা কানাকানি শুরু করলেন, 'উনিই কি গায়ক আব্বাস উদ্দিন? গোলাম মোস্তফা তো কবিতা লেখেন, তিনি তো কবি, গায়ক হলেন কবে থেকে?'

আজীবন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকায় শিক্ষক হিসেবে তিনি যেমন কৃতবিদ্য আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতা হিসাবেও তিনি তেমনি কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। বিভাগ পূর্বকালে এক সময় সমগ্র বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে গোলাম মোস্তফার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক সিরিজ স্কুলে পাঠ্য ছিল। পাকিস্তান আমলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুলসমূহে তাঁর বই পাঠ্য ছিল। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে এগুলো যেমন সহজ পাঠ্য, শিক্ষণীয় আবার তেমনি শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্বের বিকাশেও সহায়ক। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে তাই এগুলোর জনপ্রিয়তাও ছিল অপরিসীম।

প্রবন্ধ রচয়িতা হিসেবে গোলাম মোস্তফার সাফল্য সন্দেহাতীত। কবি হিসেবে যদিও গোলাম মোস্তফা সমধিক পরিচিত তবে প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসেবে তাঁর সাফল্য তুলনামূলকভাবে অধিক বলে অনেকের ধারণা। কবি হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে শিল্প সচেতন ও স্বাতন্ত্র-প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু সর্বদা তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেননি। বিশেষত শব্দ ব্যবহার ও শিল্প রীতির ক্ষেত্রে তিনি প্রথাগত গতানুগতিকতার উর্ধে উঠতে পারেননি। তাঁর যেটুকু স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা তা শুধু তাঁর কবিতার ভাব,

www.pathagar.com

বক্তব্য, ঐতিহ্যানুসারিতা ও আবেদনের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করে নজরুল যেমন সর্বক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, গোলাম মোস্তফা হয়তো তা পারেননি। এমনকি, জসীমউদ্দিন ও তিরিশোত্তর যুগের কতিপয় কবি যেমন গতানুগতিক প্রথার বাইরে স্বতন্ত্র কবি-ভাবনা ও কাব্য-রীতির সাধনা করেছেন, গোলাম মোস্তফার মধ্যে তেমন কোন প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি রবীন্দ্র-প্রভাব বলয়ের বাইরে এসে স্বকীয়তার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল, তিনি অতি সহজে-স্বচ্ছন্দে খানিকটা নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। তাই দেখা যায়, স্বতন্ত্র কবি-কর্মের ক্ষেত্রে নয়; প্রথাগত কবিতা-চর্চায়ই তিনি সর্বদা ব্যাপৃত থেকেছেন। অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়; এসব ব্যতিক্রমী কবি-কর্মই গোলাম মোস্তফাকে অমরত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এ কারণেই তিনি হয়তো কোন 'যুগ-স্রষ্টা কবি' না হতে পারেন কিন্তু রবীন্দ্র-নজরুল যুগে একজন উল্লেখযোগ্য প্রধান কবি হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফার কৃতিত্ব অসাধারণ। প্রবন্ধ রচনার জন্য যে সূক্ষ্ম মনন, বিচার-বিশ্লেষণ করার মত প্রখর বুদ্ধিদীপ্ততা, গভীর জ্ঞান, অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন গোলাম মোস্তফার মধ্যে তার অভাব ছিল না। তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। কবিরা সাধারণত স্বপ্ন-কল্পনার অতীন্দ্রিয় জগতের অধিবাসী হয়ে থাকেন। প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্য্যানুভূতি ও মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁদের হৃদয়কে সর্বদা চঞ্চলিত করে। কবি হিসাবে গোলাম মোস্তফার মধ্যে এগুলোর উপস্থিতি অবশ্যই লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য আর এক স্বতন্ত্র শিল্পী সত্তার প্রচণ্ড উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তোলে। সেখানে তাঁর গভীর সমাজ-সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, ইতিহাস-জ্ঞান, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অপরিসীম অধ্যবসায় সকলকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর কবিত্বময় স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাষা। প্রাবন্ধিকের তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি ও বিশ্লেষণধর্মিতার সাথে কবিত্বময় ছান্দিক ভাষা লেখকের বক্তব্যকে শুধু পাঠকের সচেতন বিচার-বুদ্ধির কাছে নয়; হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির গোপন তন্ত্রীতে পর্যন্ত সাড়া জাগায়। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ তাঁর 'প্রবন্ধ লেখক গোলাম মোস্তফা' শীর্ষক প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন ঃ

'তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুই প্রমাণ করে তিনি তাঁর সমাজ-চিন্তায় অনুগত ছিলেন এবং সমাজের বিচিত্র বিষয় যে তাঁকে চিন্তান্বিত করতো এবং সে সমস্যার সমাধান কী তা নিয়ে যে তিনি ভাবিত হতেন তাঁর লেখার বিষয়-বৈচিত্র্য তা প্রমাণ করে। ভাষা, সাহিত্য, কাব্য সঙ্গীত, শিল্প ছাড়াও তাঁর প্রবন্ধের বিষয় সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন। তাঁর লেখায় প্রকাশিত তাঁর হৃদয়-ব্যাকুলতা এনে দেয় একটি কল্যাণধর্মী সামজ নির্মাণে তাঁর ইচ্ছা কতটা প্রচেষ্টাধর্মী। সুনির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণের জন্য অনেকের সঙ্গে তিনি ঐকমত্যে আবদ্ধ হতে পারতেন; কিন্তু সে জন্য যুগধর্মের

www.pathagar.com

গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতেও তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর বিশ্বাসের অনুকূলে যুক্তি দাঁড় করিয়ে প্রাচীর দৃঢ়তায় তাকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। এই যুক্তির প্রাচীর তৈরিতে উপাদান অন্বেষণে তিনি যে পরিশ্রম করেছেন তাঁর প্রতিটি পংক্তি এর স্বাক্ষর বহন করছে। আর এজন্যে রুশো, টলস্টয়, শেক্সপীয়ার, মিল্টন থেকে মুসলিম-বৌদ্ধ-ইহুদী ও হিন্দু কোন শাস্ত্র পাঠেই যেমন তিনি অনীহা প্রকাশ করেননি তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি পাঠেও অনজ্ঞতাকে অনায়াসে মাড়িয়ে যেতে তিনি ছিলেন কুণ্ঠামুক্ত।'

এ প্রসঙ্গে কবির সমকালীন বিশিষ্ট গদ্য-লেখক মোহম্মদ বরকতুল্লাহর মন্তব্য স্মরণীয় ঃ

'কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন মনে-প্রাণে মুসলিম কবি। এদিক দিয়ে তাঁকে তাঁর অগ্রসূরী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ভাবশিষ্য বলা যেতে পারে। শিরাজী সাহেব আজীবন ওজস্বিনী বক্তৃতা, উদ্দীপনাময়ী কবিতা এবং তেজগর্ভ উপন্যাস ও প্রবন্ধমালার দ্বারা অবহেলিত ও অবসাদগ্রস্ত মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং প্রবলতর ও চোখ-ঝলসানো হিন্দু কৃষ্টির আওতা হতে মুক্ত করে নিজ পায়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে গিয়েছেন। গোলাম মোস্তফার জীবনের লক্ষ্য ছিল পারিপার্শ্বিক অনগ্রসর মুসলিম সমাজের ভিতর প্রাণসঞ্চার করা, শুধু প্রাণ নয়, ইসলামী প্রাণসঞ্চার করা। এদকি দিয়ে কালানুসারে তিনি তাঁর সমধর্মী কবি নজরুল ইসলামের অগ্রবর্তী বলে তাঁর মনে গর্ব ছিল।" (মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯)

বিশ্বনবী (১৯৪২), ইসলাম বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও কমিউনিজম, ইসলামে জেহাদ, মরু দুলাল (বিশ্বনবীর কিশোর সংস্করণ), হযরত আবুবকর ইত্যাদি ক্ষুদ্র-বৃহৎ আকারের কতিপয় গ্রন্থ ছাড়াও ১৯৬২ সনে তাঁর জীবৎকালে ৩৭টি প্রবন্ধের সংকলণ 'আমার চিন্তাধারা' ও তাঁর ইন্তিকালের পর ১৯৬৮-এর জুনে সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা সংবলিত ও তাঁর স্ত্রী মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত ২৮টি প্রবন্ধের সংকলন 'গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন' প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত দুটি গ্রন্থ তাঁর শেষ জীবনের অবদান হিসাবে এগুলোতে তাঁর চিন্তা, মনন ও অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ রূপ বিধৃত। চল্লিশের দশকে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সর্বত্র যখন কমিউনিজমের প্রচার-প্রসার কিছুটা দানা বেঁধে ওঠে গোলাম মোস্তফা তখন 'ইসলাম ও কমিউনিজম' বই লিখে কিমউনিজমের অন্তঃসারশূন্যতা যুক্তিসহ সপ্রমাণ করেন এবং ইসলামের স্রষ্টা-প্রদত্ত শাশ্বত কল্যাণকর আদর্শের সামনে তা মুক্তো খণ্ডের নিকট চোখ-ঝলসানো কাঁচের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেন। এভাবে ইসলাম, স্বজাতি, স্বদেশ, স্বীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনই তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধের মূল্য লক্ষ্য।

গোলাম মোস্তফার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো তাঁর রচিত 'বিশ্বনবী'। এ ব্যাপারে সাহিত্য-সমালোচকরা সকলে একমত। সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই এ গ্রন্থটি একটি অসাধারণ পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' এবং

www.pathagar.com

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' উপন্যাসের সাথেই এর তুলনা চলে। ১৯৪২ সনের অক্টোবরে এ বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর ১৯৪৬ সনের এপ্রিলে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কবির জীবনকালে ১৯৬৩ সনের জুলাই মাসে এর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সংস্করণেই লেখক কিছু কিছু পরিমার্জনা ও সংযোজন করেছেন। ফলে প্রথম সংস্করণের প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার এ বইটি অষ্টম সংস্করণে গিয়ে ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দাঁড়িয়েছে। এটা কোন গতানুগতিক জীবনী গ্রন্থ নয়; লেখকের প্রগাঢ় নিষ্ঠা, গভীর ভক্তি-ভাব, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ইতিহাস-চেতনা সর্বোপরি কবিত্বময় সাবলীল ভাষা গ্রন্থটিকে যেমন অনবদ্য করে তুলেছে তেমনি করেছে একে সর্বশ্রেণীর নিকট গ্রহণযোগ্য। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন ঃ

'হযরতের জীবনী সংক্রান্ত আরবী-উর্দু-ইংরেজি-বাংলা দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে; কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটা বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইয়াছি। অনুভূতির আবেদন (Emotional appeal) খুব কম গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। ফলে অধিকাংশ লেখাই হযরতের জীবনীর সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করিতে পারে নাই। মহাপুরুষের জীবন শুধু ঘটনার ফিরিস্তি নহে; শুধু যুক্তি-তর্কের শয্যাও নহে; সে একটি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও অনুভবের বস্তু; তাহাকে বুঝিতে হইলে একদিকে যেমন চাই সত্যের আলোক ও বিজ্ঞানের বিচারবুদ্ধি, অপরদিকে ঠিক তেমনি চাই ভক্তের দরদ, কবির সৌন্দর্যানুভূতি, দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি, আর চাই প্রেমিকের প্রেম। আশেকে রসূল না হইলে সত্যিকার রসূলকে দেখা যায় না।"

পরবর্তী সকল সংস্করণে লেখক কিছু কিছু পরিমার্জনা ও সংযোজন করেছেন তার প্রমাণ গ্রন্থটির উত্তরোত্তর কলেবর বৃদ্ধি। গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকেও এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক সেখানে বলেছেন ঃ

'বিশ্বনবীর আগমনের আগাগোড়া এবার দেখিয়া দিয়াছি। বহু স্থানে ফুটনোট দিয়া অথবা কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া আমার ধারণাগুলোকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 'হযরতের বহু বিবাহের তাৎপর্য' স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'থিওসফি ও মিরাজ', 'ইসলাম কি?' এবং 'হযরত মোহাম্মদ কে?' এই তিনটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে।"

কিন্তু লেখক এতেই পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেননি, তিনি আরো বলেছেন ঃ "এ অনেকটা চূড়ান্ত নয়– নির্দেশনা। আরও এমন কথা আছে– যাহা এখনও বলা হয় নাই– যাহা এখনও এই অধম লেখকের মনে, চিন্তা ও দৃষ্টি-সীমার বাহিরে পড়িয়া আছে।"

'বিশ্বনবী' সাধারণ পাঠকের জন্য নয়; এটা শিক্ষিত বিদগ্ধ পাঠকের উপযোগী। এটা সাধারণ কোন জীবনীগ্রন্থও নয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবনী, রিসালত, কারামত, অন্য সকল মহাপুরুষের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করার জন্য তিনি এ অমর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের

www.pathagar.com

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন ঃ

"এই আলোকের যুগে ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদকে উন্নতভাবে বুঝিবার সময় আসিয়াছে। 'বিশ্বনবী'তে আছে সেই প্রয়াস। আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকা তাই পাঠক-পাঠিকার জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। জড়বাদ, অদ্বৈতবাদ, ডায়ালেকটিকস (dialectics) ইত্যাদি কাহাকে বলে, স্থান-কাল-পাত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের মত কি, বৈজ্ঞানিকদের লক্ষ্য এখন কোন দিকে– এসব বিষয়ে পাঠক-পাঠিকার সজাগ হইতে হইবে। মননশীলতার উৎকর্ষ না হইলে জাতীয় জীবন শক্তিশালী হয় না।"

'বিশ্বনবী' প্রণয়নে লেখক যে কী ধরনের পরিশ্রম ও অসাধারণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এর অষ্টম সংস্করণের শেষে প্রদত্ত এ গ্রন্থ রচনায় সহায়ক গ্রন্থসমূহের তালিকা থেকে তা সুস্পষ্ট। এ তালিকায় বিশ্ববিখ্যাত মোট ৬২টি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হয়েছে। এতে রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আল-হাদীস, আরবী-উর্দু-ইংরেজি-বাংলা ভাষায় রচিত বহু খ্যাতনামা সীরাত গ্রন্থ। এমনকি, বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের রচিত গ্রন্থও তিনি অধ্যয়ন করেছেন। এ ধরনের মাত্র কয়েকটি বইয়ের নাম নীচে উল্লিখিত হলো। এ থেকেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

আর জীন জীন্স ঃ The Mysterious Universe, The Universe Around Us, স্যার জেম্স জীন্স ঃ The New Background of Science, The Growth of Physical Science, জে. ডব্লিউ. এন. সার্লিভ্যান ঃ Bases of Modern Science, Limitations of Science, আর্থার এডিংটন ঃ The Expanding Universe, The Nature of the Physical World, এ. এন. হোয়াইটহেড ঃ Science and the Modern World, আলবার্ট আইনস্টাইন ঃ The Theory of Relativity, বার্ট্রান্ড রাসেল ঃ The A.B.C. of Relativity, ই. স্লোসোন ঃ Easy Lessons in Einstein, আইভর এল. টাকেট ঃ Evidence for the Supernatural, জর্জ গ্যামোঃ One, Two, Three...Infinity, বার্নরেড-ব্যানেট-রাইচ ঃ New Handbook of the Heavens, আর্থার সি. ক্লার্ক ঃ The Exploration of Space, হ্যারোল্ড লেল্যান্ড গুড-উইন Space Travel, জে.এন. লিওন্যার্ড ঃ Flight into Space, ভন ব্রাউন এন্ড হুমিপ্পল ঃ Man on the Moon ইত্যাদি। এছাড়া, খ্রিস্টান ধর্ম, যরথুষ্ট্র, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এবং এসব ধর্মের উপর লিখিত বহু গ্রন্থ তিনি এজন্য পাঠ করেন। এ থেকে তাঁর কঠোর পরিশ্রম, সীমাহীন অধ্যবসায় ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। ফলে 'বিশ্বনবী' সর্বদিক দিয়েই হয়েছে এক অসাধারণ কালজয়ী মহৎ গ্রন্থ।

'বিশ্বনবী' প্রকাশের পর বহু ভাষাবিদ সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

www.pathagar.com

"মৌলভী গোলাম মোস্তাফা কবিরূপে সুপরিচিত। তাঁর নব অবদান 'বিশ্বনবী'। বলাবাহুল্য, ইহা বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের (সঃ) একটি সুচিন্তিত প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী জীবন চরিত্র। এই গ্রন্থকার আঁহজরত সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়েছেন। আমরা এই পুস্তকখানিতে গোলাম মোস্তফা সাহেবকে একজন মোস্তফা-ভক্ত দার্শনিক ও ভাবুকরূপে পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা, তথ্য ও দার্শনিকতার দিক হইতে গ্রন্থখানি অতুলনীয় হইয়াছে।"

'বিশ্বনবী' সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মনোজ বসু বলেন ঃ

"আপনার 'বিশ্বনবী' পড়লাম। অপূর্ব! জাতির একটা বড় কাজ করলেন আপনি। আমি ও আমার মত আরও অনেকে ধর্মে মুসলমান না হয়েও হযরতকে একান্ত আপনার বলে অনুভব করতে পারলাম। মহানবীর কাছে পৌঁছবার আপনার এ সেতু-রচনা আপনার অতুলনীয় সাহিত্য রীতি। ভাষা, কবিত্ব-ঝংকার ও ভাব-লালিত্যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে।"

অধ্যাপক আব্দুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান-এর যৌথভাবে প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-এ বলা হয়েছে ঃ "গোলাম মোস্তাফার 'বিশ্বনবী' (১৯৪২) হযরত মোহম্মদের (স) জীবনী এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার ও বিস্তৃতি সম্পর্কে এ শতাব্দীতে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বইটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য। গোলাম মোস্তফা কবি 'বিশ্বনবী'তে তাঁর কবি মনের প্রকাশ সুস্পষ্ট এবং রচনাও আবেগপ্রণোদিত। 'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"

'বিশ্বনবী'র নবম সংস্করণের ভূমিকা (প্রসঙ্গ-কথা) লিখতে গিয়ে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান ১লা জানুয়ারি, ১৯৬৭ সনে লেখেন ঃ

"বাংলা সীরৎ গ্রন্থগুলির মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী' যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে অন্য কোনটির ভাগ্যে তা হয়নি। এর ভাব যেমন উচ্চস্তরের, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল, গতিশীল ও ওজস্বিনী। গোলাম মোস্তফা সাহেব একাধারে সুনিপুণ বাক্‌শিল্পী, কবি ও ভক্ত। তাই তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তির ভাবোচ্ছ্বাস ও কাব্যের লালিত্য গ্রন্থটিকে সুষমামণ্ডিত করেছে। তাঁর ভাব ও ভাষায় ভক্তিপ্রবণ বাঙালি অন্তরের মর্মকথাই কাব্যের ললিত রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভক্ত প্রেমিকের মধুঢালা রচনা-বিন্যাস বইটিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী করেছে।"

'বিশ্বনবী'র অষ্টম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন ঃ "বিশ্বনবীর উর্দু অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন মুদ্রণ ও প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ভারতীয় মুসলমানদের আগ্রহের ফলে বিশ্বনবীর একটি ভারতীয় সংস্করণ ও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।"

'বিশ্বনবী'র দশম সংস্করণের ভূমিকায় ২৭ আগস্ট, ১৯৬৮ তারিখে সৈয়দ আলী আহসান আবার লেখেন ঃ "কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' একটি আশ্চর্যরূপ সফল

www.pathagar.com

গ্রন্থ। হৃদয়ের আবেগ বিশ্বাস শব্দে যেভাবে সমর্পিত হয়েছে, আন্তরিক অনুভূতি বর্ণনায় যেভাবে উচ্চকিত হয়েছে এবং চিত্তের উপলব্ধিজনিত আনন্দ ভাষার আবহে যেভাবে জাগ্রত হয়েছে তার তুলনা আমাদের গদ্য সাহিত্যে সত্যিই বিরল। যদিও কখনও কখনও কবি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিষ্ঠায় যুক্তির সমর্থন খুঁজেছেন, কিন্তু সে সমস্ত যুক্তি উচ্ছ্বাসে সচকিত এবং বিশ্বাসের অবিচল নিষ্ঠায় প্রবহমান।"

'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এ এক অসাধারণ অমর কীর্তি, সমালোচকেরা এ ব্যাপারে সকলে একমত। গোলাম মোস্তফা অন্য কিছু না লিখে শুধু 'বিশ্বনবী' লিখলেও বাংলা সাহিত্যে চির অমর ও স্মরণীয় হয়ে থাকতেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই বলে কবি হিসাবেও তাঁকে একেবারে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ফররুখের মত যুগ-প্রবর্তক কবি না হলেও সমকালের তিনি এক বিশিষ্ট কবিকণ্ঠ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সবকিছু মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফার অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, এটা আমাদের সর্বদা স্মরণে রাখা কর্তব্য। সবশেষে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করে আলোচনা শেষ করছি ঃ

"রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দু কবি-সাহিত্যিকেরা গোলাম মোস্তফাকেই আধুনিক কবি রূপে প্রথম স্বীকৃতি দেন। ইহার পরে শাহাদাত হোসেন, নজরুল ইসলাম, জীসম উদ্‌দীন প্রমুখ কবি আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাব-ধারার রূপায়ণই তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দু মনীষীর আওতায় পড়িয়াও তিনি তাঁহার স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেন নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে নজরুল ইসলামের দ্বারা তিনি অনেকাংশে প্রভাবিত হইলেও তাঁহার মৌলিকত্ব বা স্বকীয়তা তিনি হারান নাই।"

সন্দেহ নেই, এখানে 'স্বকীয়তা' বলতে গোলাম মোস্তফার ভাব, বিষয় ও জীবন-দৃষ্টির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। গোলাম মোস্তফা তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, ভাব-বিষয়, প্রকাশভঙ্গী ও নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন সে জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এছাড়া, জাতীয় জাগরণ, দেশাত্মবোধ, মানবতা ও উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য তিনি সর্বদা সকল শ্রেণীর পাঠকের মনের মণিকোঠায় শ্রদ্ধার আসনে চির জাগরুক থাকবেন, সন্দেহ নেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গোলাম মোস্তফা মুসলিম নবজাগরণের কথা বলেছেন বলে অনেকে তাঁকে সাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। বস্তুত তাঁর লেখার মধ্যে কখনো কোথাও সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নেই। ইসলামের উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। তিনি ছিলেন ইসলামের অনুসারী। ইসলাম কখনও সাম্প্রদায়িকতা সমর্থন করে না। অতএব, তাঁর বিরুদ্ধে এরূপ ভিত্তিহীন প্রচারণা যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক তাতে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

ইকবালের কবিতা

ইবলিসের পরামর্শ সভা

এক.

ইবলিস

বস্তুর এই পুরাতন খেলা– নগণ্য ধরা; আর
যারা আর্শের বাসিন্দা, শেষ তাদের আকাঙ্ক্ষার।
'নুন' ও 'কাফ' এর জাহান১ এ নাম ধরাকে দিলেন যিনি
নিজের সৃষ্টি ধ্বংস সাধনে উদ্যত আজ তিনি!
দেখায়েছি আমি রাজতন্ত্রের স্বপ্ন ফিরিঙ্গীরে,
ছিন্ন করেছি যাদু গীর্জায়, মসজিদে, মন্দিরে।
বিত্তহীনেরে দিয়েছি সহজে সবক তকদীরের
বিত্তশালীরে দিয়েছি মন্ত্র শোষণ পুঁজিবাদের।
ইবলিসী এই উত্তাপে যার জীবন উচ্ছ্বসিত
সে অগ্নিকণা কে আর ধরায় করবে নির্বাপিত?
আমাদের বারি সিঞ্চনে যার সব শাখা উন্নীত
প্রাচীন সে তরু করবে কে আর পৃথিবীতে ভূপাতিত ?

প্রথম পরামর্শদাতা

শক্তিশালী যে ইবলিসী প্রথা সন্দেহ নাই কোনো
গোলামীতে হলো জনসাধারণ আসক্ত আরো যেন,
গোলামী এদের ভাগ্য লিখন সৃষ্টি লগ্ন থেকে
গোলামী এদের স্বভাব, প্রকৃতি সেই ছবি যায় এঁকে।
হাবে না এখানে উন্মেষ আর উচ্চ আকাঙ্ক্ষার
অপমৃত্যু যে রুদ্ধ করেছে সম্ভাবনার দ্বার।
এই সফলতা এনেছে মহান সাধনা শয়তানের
মোল্লা ও সূফী তাইতো গোলাম হলো রাজতন্ত্রের।
প্রাচ্য প্রকৃতি এই অহিফেনে নেশাতুর সহজেই,
কাওয়ালির চেয়ে এলমে কালাম কম নয় কিছুতেই।
তাওয়াফ, হজের চলন ধরায় যদিও দেখতে পাই
মুমিনের খোলা তলোয়ারে আর সেই প্রখরতা নাই।
কার নিরাশার ধ্বনি ওঠে আজ অনন্ত অম্বরে,
'জিহাদ হারাম এ যুগের সব মুসলমানের পরে?'

(১) আল্লাহর বাণী 'কুন ফা ইয়াকুন' এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহ যখন কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে চান তখন কেবল 'কুন' অর্থাৎ হয়ে যাও বলে দেন এবং তা সৃষ্টি হয়ে যায়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরামর্শদাতা

দেখ জনতার শাসনের ধ্বনি পৃথিবীতে যায় ডেকে,
বেখবর তুমি দুনিয়ার এই নতুন ফেতনা থেকে।

প্রথম পরামর্শদাতা

তীক্ষ্নদৃষ্টি মেলে পৃথিবীর জনপদে দিবা-যামী
রাজতন্ত্রের নবতর রূপ দেখেছি সেখানে আমি ঃ
যখন আত্মসচেতন হলো আদমের সন্তান
রাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সজ্জায় অম্লান
আমরা সাজাই কালভেদে শুধু প্রয়োজনে সময়ের;
নাই প্রয়োজন তাইত এখন রাজা বা বাদশাহের।
হোক পরিষদ জাতীয় অথবা দরবার বাদশার
যেখানে পরের দৌলতে চোখ, হাস্তি সেখানে তার।
পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের রূপ কি দেখনি চেয়ে,
উজ্জ্বল দেহ, চেংগিজী দিল আঁধারে ফেলেছে ছেয়ে!

তৃতীয় পরামর্শদাতা

যদি বাঁচে রাজতন্ত্র তাহলে নাই কিছু চিন্তার,
কিন্তু আছে কি ইহুদীর কাজে কোন প্রতিকার?
সে এক 'কলীম' তাজাল্লীহীন, 'মসীহ' সে ক্রুশবিহীন,
নবী নয় তবু হস্তে কিতাব দেখেছি তো নিশিদিন।
সেই কাফেরের দৃষ্টিতে জানি সূচি-তীক্ষ্নতা আছে,
হিসাবের দিন এনেছে প্রাচীন সকল জাতির মাঝে।
কোন বিকৃতি আছে বল বাকি প্রকৃতির মহফিলে,
ডেরা তাম্বুর খুটি প্রভুদের ভাঙে ভৃত্যেরা মিলে?

চতুর্থ পরামর্শদাতা

রোম পরিষদে দেখ এর প্রতিকার,
সীজারের খাব তার বংশকে দেখাই পুনর্বার।
কে আছে জড়িয়ে তরংগমালা ভুমধ্যসাগরের
'কোথাও সে শাল বৃক্ষ বিশাল, গুঞ্জন সেতারের।'
করিনা স্বীকার আমি তার বিজ্ঞতা;
পাশ্চাত্যের রাজনীতি পেল যার হাতে নগ্নতা।

পঞ্চম পরামর্শদাতা

হে প্রভু তোমার আত্মার তাপে পৃথিবীর যৌবন,
যেমন ইচ্ছা করেছ দীর্ণ সকল আচ্ছাদন।

www.pathagar.com

পানি, কাদা, মাটি জীবিত তোমার প্রাণের উষ্ণতায়,
বুদ্ধিদীপ্ত ধরণী তোমার অপরূপ শিক্ষায়।
তোমার চাইতে তাঁর সম্মান নাই মানুষের কাছে
পরওয়ারদিগার নামে পরিচিত যিনি মানুষের মাঝে।
রবের তারীফ, তসবী, তাওয়াফ যাদের মহান কাজ
তোমার সমুখে অবনত শির, তারা শুধু পায় লাজ।
ফিরিংগী যত যাদুকর জাতি তোমার মুরীদ ঠিক,
তবুও তাদের বুদ্ধিতে পীড়া পাই আমি মানসিক।
ইরানের সেই মাজদেক–যার প্রেতাত্মা, অনুচর
দুস্কৃতিকারী ইহুদী লেবাস ছেড়ে ধরনীর পর।
মরুর সে কাক হয়েছে শাহীন অথবা সে শাহবাজ,
কত দ্রুত গতি পরিবর্তিত জামানার ছবি আজ।
শুধু একমুঠো ধুলিকনা যাকে ভেবেছি সর্বদাই
দিক দিগন্তে ছড়িয়ে গেল সে আঁখি মেলে দেখি তাই।
বিপর্যয়ের শংকায় আজ কেঁপে ওঠে এই ধরা,
কাঁপে পর্বত, সমুদ্র আর বনানী নৃত্যপরা।
হে আমার প্রভু। বিপুল বিশ্ব দেখে ধ্বংসের পথ
তামাম জাহান আজ শুধু চায় তোমারি তো ইমামত।

ইবলিস

(নিজের পরামর্শ দাতাদের প্রতি লক্ষ্য করে)
চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, আকাশ, যতকিছু দেখ আর
বিচিত্র এই বিশাল বিশ্ব আমারি তো তাঁবেদার।
প্রাচী ও প্রতিচী দেখবে নতুন দৃশ্য যে দিবা-যামী,
পাশ্চাত্যের জাতিদের লহু তপ্ত করেছি আমি।
বুদ্ধিদীপ্ত রাজনীতিবিদ, পাদ্রী যে গীর্জার
হবে উন্মাদ শোনে যদি এই আহ্বান দুর্বার।
যে ভাবে কাঁচের কারখানা একে, মুর্খ নির্বিকার
ভেঙে দেখ নাকি এ পানপাত্র আরশি সভ্যতার।
ছিন্ন করেছে বস্ত্রাঞ্চল যে আঘাত নির্মম
জানি মাজদেকী যুক্তির সুচ সীবনে তা অক্ষম।
পারবে কি এ সমাজতন্ত্রী কাঁপাতে বক্ষতল,
চিন্তা ও কাজ দিশাহারা যার, ভাব উচ্ছৃংখল।
সেই উম্মত দেখে শুধু আমি ভয় পাই অনিবার
যার ভস্মের বক্ষে জীবিত অগ্নি আকাঙ্ক্ষার।
নগন্য, অতি নগন্যরূপে দেখি আমি আজ তারে

www.pathagar.com

প্রতি ভোরে জানি অজু করে শুধু তপ্ত অশ্রুধারে।
যার অন্তরে যুগ রহস্য ছায়া ফেলে অবিরাম
সে জানে আগামী দিনের ফিতনা সমাজতন্ত্র নয়, সে তো ইসলাম।

দুই.

কুরানের নয় ধারক এখন, এই উম্মত জানি
দীনের আকারে পুঁজিবাদ শুধু দেয় তাকে হাতছানি।
জানি গাঢ়তর প্রাচ্যের বুকে সঘন অন্ধ রাত,
নাই সে কাবার খাদিমের আজ শুভ্রোজ্জ্বল হাত।
এ যুগের দাবী জেনে এ হৃদয় কাঁপে শুধু তৃণবত
কোথাও মুক্ত হয় বুঝি ফের রসূলের শরীয়ত।
ভয় করি আমি নবীর বিধান, ভয় পায় দেখে মন,
পৌরুষ, যাতে হয় মানবীর সতীত্ব রক্ষণ।
সব গোলামীর মরণ বার্তা সে বিধানে আমি পাই,
যেখানে বাদশাহ, প্রভু নাই কোনো পথের ভিখারী নাই,
হয় আবিলতা-মুক্ত সকল সম্পদ সে বিধানে
বিত্তের শুধু আমানতদার করে যা বিত্তবানে।
এর চেয়ে বড় বিপ্লব কোথা কর্মের, চিন্তার,
বাদশার নয় বিশ্ব, জমিন, জাহান যে আল্লার।
রয়েছে গোপন দুনিয়ার চোখে এ বিধান সেই ভালো।
বিশ্বাসহারা মুমিনের প্রাণ অজ্ঞান, সেই ভালো।
বিরোধে মত্ত থাকুক এখন সে এলমে কালামের,
থাকুক মগ্ন কিতাবুল্লার শুষ্ক তর্কে ফের।

তিন.

যাঁর তকবীর বিদীর্ণ করে সকল তেলেসমাত,
আলোকিত যেন না হয় কখনো সেই মুমিনের রাত।
মৃত এ ইবনে মরিয়ম না কি চিরজীবি আছে সেই?
আল্লার গুণ তাঁর সত্তায় যুক্ত আছে কি নেই?
তিনি কি সেই ঈসা, আবির্ভাবের পথে যার উন্মীদ,
অথবা ঈসার গুণাবলী নিয়ে হবেন মুজাদ্দিদ,
কালামুল্লার শব্দ ধ্বংসশীল না চিরন্তন?
কোন আকীদায় হবে নাজাতের পন্থা উন্মোচন?
কাফী নয় সেকি এ যুগের সব মুসলমানের তরে
এলমে কালাম কী লাত-মানাত ছড়িয়েছে অন্তরে!
রাখো কর্মের ধরা থেকে দূরে সংশয়ে থরোথরো

www.pathagar.com

জীবন যুদ্ধে তার প্রচেষ্টা পর্যুদস্ত করো,
থাকুক পৃথিবী কিয়ামত তক গোলামী তমিস্রাতে,
ছেড়ে দিক ওরা এই গতিশীল ধরণী অন্য হাতে।
ওদের জন্য ভালো তাসাউফ অথবা কাব্য কথা,
রাখে বিশ্বের জীনব চিত্র গোপনে যে সর্বথা।
ভয় করি আমি জাগরণ সেই মহান উম্মতের
বিশ্ব পর্যালোচনা যে জানে হাকীকত এ দীনের।
প্রভাতী জিকির, মোরাকাবা মাঝে কর সবে মশগুল,
কর খানকাহী মেজাজে ওদের পক্ক, বদ্ধমূল ॥

(২) খানকাহী মেজাজ বলতে এখানে তাসাউফের জিহাদ বিরোধী, কর্মবিমুখ ধারার কথা বলা হয়েছে।

(৩) কবিতাটি আজ তেকে প্রায় ৬৭ বছর আগে ইকবালের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'যবুরে আজম'-এ প্রকাশিত হয়। ***– আবদুল মান্নান তালিব অনুদিত***

আল মাহমুদ

বিশ্বাসের চর

আর উপশম নেই, তবু এই ব্যথার বিষয়
তোমাকে জানাতে বড়ো সাধ আজ জেগেছে হৃদয়ে
এই তবে ভালোবাসা? এই নাকি প্রেমের গুঞ্জন
দেয়ালে তোমাকে দেখে কেঁপে ওঠা আপাদমস্তক?

আমাকে ফিরতে হবে। বাঁধা-ছাদা হলো না এখনও।
কে তুমি নৌকার মাঝি ধরে আছো মাস্তুলের দড়ি
ঢেউয়ের মাতম দেখে ভুলে গেছি কোন দিকে যাবো
কোন দিকে, কোন দিকে– কোন দিকে বিশ্বাসের চর?

আমার ফেরার দিন, কথা ছিলো বিদ্যুতের লেখা
কেবল তোমার মুখ এঁকে দেবে শূন্য নীলিমায়
নদী এসে ডাক দেবে। আদিগন্ত বৃষ্টির ধনুক
বহুবর্ণ তীর ছুঁড়ে গেঁথে ফেলবে আমার নয়ন।

নেমে এসো হে অন্ধতা। ভুলে গেছি নিজের কি নাম;
কি নামে ডাকতো লোকে, কোন গ্রামে ছিলো পিতৃকূল?
আজ শুধু হাওয়া থাক, আর কালো মেঘের গর্জনে
একটি মাস্তুল শুধু ভেসে ভেসে দূরে চলে যাক।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান সৈয়দ
আফজাল চৌধুরী

বিশ শতকের ষাটের দশক মিশে গেছে সময়ের ধারায়। ষাটের দশকের মানুষেরাও কেউ কেউ। কবিরাও কেউ কেউ। স্বপ্নকল্পনাও কোনো কোনো। চলে গেছে সিকদার আমিনুল হক, শাকের চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, পশ্চিম দিগন্তের আশ্চর্য আকাশ, রবীন সমদ্দার, যতিচিহ্নহীনতা, আন্‌ওয়ার আহমদ, পত্রিকাপাগলামি, বিপ্লব দাশ, কায়েস আহমেদ, সরু চিপা গলি, কামাল বিন মাহতাব, নিউজপ্রিন্টে অগণন কবিতা, আবুল হাসান, আফজাল চৌধুরী.....মিলিয়ে গেছে ঝরা পাতার মতন। পলাশগাছ ঢাকা শহরে আছে কি আর কোথাও? –সেই হঠাৎ লালে-লাল ফুলে ছেয়ে-যাওয়া, নগ্ন ডালে ডালে আগুন লেগে যাওয়ার মতন? ঢাকা শহরের সেই জনহীন দীর্ঘ দুপুর?

হ্যাঁ, এদের সঙ্গে আফজাল চৌধুরীও ফুরিয়ে গেল। যে-বন্ধুর সঙ্গে ছিল তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা, এখন সে তার নামও উচ্চারণ করে না। এরকমই হয়। এরই নাম সময়। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে আসি আমরা। আফজাল চৌধুরীও পৌঁছে গিয়েছিল তার নিজের জায়গায়। তার বিশ্বাসের ভূমি যেন পাথরের মতন হয়ে গিয়েছিল। তার উচ্চারণ ছিল তীব্র তীক্ষ্ণ ধাতব। গলানো ইস্পাতের মতন শব্দে গড়িয়ে আসত।

তার ছুরির মতন শাণিত কাব্যভাষা-গদ্যভাষা দেখেশুনে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম : কোথায় সে পেল এই জিনিস? আসলে সেখানে ষাটের দশকের সঙ্গে মিলেছিল অন্য দশক। অর্থাৎ দশকের ব্যাপারই ছিল না আর। ছিল না সময়ের কারচুপি। ছিল সময়হীন চিরন্তন মানুষের জেগে ওঠা।

জেগে উঠে আফজাল এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তার নামার্থক গহন বিদ্যা-আর-হৃদয়-বত্তার ছাপ রেখে গেছে তার অক্ষরমালায়।

অর্জন ছিনতাই কেন?
মাহবুবুল হক

আপনি বড় হতে চান, হোন
কেউতো আপত্তি করছে না
আপনি নাশার নবতর রকেট হোন
আটলান্টিকে বিচরণরত দাম্ভিক জাহাজের
নাবিক হোন
একবিংশ শতাব্দীর সকল করতালি সকল বাহবা

www.pathagar.com

আপনার জন্য উৎসর্গ হোক
শতাব্দীর সকল বিজয় মাল্য
আপনার গলে আশ্রয় পাক
সময়ের সকল প্রেস ক্যামেরা
আপনার দিকে তাকিয়ে থাক
টিভির স্ক্রিন আপনার ছবিতে
মুহূর্তে মুহূর্তে আলোকিত হোক
সংবাদপত্রের সকল কলাম
আপনার জয়গানে মুখরিত হোক
অডিওর ললিত কণ্ঠ
ভিডিওর আলো-কলা
সব আপনার জন্য নিবেদিত হোক
কিন্তু এ কারণে
আমার অর্জনকে ছিনতাই
করতে হবে কেন ?

মতিউর রহমান মল্লিক
একটি লোকের জন্যে
(কবি ওমর বিশ্বাসকে নিবেদিত)

একটি লোকের জন্যে কি আজ হরিৎ হবে হলুদ!
সম্ভাবনার সকল বাগান সবহারা বুদ্‌বুদ্‌!
দখ্‌নে হাওয়ার আসবে পতন কুঝ্‌ঝটিকার ঘায়ে!
সুনীল আকাশ দীর্ণ হঠাৎ চিল-শকুনের পায়ে!

একটি লোকের জন্যে কি আজ দিগন্তে মেঘ জমে!
বিহঙ্গদের নীড় ভেঙে দেয় হিংস্র সে এক যমে!
সাত সাগরের ঢেউ থামানোর জন্যে বালুর বাঁধ!
নয় কবুতর মারার লক্ষে ফাঁদ বরাবর ফাঁদ!

একটি লোকের জিব্বা কি আজ ভয়ঙ্কর হিশ্‌ হিশ্‌!
গোখরা সাপের সর্বনাশক বিষের চেয়েও বিষ!
ইঁদুর পোষার রাজনীতি তার ক্ষেত করে তছনছ!
সব চে' প্রাচীন ইবলিশও বাহ! মানছে তাকেই বস্‌!

একটি লোকের জন্যে কি আজ আসবে না সেই ভোর?
চলবে বুনেই স্বপ্নের জাল জনতার অন্তর?

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্প

ড. হাবিবা খাতুন

ক্যালিগ্রাফী বা লিপিশিল্প শিল্পকলার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কল্যাণকামী শিল্পীর শিল্পবোধ স্রষ্টার মহিমা প্রকাশ করে; জাগতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামী হয়। সেমিটিক ভাষা ও আরবী বর্ণকে অবলম্বন করে ইসলামী ক্যালিগ্রাফী শুরু হয়েছে। ইসলামের বাণী অবলম্বন করে এ লিপিশিল্প শিল্পকর্মের রূপকে আকর্ষণীয় করে। ধর্মবোধ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এক স্রষ্টার প্রতি শিল্পী নিজের আনুগত্য গভীরভাবে প্রকাশ করেন। বর্তমান ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বিশ্বে প্রীতিময় পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে শিল্পকর্ম তথা ক্যালিগ্রাফী শান্তির বার্তা হতে পারে। এ শিল্প তত্ত্বকথা সম্বলিত হয় বলে শিল্পবোদ্ধাদের মনে গভীর দাগ কাটে। এর আবেদন ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনায় ভরপুর।

ক্যালিগ্রাফী চর্চার শুরু থেকে এ শিল্পকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করার প্রয়াস চলে আসছে। শিল্পী মাত্রই সুন্দরের চর্চা করেন। সমাজে, পৃথিবীতে সুন্দরকে আবিষ্কার ও সকলের জন্য তা বিলিয়ে দিতে শিল্পী উদগ্রীব হয়ে থাকেন। আবেগ ও মেধা তাকে এ কাজ করতে প্রতিনিয়ত প্রেরণা জোগায়। আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পবিত্র কুরআন শরীফ জিব্রাইলের মাধ্যমে পাঠ করেছেন। তাঁর নিকটতম আত্মীয় হযরত আলী (রা) নিজে কুরআন পাঠ করেছেন ও ক্যালিগ্রাফীতে বা সুন্দর বর্ণে তা প্রকাশ করেছেন। আরবী বর্ণমালার মাধ্যমে তিনি ক্যালিগ্রাফী চর্চা করে ক্যালিগ্রাফারদের আদর্শ হয়ে আছেন। হোদায়বিয়া সন্ধির শর্তাবলী সুন্দর হস্তাক্ষরে তিনি লিখেছিলেন। সেই থেকে এ পৃথিবীতে আরবী লিপিকলার চর্চা হয়ে আসছে। মুসলিম শাসকগণ ক্যালিগ্রাফার শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে পাণ্ডুলিপি চিত্রায়নের ধারাকে বিশ্বের দরবারে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আব্বাসীয় আমলে অনুবাদ করা পাণ্ডুলিপিগুলোকে আরবরা যাতে সহজে বুঝতে পারে ও জ্ঞানকে সহজবোধ্য করতে পারে সে লক্ষ্যে শাসকেরা চিত্রিত পাণ্ডুলিপিকে অনেক সংখ্যায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। এভাবে বিশ্বজ্ঞান ভাণ্ডারকে আরবী ক্যালিগ্রাফী সমৃদ্ধ করে রেখেছে। আজ অবধি ফারসী, আরবী ভাষার মাধ্যমে স্বর্গীয় বাণীকে সাধারণের মাঝে আকর্ষণীয় ও সম্মানীয় করে রেখেছে এই ক্যালিগ্রাফী। সমাজে পবিত্র কুরআন 'হেফজ' করে যাঁরা হাফেজ হয়েছেন, তাদের মত একই পর্যায়ের সম্মানে সম্মানিত হন ক্যালিগ্রাফারগণ। তাঁরা আল্লাহ ও মানুষের কাছে অতি আদরের।

আরবী ক্যালিগ্রাফী চর্চা ঠিক কবে শুরু হয়েছিল, বলা যায় না। প্রাক ইসলামী যুগে মক্কার পবিত্র কাবাঘরকে সুন্দর হস্তাক্ষরে কবিতার পংক্তি দিয়ে বা ক্যালিগ্রাফী দিয়ে

www.pathagar.com

'ওকাজ' মেলার সময় সাজানো হতো। কবিরা সেখানে প্রাধান্য পেতেন। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে বলা হয় যে আদম (আ) এর পুত্র শীস (আ) আরবী বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করেন, আরবরা তারপর এ বর্ণের ও ভাষার আরও শিল্পরূপ বিকশিত করেন। ইসলাম প্রসারের সাথে সাথে ইসলামী ক্যালিগ্রাফী বিশ্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপে এখনও এ শিল্পচর্চা অব্যাহত আছে। বাংলাদেশে অনেক নবীন-প্রবীণ শিল্পী সম্পূর্ণ প্রাণের তাগিদে আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ক্যালিগ্রাফী ভিত্তিক শিল্পচর্চা করেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে সেখানে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্ডান, কুয়েত থেকে ক্যালিগ্রাফারগণ অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ক্যালিগ্রাফার শিল্পী সাদেকাইন, আবদুল জলিল, জাভিদ, রফিলাহহাম, জাবের আহমদ এর নাম আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত। বাংলার ইতিহাসে প্রাচীন কালের যে সব শিলালিপি ও তাম্রলিপি পাওয়া যায় সেগুলো সেমিটিক বর্ণের ছিল না বিধায় এ আলোচনায় তা আনা হয়নি। সুন্দর হস্তাক্ষর চর্চা অবশ্যই সে সময় করা হত। মুসলিম শাসনামলের ইতিহাসে ক্যালিগ্রাফী চর্চা করার নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলোর বেশিরভাগই মসজিদে লাগানো শিলালিপি অথবা সরাসরি মসজিদের দেওয়ালে লেখা আরবী অথবা আরবী ফার্সী মিশ্রিত কুরআনের আয়াত, রাসূলের বাণী এবং নির্মাতাদের পরিচয় সম্বলিত। এসব ক্যালিগ্রাফীতে আরবী বর্ণমালার বিভিন্ন লিখন রীতি যেমন কুফি, নাস্‌খ, সুলুস, তুগরা লক্ষ্য করা যায়। মুদ্রাতেও ক্যালিগ্রাফীর সন্ধান মেলে। এসবের অনেক নিদর্শন বাংলাদেশে জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। তবে বাংলার সর্বত্র দৃষ্টিনন্দন তুগরা রীতি বেশি প্রচলিত ছিল।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে তুগরা স্টাইলই ক্যালিগ্রাফীতে বেশি দেখা যায়। জল রঙে আঁকা ক্যালিগ্রাফী শিল্প আঁকিয়েদের মধ্যে ইব্রাহীম মণ্ডল, কে, এইচ, মনিরুজ্জামান, মনোয়ার হোসেন রয়েছেন। এবার ১৪ থেকে ২৪ শে জুন পর্যন্ত ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র চারুকলা বিভাগের উদ্যোগে ৬ষ্ঠ ক্যালিগ্রাফী শিল্প প্রদর্শনী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্যালারীতে হচ্ছে। প্রদশর্নীতে ৪২ জন শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে। এ সকল শিল্পীর মধ্যে এ দেশর প্রবীণ খ্যাতিমান শিল্পীগণও আছেন। তাঁদের সাথে থাকবেন আগামী দিনের প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীবৃন্দও যেমন ঃ- শিল্পী নাসির উদ্দিন আহমেদ খান, শহীদুল্লাহ এফ বারী, আমিনুল ইসলাম আমিন, মাহবুব মুর্শিদ, মোহাম্মদ আমিরুল হক, সৈয়দ আব্দুল হান্নান, মুনিরুজজামন, বশীর মেজবাহ, আবদুর রহীম, মুবাশ্বির মজুমদার, মনোয়ার হোসেন, ফেরদৌস আরা, রফিকুল্লাহ গাজালী, মোঃ শহীদুল্লাহ, হা- মীম কেফায়েতুল্লাহ মোঃ মাসুম বিল্লাহ, আল মারুফ, নূর আহমদ, নাজমুন সাঈদা (পলি), শর্মিলা কাদের, আইয়ুব আলী, রেশমা আকতার, মহিউদ্দিন, আরেফা চৌধুরী, আবুল

www.pathagar.com

খায়ের, জুয়েল, মোকাররমা, জামিল, মাসুমা আক্তার মিলি, ওবায়েদ, ইসহাক আহমেদ। প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী এ সকল শিল্পীর প্রায় সকলেই আরবী বর্ণ ও কুরআনের আয়াতসমূহকে বিভিন্নভাবে শৈল্পিকরূপ দিয়েছেন। শিল্পী ড. আবদুস সাত্তারসহ মাত্র কয়েকজন শিল্পী বাংলা বর্ণ ব্যবহার করেছেন। এবারের প্রদর্শনীতে বিখ্যাত প্রবীণ শিল্পী মুর্তজা বশীরের শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হচ্ছে। শীর্ষ স্থানীয় বাংলাদেশী শিল্পী হিসেবে তিনি ক্যালিগ্রাফীতে সর্বকালে ব্যবহৃত 'আলীফ লাম মীম' ব্যবহার করে একটি অনিন্দ্য সুন্দর শিল্প প্রদর্শন করেছেন। শিল্পী আবু তাহের, শামসুল ইসলাম নিজামী, সবিহ-উল আলম, রেজাউল করীম, বশীরুল্লাহ, কামরুল হাসান কালন, ইব্রাহীম মণ্ডল, আরিফুর রহমানও এদেশের প্রবীণ ক্যালিগ্রাফী শিল্পীদের মধ্যে আছেন। তাঁদের শিল্পকর্মও এখানে স্থান পেয়েছে।

কামরুল হাসান কালন একজন বলিষ্ঠ ক্যালিগ্রাফার শিল্পী। তাঁর শিল্পে আরবী বর্ণ ফুলময় প্রকৃতিতে গাঢ় কালচে সবুজ ও লাল রঙে কিন্তু গোলাপী উজ্জ্বল পরিবেশে প্রস্ফুটিত। মোটা ব্রাশ ও দৃঢ় নিজের আঁচড় ব্যবহারে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এদেশের শিল্প জগতে ইব্রাহীম মণ্ডল ইতোমধ্যেই ক্যালিগ্রাফী শিল্পী হিসেবে আসন পেয়ে গেছেন। তিনি নিয়মিত ক্যালিগ্রাফী চর্চা করেন। উজ্জ্বল রং এর ব্যবহার ও বর্ণছটা দিয়ে তিনি ক্যালিগ্রাফীকে অন্যান্য শিল্পের মতই আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তার ৮ টি চিত্র দর্শক চিত্তে একটি সুদৃঢ় স্থান করে নিয়েছে। এগুলোকে আরবী লিপিশৈলী সুলুস রীতির অন্তর্গত 'মাহী' রূপের বলা যায়। কেননা সুলুস রীতির ক্যালিগ্রাফীতে মাছ রূপের ছটা থাকলে তাকে শিল্প বিশারদদের বিচারে 'মাহী' রীতির অন্তর্ভুক্ত করা চলে। শিল্পীর শৈল্পিক বোধ এ সকল চিত্রে চমৎকারভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। আল্লাহর কালাম পাঠসহ এসব চিত্রে আল্লাহর মহিমাও উপলব্ধি করা সম্ভব। এটি এবারের প্রদর্শনীতে তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় চিত্ররূপে প্রকাশিত। শিল্পী মুনিরুজ্জামানের চিত্রটি রঙের ব্যবহার ও বর্ণ বিন্যাসের ফলে একটি উৎকৃষ্ট ক্যালিগ্রাফী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ক্যালিগ্রাফীতে এরূপ সমন্বয় কমই পাওয়া যায়। এ শিল্পীর 'প্রার্থনা' কাঠ খোদাই চিত্রটিও খুবই আকর্ষণীয়। 'আল্লাহ', 'আলিফ লাম মীম' শিল্প দুটি শিল্পী নাসির খানের গভীর শিল্পবোধের পরিচয় বহন করে। এবারের প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিনি ক্যালিগ্রাফী জগতে স্থান করে নিয়েছেন। ধর্মের মূল কথাকে ক্যালিগ্রাফার বা লিপিশিল্পী প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের মাঝেও দেখতে পান এবং সেটাই তিনি মোটিভ হিসেবে শিল্পকর্মে প্রস্ফুটিত করেন। এবারের প্রদর্শনীতে এরূপ আর একটি চিত্র 'নিষেধ'। শিল্পী আমিরুল হক বলিষ্ঠ হাতের মুঠিতে পানির মত নির্মলতায় এগুলোকে তৈল রঙের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। বলিষ্ঠ তুলির আঁচড়ে জল রঙে ক্যালিগ্রাফীতে আল্লাহর প্রশংসাসূচক বাণী প্রচার করেছেন শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ বারী। এক্ষেত্রে হা মীম কেফায়েতুল্লাহর শৈল্পিকবোধ অতি গভীর।

www.pathagar.com

আধুনিক অথচ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর 'রিমেম্বার' চিত্রে গাঢ় রঙের মাঝে উজ্জ্বল তীক্ষ্ম সরু তুলির ছোপে নৌকার আদলে 'আল্লাহ' লিখেছেন। অন্ধকার অসহায় অবস্থায় (আল্লাহ) তিনিই আশার আলো, এ বিষয়টি চিত্র কর্মটিতে ফুটে উঠেছে। তিনি বাংলা বর্ণের ক্যালিগ্রাফী রূপ সৃষ্টি করে তা উন্নত মার্গে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'হৃদয় আমার' আরিফুর রহমানের 'ভরসা' মাসুম বিল্লাহর 'গুরু-১' একই চিন্তা প্রসূত। তবে প্রকাশ ভিন্ন। এসব ক্যালিগ্রাফীর বিষয়বস্তু সর্বজন চিন্তার মর্মকথা ফুটিয়ে তোলে। তাই ক্যালিগ্রাফীটি অধিক পরিচ্ছন্ন। প্রকাশভঙ্গি স্পষ্ট। তুগরা রীতির এরূপ উদাহরণ অতি দুর্লভ। কিন্তু তার উপরে উল্লেখিত 'ভরসা' শিরোনামের ক্যালিগ্রাফীটি বাংলা বর্ণের অনুপম ক্যালিগ্রাফী রূপ। এটা একটা উত্তমরূপে প্রকাশিত চিত্র। চিত্রের কেন্দ্র বিন্দুতে গভীর অন্তস্থলে কবির ভাষায় তিনি লিখেছেন, 'আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান' এটা তার অন্তরের কথা। শিল্পের অন্তস্থলেই তিনি এটাকে স্থান দিয়ে সার্থকতা অর্জন করেছেন। বর্তমান বিশ্বের আহাজারি এখানে ব্যক্ত হয়েছে। এ ক্যালিগ্রাফী এই যুগকে প্রতিফলিত করেছে।

ক্যালিগ্রাফার আরিফুর রহমান ফার্সি কবিতার পংক্তির মাধ্যমেও শিল্প তৈরি করেছেন। 'জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের বিজয় অনিবার্য' ক্যালিগ্রাফীতে ধৈর্য-ধারণের কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ্যাক্রেলিক মাধ্যমে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা ক্যালিগ্রাফীর সার্থকতা এখানেই।

www.pathagar.com

কলিকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতি

ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর

কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর নিয়ে কলিকাতা শহরের পত্তন ঘটেছিল। সাহিত্য সংস্কৃতির যা-ই ওখানে ঘটেছে– এর ঐতিহ্য পুরনো নয় বরং ইংরেজ শাসিত আধুনিকতাই-এর উপজীব্য বিষয়। কলকাতা গণ্ডগ্রামের অধিবাসীগণ নবাবদের রাজধানী মুর্শিদাবাদকেই– ঐতিহ্যিক ও বৈষয়িক উন্নতির কেন্দ্রবিন্দু মনে করত। বলাবাহুল্য 'দিনে মশা রাতে মাছি– এই নিয়ে কলকাতায় আছি' এই লাইন দুটি রচনার সময়ও কলকাতা কোন ঐতিহ্যবাহী শহর ছিল না। কারণ এর মূলে ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিক আধিপত্যের প্রেরণা সক্রিয় ছিল। কলকাতার এই শুরু– সারা ভারতের উপর বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ, জব্দ শাসনযন্ত্র, স্তব্ধ স্বাধীন কণ্ঠ, নিঃস্ব স্বদেশী, বিলুপ্ত কৃষ্টি, অস্তমিত স্বাধীনতা সূর্য। কলিকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতিকে স্বদেশী কৃষ্টি-সভ্যতার বাইরে উপর্যুক্ত মহাসড়কের অভিযাত্রিক স্বপ্নবিলাস বললে অত্যুক্তি হবে না। যখন ইংরেজ শাসনের যাতাকলে পিষ্ট কলকাতা ও আশপাশের কিংবা সারাদেশের সাধারণ মানুষ, তখন কলকাতা কেন্দ্রিক শাসক ও জমিদার শ্রেণী যারা সাধারণের শোষক শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত, তারাই ইংরেজ ভাগ্যের অংশীদার রবীন্দ্রনাথের নব্য জীবন দেবতা। জীবন দেবতার সেবা দিতে এসে কলিকাতায় জড়ো হন মধ্য-স্বত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। নিম্নবিত্তেরও কেউ কেউ এই শ্রেণী বেষ্টনীতে প্রবেশ করে ধন্য রাজার ধন্য প্রজায় রূপান্তরিত হন। ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একদল মধ্যবিত্তের উত্থান ঘটেছিল কলকাতায়। এসেছিল এক ধরনের রেনেসাঁ, যাকে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁ বলে চিহ্নিত করা হয়। এই রেনেসাঁ যেমন সেই রেনেসাঁ নয় তেমনি এই সাহিত্য-সংস্কৃতি সেই-সংস্কৃতি নয়। এ এক চকচক করা পাথর, স্বর্ণ নয়, রূপ্য নয়, আতশবাজির দোকান। বৈষ্ণব কবির স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম স্বরূপ উনিশ শতকীয় রেনেসাঁর মায়ামোহে হিন্দুবাঙ্গালীদের বৈষয়িক উন্নতি হয়– অর্থাৎ চাকুরীর বিপ্লব সংঘটিত হয়। মুসলিম বাঙ্গালীরা শুরুতে মায়ামোহে বিভ্রান্ত না হলেও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আলিগড় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাদেরকেও একীভূত হতে হয়। অবশেষে চূড়ান্ত বিস্মৃতি ঘটে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মাধ্যমে।

শুরুতেই মুসলিম বাঙ্গালীদের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চকিত হয়, ওহাবী, ফরায়েযী, তিতুমিরের আন্দোলন হয়ে খেলাফত, ও সিপাহী বিপ্লব তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে। অপর দিকে ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ হিন্দু বাঙ্গালীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে ৪৭ পূর্ব স্বদেশী, অসহযোগ অন্দোলনের ক্ষীণ ধারায় স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করে। সীমাহীন ত্যাগ ও দুর্ভোগের পথ মাড়িয়ে মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তান আন্দোলনের

www.pathagar.com

ফসল ঘরে তোলে মুসলিম বাঙ্গালীরা আর প্রাপ্তির সুখস্বপ্নে আরো প্রাপ্তি ঘটে-হিন্দুবাঙ্গালীদের। ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ব- পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর শোষণ ও শাসন বৈষম্য বাদ দিলে সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বদেশী ধারায় খাদ নেই, আছে ৪৮, ৫২, ৭১ এর শ্রেষ্ঠ অর্জন ও প্রাপ্তি। এরই পরিণাম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বাংলার বিশ্বজনীন অভিষেক। কলিকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিম বঙ্গে দিল্লী ইউপির আধিপত্যে দেখা দেয় হতাশা আর বঞ্চনার অন্ধকার। এইভাবে গৌড় বঙ্গ আর সোনার বাংলার পশ্চিম অংশ ভারত মহাসাগরে তলিয়ে যায়, এককালের ভারতবর্ষের একটি সক্রিয় অংশের পতন ঘটে।

বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজধানী ছিল যথাক্রমে গৌড়, পাণ্ডুয়া, তাণ্ডা, সোনারগাঁ, রাজমহল আর মুর্শিদাবাদ। কলিকাতা আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে ওঠেনি, বিদেশী বেনিয়াদের ভাগ্যের দরজা হিসেবে, বিশেষ করে ইংরেজদের শাসন শোষণের ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল। ইংরেজদের আগমন আর কলিকাতার পত্তনের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে যে আধুনিকতা ও গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে, এই আধুনিকতা নাইট্রোজেন চক্রের মতো, অমোঘ নিয়মে অনেকটা নিচের দিকে প্রবাহিত পানির মতো। পরাধীনতার গ্লানি মাথায় নিয়ে প্রায় দুশতাব্দীর দাসত্ব শৃঙ্খলসহ শত-সহস্র বছরের জন্য দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ-বিভেদ, অনাস্থা, অবিশ্বাস, দাঙ্গা সৃষ্টির বিনিময়ে প্রাপ্তি আসলে কিছুই নয়। দরজা দিয়ে না ঢুকলে অন্তত জানালা দিয়ে আধুনিক বিশ্বের সকল অংশেই বিরাজমান, বিশ্বায়নের যুগে এটাই সম্ভব।

ইংরেজ সিভিলিয়ানদের শাসন-শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছয়জন সংস্কৃত পণ্ডিতকে শিক্ষক ও গদ্য লেখক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। খ্রীস্টান মিশনারীর পাদ্রী উইলিয়াম কেরী খ্রীস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ামের অধ্যক্ষ হন। সংস্কৃতবহুল সাধুভাষায় যে গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে– সেই গদ্য আজকের গদ্য নয়। অতএব গদ্যরূপ সেই প্রাপ্তি আজকের গদ্যরূপ এই প্রাপ্তি নয়, অর্থাৎ সেই প্রাপ্তি না ঘটলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আজকের প্রাপ্তি ঘটেই যেতো।

কথিত উনিশ শতকীয় রেনেসাঁর সুবিধাভোগী ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় আর রেনেসাঁ থেকে দূরে বহুদূরে অবস্থান করছিল সুবিধা বঞ্চিত সংখ্যা গুরু মুসলিম সম্প্রদায়। যে রেনেসাঁর ফসল ঘরে তোলে সংখ্যালঘুরা আর যে রেনেসাঁর সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে সংখ্যাগুরুরা সে রেনেসাঁকে রেনেসাঁ না বলে কিছু লোকের কিছু কিছু ক্ষেত্রে না লাভের রেনেসাঁ বলা যায়। তবে হিন্দু লেখকদের উপর একটি রেনেসাঁ ভর করেছিল যার নেতৃত্বে ছিলেন পঞ্চ-পান্ডব নামীয় পাঁচজন ব্যক্তিত্ব যথাক্রমে ঃ বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন রায়, বিদ্যাসগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, এদের সৃষ্ট রেনেসাঁ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর বরং তাদের পাঠক হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সীমিত জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। এই সীমিত জাগরণের লক্ষ্য, গতি-প্রকৃতি, সমাজ প্রগতি এবং পরিণাম পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে কলিকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য-

www.pathagar.com

সংস্কৃতিতে তারা কোন বিষয়ে, কি উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র হিন্দু সমাজকে জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। সনাতন হিন্দু সমাজকে রক্ষা এবং মুসলিম সমাজের ইসলামী ভাবাদর্শের মোকাবেলায় সাম্প্রদায়িক কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রবর্তন, সংরক্ষণ ও লেখনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব কলিকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশের বিভিন্ন ধারণা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-সংস্কৃতি পর্যালোচনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে উপর্যুক্ত পাঁচ ব্যক্তির পরিচয়সূত্র সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। তবে এই সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন ও কর্মের পাশে তৎকালীন ধর্মীয় সংকট, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় প্রসঙ্গে সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পর্যালোচনা হওয়া আবশ্যক। উনিশ শতকের গোড়ার দিক, কতকগুলো বড় বড় ঘটনায় আলোড়িত হয়ে ওঠে। ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা, খ্রীস্টান মিশনারীর তৎপরতা, বঙ্কিম চন্দ্রের হিন্দু ভারত, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, বিদ্যাসগরের হিন্দু সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একদিকে ইংরেজ তোষণ নীতি অন্য দিকে ভারতীয় সংস্কৃতি তথা দর্শন চিন্তা, শরৎচন্দ্রের সমাজ সংস্কার ইত্যাদি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা ঃ ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসনের ৪৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে। মুসলমানরা আনুগত্যশীল নয় তার প্রমাণ তারা ওহাবী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম মহিলারাও ওহাবী আন্দোলনের রসদ যোগানে ব্যস্ত। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ কিংবা নব্য সংস্কৃতির অনুসারী তারা হবে না এটা স্বতঃসিদ্ধ। সরকারের সন্দেহভাজন কড়া নজরের শিকার পূর্ব বাংলার মুসলিম যুব সমাজ। অপরদিকে চাকরী-বাকরীর সুযোগ গ্রহণে ব্যস্ত সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল হিন্দু যুবকরা, ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা, প্রশাসন ও সংস্কৃতির একচেটিয়া অনুসারী। প্রশাসনের আস্থাভাজন কলকাতা কেন্দ্রিক পশ্চিম বাংলার এলিটরা ফোর্ট উইলিয়ামের প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানায়।

ইংরেজ সিভিলিয়ানদের প্রশাসনিক কর্মের সুবিধা, বাংলা গদ্যে মিশনারী তৎপরতা, সংস্কৃতবহুল গদ্যে হিন্দু পণ্ডিতদের মুন্সিয়ানার প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে ফোর্ট উইলিয়ামে একীভূত হয়ে যায়। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সিভিলিয়ান নব্য বাঙ্গালী হিন্দু চাকুরীজীবীরা সরকারের আর্শীবাদপুষ্ট হয়ে সারা ভারতেই প্রাধান্য বিস্তার করে। কলকাতার পত্তন, উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্থাৎ– আশীর্বাদে হিন্দু বাঙ্গালীরা ক্রমান্বয়ে বৃটিশ ভারতীয় এদেশীয় সিভিলিয়ান হিসেবে অগ্রগামী হয়ে থাকে।

বঙ্কিম চন্দ্রের হিন্দু ভারত স্বপ্ন ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট বঙ্গিমচন্দ্র ইংরেজ আগমনকে আর্শীবাদ হিসেবেই দেখেছিলেন। তার চৌদ্দটি উপন্যাসে হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রকট হয়ে উঠেছে। মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে হিন্দু সমাজ রক্ষা ও সংস্কার আন্দোলনের উন্মেষ ঘটে। এমন কি, রাম মোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, শরৎচন্দ্র এই চেতনা থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নন। এঁদের সকলের মূল উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে হিন্দু সমাজ রক্ষা। উনিশ শতকীয় এই সংস্কার কর্মই হিন্দু মৌল চেতনার প্রথম ধাপ যা

www.pathagar.com

বর্তমান দ্বিতীয়, তৃতীয় ধাপে যথাক্রমে কংগ্রেসী, বিজেপি শাসনে রূপান্তরিত হয়েছে। ইংরেজদের সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্য থেকে স্বদেশ চিন্তা থেকে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে ওঠে যার মূলে ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদী পুঁজি। এই জাতীয়তাবাদী পুঁজি বিস্তৃত ও সুসংহত হয় দেশ বিভাগ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্ফোরণের মাধ্যমে যা আধুনিক ভারতের নেলী, গুজরাট, কাশ্মীরে সৃষ্ট সারাভারতের নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাত-পাত-ভেদে-বিভেদের ঐতিহ্যের কারণে হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনার সর্বনাশা সম্প্রসারণকে ভারসম্যপূর্ণ করার কোন অস্ত্র এখনও নেই।

অপরদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-ভারত চিন্তার বিপরীতে ওহাবী, ফরায়েযী ও তিতুমিরের জেহাদী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ঢাকা কেন্দ্রীক পূর্ব বাংলার নিপীড়িত নিগৃহীত মুসলিম বাঙ্গালী মানসে জাতীয়তাবাদী চেতনা আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে প্রকল্পিত হয়। পরিণামে তা মুসলিম অধিকার মুসলিম লীগের আন্দোলন তথা পাকিস্তান আন্দোলনে রূপ নেয়— পরিণতি লাভ করে, পাকিস্তানের জন্ম হয়, পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তানের সীমারেখা নির্মিত হয়। মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশেষ বৈশিষ্ট হলো এই যে এর পরিণতি কোন রূপ দাঙ্গা, হাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্ম দেয়নি। ১৯৪৭ পরবর্তী বর্তমান পাকিস্তানে, ৪৭ পরবর্তী বর্তমান ভারতের ন্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হাঙ্গামাজনিত মারাত্মক পরিস্থিতির কোন নজির নেই। অপরদিকে বাংলা ভাষাজনিত মাইগ্রেশন মুহূর্তের সাময়িক উত্তেজনার পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তান স্থির, শান্ত, সহিষ্ণু। এই অবস্থাকে অর্থাৎ স্থিতাবস্থাকে মুসলিম জাতীয়তাবাদী সংস্কৃতির গৌরব বলেই উল্লেখ করা যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মমত ঃ রাজা রামমোহন রায় জাত-পাত, ভেদ-বিভেদ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সংস্কারে অবতীর্ণ হন। মুসলিম সমাজের সাম্য, উদারতা, সংস্কার মুক্তিতে তিনি আকৃষ্ট হন। মূলে তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ব যা এক স্রষ্টার আরাধনা, একেশ্বরবাদ রূপে প্রকাশিত। এই চিন্তা-চেতনা থেকে অর্থাৎ ইসলামের উদার সাম্যবাদী আদর্শে উজ্জীবিত হয়েই এক পরম ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রাহ্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মমত যুগধর্মের মতোই হিন্দু সমাজে আলোচিত হয় তৎকালেও এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি– একালে তো নয়ই।

কলিকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মমত সাময়িক আলোচনার বিষয় ছিলো– কিন্তু সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি ও হিন্দু সমাজ সংস্কৃতিতে এর চিহ্ন ও প্রভাব নেই বললেই চলে।

–ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্য ও হিন্দু-সমাজ সংস্কার ঃ বাংলা গদ্যে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান রয়েছে দাড়ি, কমা, সেমিকলন, ডেস ইত্যাদি সংযোজনে। বিদ্যাসাগরীয় গদ্য সংস্কৃত বহুল শব্দে ভারাক্রান্ত। আধুনিক বাংলা গদ্য এখন আর সংস্কৃত বহুল নয় অর্থাৎ এই গদ্য সেই গদ্য নয়। অতএব বিদ্যাসাগরীয় গদ্যে প্রাচীন ভারত, সমাজ-সংস্কৃতি যে মুখ্য হয়ে উঠেছে, কলিকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্য এর বাইরে নতুন কিছু নয়। (চলবে)

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহসান ঃ একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

সোলায়মান আহসান

সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) এমন একটি নাম যাঁকে একটি বা দু'টি বিশেষণে আবদ্ধ করা যায় না। আবদ্ধ করা তো যায়ই না, তাঁর 'প্রকাশিত'কে ধারণ করা, তূল্যমূল্য বিচার করা একটি দুরুহ কাজ। তাই, সে কাজ যিনি করতে প্রয়াস পাবেন তাকে বরণ করতে হবে ব্যর্থতার অভিধা। সেই অভিধাকে প্রাপ্য জ্ঞান করেই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের বিস্তৃতি।

আগেই বলেছি, তাঁকে একটি কিংবা দু'টি বিশেষণে সনাক্ত করে মূল্যায়ন করা যায় না। সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন এমন এক 'বটবৃক্ষ' যার বিশালত্ব প্রত্যক্ষ করা, পরিমাপ করা বেশ সময় সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্যও বটে। 'গবেষণা' বলতে আমরা যাকে বুঝি (যা এখানে অনুপস্থিত এবং আমাদের কালে ক্রমশ বিলোপ পাচ্ছে) তা ছাড়া সৈয়দ আলী আহসানকে স্পর্শ করা, উদঘাটন করা মোটেই সম্ভব নয়।

সৈয়দ আলী আহসান তিরিশোত্তর কালের কবি প্রতিনিধি। বাংলা কাব্যের ধারায় 'তিরিশ' দশকটি নানা কারণে খুব আলোচিত। রবীন্দ্র প্রভাবকে কাটিয়ে একটি আধুনিক কাব্য-ধারা সৃষ্টি এই টার্নিং পয়েন্টটি ছিল 'একটি মাতাল ঘুর্ণি'। সেই ঘুর্ণির রেশ কাটিয়ে চল্লিশ দশকের কবিদের নিজস্ব পাটাতনে দাঁড়াতে শিরদাঁড়াকে শক্ত করতে হয়েছিল। সৈয়দ আলী আহসান কবি ফররুখ আহমদ কিংবা সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো আদর্শ নির্ভর এবং ঐতিহ্যিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে না গিয়ে একটি স্বতন্ত্র পথ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। যা এ দু'য়ের মিলিত এক ভারসাম্যপূর্ণ নিজস্ব ধারা। তাই কবি হিসেবে তিনি লাভ করেন উজ্জ্বলতা, যেদিকে দৃষ্টি ফেরাতে কাব্য রসিক বাধ্য। কবির কাব্য বিচারে বাড়ন্তে যাবো। কী পরিচয়ে তাকে সনাক্ত করি, কবি, সাহিত্যিক, সাহিত্যের ইতিহাস বেত্তা, শিল্প সমালোচক, অনুবাদক, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ, সাহিত্য-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রকে স্পর্শ করেছেন তিনি। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতোই সৈয়দ আলী আহসানও ইংরেজি ভাষায় ডিগ্রী অর্জন করেও সাহিত্যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার শিক্ষকতা করে সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন। শহীদুল্লাহর সঙ্গে পার্থক্য হলো-তিনি সংস্কৃত ভাষায় ডিগ্রী নিয়ে বাংলা ভাষার শিক্ষক ছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসান একজন অত্যন্ত সফল শিক্ষাবিদ ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাবস্থায় একটি কলেজে ইংরেজি ভাষার শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের (১৯৪৪) সূচনা হয়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তিনি 'দারুল ইহসান ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৯৯) ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে কিছুকাল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অর্ধশতাব্দীর বেশি বর্ণাঢ্য শিক্ষাবিদের এক বিশাল সফল জীবন বৃত্ত রচনা করেন। এ ছাড়া সাহিত্য-সংস্কৃতি-দার্শনিকতা-আত্মবিশ্লেষণাত্মক পাণ্ডিত্যপূর্ণ অদ্ভুত বাচনিকতা, বহুমুখী ও

www.pathagar.com

বিস্তারিত বিচরণ তাঁর মনীষাকে এক বিশাল মহীরূপ দিয়েছে। সেই মহীরুহের ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে আমাদের দেশের কতো জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ এবং বিকশিত বুদ্ধিবৃত্তিক সবুজ বৃক্ষরাজি, তার হিসেব রাখা দুষ্কর।

১. জীবন ও কর্ম

সৈয়দ আলী আহসান ২৬শে মার্চ ১৯২২ সালে অবিভক্ত ভারতে তৎকালীন যশোরের (বর্তমানে মাগুরা) আলোকদিয়া গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত সূফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম সৈয়দ আলী হামেদ, মাতার নাম সৈয়দা কামরুন্নেগার খাতুন। তাঁর শৈশব জীবন গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে। নদীর নাম মধুমতী। নদী সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি—'নদীর তীরে দাঁড়িয়ে অথবা বর্ষাকালে সর্বকূলপ্লাবী নদীর বিস্তার দেখে আমি বিচিত্র শব্দ শুনেছি নদীর স্রোতধারার অগ্রযাত্রার। আমার তখন মনে হয়েছে যে এ নদী একটি বিস্ময়কর অলৌকিক অসম্ভবের দিকে ছুটে চলেছে যার কোনো শেষ নেই। আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে নদীই আমার সর্বপ্রথম আলোক সামান্য আনন্দের অভিজ্ঞান।'

শৈশবে (১৯২৬-৩১) বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের হাতে বিদ্যাচর্চার হাতেখড়ি এবং ধামরাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। পরে ১৯৩৮ সালে আরমানিটোলা সরকারী হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্ত্তি হন। এখান থেকে তিনি ১৯৪৪ সালে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ছাত্র থাকাকালীন ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা ঘটে। পরে ১৯৪৫-৪৭ সালে হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে ৭ জুলাই কমর মুশতারীকে বিবাহ করেন। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট হিসেবে তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যোগ দিয়ে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা রেডিওতে বদলি হন। ১৯৪৯ সালে সাহিত্যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে তাঁকে লেকচারার হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়। এখানে থাকা অবস্থায় ১৯৫৪ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে নিয়োগ পেয়ে চলে যান। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক (তখনও মহাপরিচালক পদ সৃষ্টি হয়নি) পদে যোগ দেন। ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন এবং কলা অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য এবং বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হন। ১৯৭৫ সালে ১ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় যোগদান করেন। ১৯৭৭ সালে ২৬ জুন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা সংস্কৃতি ক্রীড়া ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। ১৯৭৮ সালের ২৪ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা

www.pathagar.com

বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৮২ সালে জানুয়ারী মাস থেকে Approach নামক একটি ইংরেজি ষান্মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৯৯ সালে ছোট ভাই ড. সৈয়দ আলী আশরাফ-এর মৃত্যুর পর দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বয়স এবং শারীরিক অসুস্থতার দরুন পরে তিনি ঐ দায়িত্ব ত্যাগ করেন। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী বহু মাত্রিক ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ প্রজ্ঞাবান, জ্ঞান তাপস, শতাব্দীর অন্যতম মনীষী সৈয়দ আলী আহসান ২০০২ সালের ২৫ জুলাই তাঁর জৈষ্ঠ্য কন্যার বাড়িতে ইন্তেকাল করেন।

২. সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন

সৈয়দ আলী আহসানের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনও খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি ১৯৩৯-৪০ সালে ঢাকা কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময় তিনি ভারত বিভক্তির আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সম্পাদক হিসেবে প্রথম বার্ষিক সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এই সম্মেলন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে মহাকবি কায়কোবাদকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ১৯৪৮ সালে আব্দুল গনি হাজারীর সঙ্গে ঢাকার 'আর্ট ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে আন্তর্জাতিক পিইএন পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন। এর আগে তিনি পূর্ব পাকিস্তান পিইএন এর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪১-৪৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়ে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রদের মাঝে দাঙ্গা হয়। এ সময় নজির আহমদ নামে একজন মুসলিম ছাত্র শহীদ হন। 'নজির আহমদ' নামক পুস্তকটি তিনি সম্পাদনা করেন। ১৯৫৯ সালে আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডম এর পাকিস্তান শাখার উদ্যোগে ISLAM IN THE MODERN WORLD বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করেন। ১৯৬৩ সালে বাংলা বানান সংস্কারের জন্য একটি উপসংঘ গঠন করেন। তিনি ছিলেন সভাপতি। অন্যান্য সদস্যগণ হলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসানাৎ, মুহাম্মদ আবদুল হাই, মোঃ ওসমান গনি, মোঃ ফিরদৌস খান, মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। বাংলা একাডেমীতে থাকাকালীন তিনি বংলার সঠিক মান নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নেতৃত্বে দেশের খ্যাতিমান পণ্ডিতদের নিয়ে উপসংঘ গঠন করেন। ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

৩. তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জি

১৯৩৭ সালে স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা প্রথম ইংরেজি কবিতা THE ROSE প্রকাশের মধ্য দিয়ে লেখায় পদার্পণ ঘটে। এরপর দীর্ঘ লেখক জীবনের সঞ্চয় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা-১০৫ টি।

www.pathagar.com

১. OUR HERITAGE (১৯৪৮) ২. STEPS TO ENGLISH নামে ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য ইংরেজি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ঢাকা বোর্ড (১৯৫০-৫১), ৩. ইকবালের কবিতা (১৯৫২) সম্পাদনা, ৪. গল্প সঞ্চয়ন (১৯৫৩) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সহযোগে যৌথ সম্পাদনা, ৫. নজরুল ইসলাম (১৯৫৪) সমালোচনা গ্রন্থ, ৬. করাচী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা (১৯৫৪), ৭. অনেক আকাশ (১৯৫৯) কাব্য , ৮. ক্লেয়ার ও ইভানগল এর `POEMES D` AMOUR' এর অনুবাদ (১৯৫৯) ৯. কবি মধুসূদন (১৯৫৯) সমালোচনা গ্রন্থ, ১০. কোরআন শরীফের আমপারা মাওলানা আবদুর রহমান বেখুদ এর সহযোগিতায় অনুবাদ (১৯৬২) ১১. গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটকের অনুবাদ (১৯৬৩) ১২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১৯৬৪) ১৩. ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতার অনুবাদ (১৯৬৫) ১৪. সহসা সচকিত (১৯৬৮) ১৫. উচ্চারণ (১৯৬৮) কাব্য ১৬. পদ্মাবতী (১৯৬৮) গবেষণা, ১৭. আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ শব্দের অনুষঙ্গ (১৯৭০) সাহিত্য গবেষণা, ১৮. মধুমালতি (১৯৭৩) সম্পাদনা, ১৯. রবীন্দ্রনাথ এর উপর গ্রন্থ (১৯৭৪) গবেষণা, ২০. রবীন্দ্রনাথ : কাব্য বিচারের ভূমিকা (১৯৭৪) সাহিত্য সমালোচনা, ২১. কাব্যসমগ্র (১৯৭৪), ২২. জার্মান সাহিত্য: একটি নিদর্শনী (১৯৭৬) সম্পাদনা ২৩. আধুনিক জার্মান সাহিত্য (১৯৭৬) সম্পাদনা, ২৪. সতত স্বাগত (১৯৮৩) মূল্যায়ন ও স্মৃতিকথা, ২৫. স্রোতোবাহী নদী (১৯৮৯) আত্মজীবনীমূলক, ২৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : আধুনিক যুগ, ২৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : প্রাচীন যুগ, ২৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : মধ্যযুগ (২০০৩) প্রভৃতি।

৪. ভ্রমণ

সৈয়দ আলী আহসান পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৬ সালে লন্ডনে ২৮ তম আন্তর্জাতিক পিইএন সম্মেলনে এবং ১৯৫৭ সালে টোকিওতে ২৯ তম আন্তর্জাতিক পিইএন সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে ১৪ সেপ্টেম্বরে এশিয়া ফাউণ্ডেশনের আমন্ত্রণক্রমে ম্যানিলায় যান এবং ইউনিভার্সিটি অব ফিলিপিনোজএ বক্তৃতা করেন। ১৯৫৭ সালে হংকং গমন করেন। ১৯৫৮ সালে ব্যাপকভাবে মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। তেহরান, বৈরুত, বাগদাদ, ইস্তাম্বুল, আংকারা, কায়রো ও অন্যান্য শহরে অবস্থান করেন।

১৯৫৯ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে ৩০তম পিইএন কংগ্রেসে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬০ সালে জুন মাসে পশ্চিম বার্লিনে আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ সময় তিনি লন্ডন, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, বার্লিন, ডুসেলডর্ফ, লিসবন, দক্ষিণ আমেরিকার রায়ো ডি জেনিরোতে যান। সেখানে আন্তর্জাতিক পি.ই.এন সম্মেলনে যোগদান করেন। অতঃপর বার্লিন হয়ে 'হাঙ্গেরিয়ান রাইটার্স ইন এক্সাইল' নামক দেশত্যাগী হাঙ্গেরীয় লেখকদের সম্মেলনে যোগদানের জন্য ডুলেসডর্ফে গমন করেন এবং ব্রাজিলের রিসিফে, রায়ো ডি জেনিরো ও ব্রাসিলিয়া শহর

www.pathagar.com

ভ্রমণ করেন। ১৯৬১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে লিডারশীপ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে আমেরিকা গমন করেন। এ সময় তিনি নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, মিসিগন, ইণ্ডিয়ানা, শিকাগো, সান ফ্রান্সিসকো, লসএঞ্জেলস, উইলিয়াম্‌স, আলবুকার্কি, নিউঅরলিন্স, বোস্টন, নিউইয়র্ক, প্যারিস ভ্রমণ করেন। ১৯৬২ সালে ডিসেম্বর মাসে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশীয় পিইএন সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে প্যারিসে 'বুলভার্ড হোমসানে' কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডমের অনুষ্ঠনে যোগদান করেন। এ সময় তিনি লন্ডন, বৈরুত গমন করেন। তেহরানে অনুষ্ঠিত শিশু-সাহিত্য সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পর্বের একটি সেমিনারে যোগদান করেন। ১৯৭২ সালে ১৬ এপ্রিল কোলকাতায় বাংলাদেশের উপর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে জুলাই মাসে এডিনবরায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিসমূহের সম্মেলনে বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে পশ্চিম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট, হাইডেলবার্গ, মিউনিখ, টুবিঙ্গো, স্টুটগার্ড, ওয়েস্ট বার্লিন, হামবুর্গ প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করেন। ১৯৭৫ সালে ভারতে নাগপুরে বিশ্বহিন্দী সম্মেলনে হিন্দী গবেষণা কর্মে বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। ১৯৭৫ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কিত সেমিনারে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে বুলগেরিয়ার জাতীয় ভাষা সাহিত্য ও লিপি দিবসে যোগদানের উদ্দেশ্যে মস্কো হয়ে সোফিয়ায় যান। ১৯৭৫ সালে ৪ অক্টোবর মস্কোয় অনুষ্ঠিত ২৫ তম প্যালেনারি এ্যাসেম্বলী অব ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ইউনাইটেড ন্যাশনাল এসোসিয়েশন-এ যোগদান করেন। ফেরার পথে বাগদাদ ও বোম্বাইয়ে গমন করেন। ১৯৭৭ সালে জুলাই মাসে জেনিভায় অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর শিক্ষা বিষয়ক অধিবেশনে যোগদান করেন। ফেরার পথে লন্ডন গমন করেন। ১৯৭৮ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণক্রমে লন্ডন গমন করেন। ১৯৭৮ সালে কুয়েত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে কুয়েত গমন করেন। ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক প্রকাশন সংস্থার আমন্ত্রণে সিঙ্গাপুর গমন করেন। ১৯৮০-৮১ সালে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদান করেন।

৫. সংবর্ধণা ও পুরস্কার

কবিতার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৮, প্রত্যাখ্যান), সুফী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৮৫), মধুসূদন পুরস্কার (১৯৮৫), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৮) Officer Del Orore Des Arts Et Des Letters Paris (১৯৯২), হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৭৪ সালে নাগপুর বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন থেকে সম্মাননা পত্র লাভ। ১৯৮২ সালে ষাটতম জন্মবার্ষিকীতে ব্যাপক আয়োজনের মাধ্যমে সংবর্ধণা প্রদান। বাংলা সাহিত্য পরিষদ পদক (১৯৯১), 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ' স্বর্ণপদক (১৯৯৮), চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার (২০০১) প্রভৃতি।

www.pathagar.com

৬. কবি

সৈয়দ আলী আহসান চল্লিশ দশকের অন্যতম কবি। সময়টা সাহিত্য এবং রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর, ১৯৪৬ এর মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ এ ভারত দ্বিখণ্ডিত হবার ডামাডোল, ১৯৪৮ এর ভাষা আন্দোলন এবং সাহিত্যে তিরিশের কবিদের দুর্দান্ত প্রতাপ—গোটা দেশ ও বাংলা সাহিত্যের এক মোড় পরিবর্তনের টান টান উত্তেজনা, এ সব কিছু সৈয়দ আলী আহসানের কাব্য মানস গঠনে প্রভাব ফেলেছে।

তিরিশের পঞ্চপাণ্ডব কবি-জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) ও বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮৩) তখন রবীন্দ্রনাথকে তুলোধূনো করে বাংলা কাব্যের স্রোতস্বিনীতে নতুন পাল উড়িয়ে নৌকার হাল ধরেছেন। এ সময় ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক-কবিবৃন্দের একাংশের বাংলা কাব্য শাসনকে অস্বীকার করে এমন ব্যক্তিটি কোথায়? চল্লিশের কবিদেরও সমঝে পা ফেলার এ সময়! শুধুমাত্র ব্যতিক্রম ফররুখ আহমদ ও সুকান্ত ভট্টাচার্য। একজন ইসলামী ঐতিহ্য এবং আদর্শকে ধারণ করে পুঁথি সাহিত্য থেকে আহরণ করে নতুন পথ রচনা করলেন। অপরজন বাংলা কাব্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে উপজীব্য করে শ্রেণী সংগ্রামের আওয়াজ বুলন্দ করলেন। এই দুজন ছাড়া চল্লিশ এবং পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত অধিকাংশ কবিদের ঘাড়ে তিরিশের কবিদের ভূত তাড়া করেছে।

সৈয়দ আলী আহসানের সমকালীন কবিরা হলেন-আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৫), ফররুখ আহমদ ১৯১৮-৭৪), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-৭৫), তালিম হোসেন (১৯১৮-৯৯), গোলাম কুদ্দুস (১৯২০), আবুল হোসেন (১৯২১), হাবীবুর রহমান (১৯২২-৭৬), সানাউল হক (১৯২৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯২০) সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) প্রমুখ।

সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন ইংরেজি ভাষায় সুদক্ষ। তাই বিশ্ব সাহিত্যের বিশাল ভূবনে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে পণ্ডিত হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক কারণে পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণের সুযোগ লাভ করেন। ফলে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর করা সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে।

এ প্রসঙ্গে ড. আলী আশরাফ বলেন, 'ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স এবং এম.এ করার ফলে ইংরেজি সাহিত্যের দরজা তাঁর কাছে খুলে যায়-সেই সঙ্গে বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে অবাধ গমনের অধিকার অর্জন করেন।'

তিনি শেক্সপীয়র, কীটস, ইয়েটস, এজরা পাউন্ড, রিলকে, ভলটেয়ার, হ্যোয়লারার, গ্যনটার হেরবুর্গার, হরস্ট বিয়েনেক, ওয়াল্ট হুইটম্যান, সিলভিয়া প্লাথসহ বিভিন্ন ভাষার কবি ও কবিতার সঙ্গে পরিচিত হন। আর তিরিশের কবিরা যা নিয়ে এক সময় খুব মাতামাতি করেছেন সৈয়দ আলী আহসান তা সচেতনভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। তিনি ফররুখ আহমদ এর প্রভাব থেকে বেঁচে চলারও সচেতন প্রয়াসী ছিলেন। সৈয়দ

www.pathagar.com

আলী আহসান চেয়েছেন একটা বড় রাস্তা না হোক, ছোট্ট গলি দিয়ে অন্তত তাঁর কাব্যযাত্রাকে একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যেতে। এ ক্ষেত্রে তাঁর সফলতাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে।

সৈয়দ আলী আহসান বহুপ্রজ কবি নন। তিনি নিরলস কাব্য সাধনা করেননি। তাঁর বহুমুখী কর্মতৎপরতা ও বহুবিধ প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালনের ভারে কাব্য সাধনা বিরতিহীন হতে পারেনি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র আটটি। এ ছাড়া রয়েছে একটি 'কাব্য সমগ্র' ও 'নির্বাচিত কবিতা' সেগুলো হলো-

১. অনেক আকাশ (১৯৫৯)
২. একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬২)
৩. সহসা সচকিত (১৯৬৬)
৪. উচ্চারণ (১৯৬৮)
৫. আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৪)
৬. কাব্য সমগ্র (১৯৭৪)
৭. সমুদ্রেই যাবো (১৯৮৭)
৮. চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৮৫)
৯. রজনী গন্ধা (১৯৮৮)
১০. নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৬)

সৈয়দ আলী আহসান কবিতাকে দেখেছেন দু'টি মৌলিক ধারায়। এক-তিনি বিশ্বাস করতেন কবিতায় জীবন-বিশ্বাসের আশ্রয় থাকতে হবে। তাঁর মতে-পৃথিবীর সকল মহৎ কবিতাই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে, বিশ্বাসের মহত্বেই পৃথিবীর কবিতা সমুজ্জ্বল হয়েছে। আমাদের বাংলা কবিতায় প্রধান নিরীক্ষণ এবং অবলম্বন হচ্ছে বিশ্বাস। মধ্যযুগের দীর্ঘ কয়েকশত বৎসর বাংলা কবিতায় বিশ্বাসের প্লাবন নেমেছিল। (কবিতায় বিশ্বাসের বিভূতি)

দ্বিতীয় যে বিষয়টি তিনি গুরুত্ব দিতেন তা হলো-কাব্য সৌন্দর্য। তাঁর মতে 'কবিতাকে কবিতা হতে হবে, যেমন একটি চিত্রকর্মকে যথার্থ চিত্রকর্ম হতে হবে। আমরা যেমন একটি চিত্রকর্মের প্রশংসা করি তার সৌন্দর্যের জন্য, একটি কবিতার প্রশংসা করব-তার বক্তব্যের জন্য নয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত স্বরূপের প্রকাশ ভঙ্গির জন্য।"

এই দুই মৌলিক বিষয়ের দিকে সৈয়দ আলী আহসান নজর রেখেছেন সর্বতোভাবে। এরপর তিনি আরেকটি বিষয় কবিতার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতেন তা হলো-কবিতার শব্দ। তিনি বিশ্বাস করতেন "কবিতা হচ্ছে শব্দের শিল্প।" এ ব্যাপারে তাঁর মত হলো—কবিরা শব্দ যেখান থেকেই আহরণ করুন না কেন কবিতায় ব্যবহারের ফলে শব্দগুলোর একটি "সামুদ্রিক' পরিবর্তন ঘটে। শেকস্পীয়র এটাকে 'সীচেঞ্জ' বলেছেন। অর্থাৎ একটি মৃতদেহ যখন বহুদিন পর্যন্ত সমুদ্রের অতলে থাকে তখন তার অস্থিগুলো প্রবাল হয় এবং চক্ষু দু'টি মুক্তা হয়। কেননা সামুদ্রিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মৃতদেহটি অন্য রূপ ধারণ করে। কবিতার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলো যে

www.pathagar.com

ক্ষেত্র থেকে এবং যে ব্যবহার বিধি থেকেই আসুক না কেন, কবিতার রূপকল্পের মধ্যে তার একটি 'সামুদ্রিক' পরিবর্তন ঘটে।'

এই দৃষ্টি সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়। সামুদ্রিক অতলান্ত দেখার গভীর দৃষ্টি ছিল তাঁর যেমন-

ঘনিষ্ঠ আশ্লেষে এসে মৃত্যু দেখি তোমার নয়নে
নির্নিমেষ নীল শিখা তন্দ্রাহীন সমুদ্র জোয়ার,
আকাঙ্ক্ষিত মুগ্ধ তনু-তনু নয়, অরণ্য প্রদেশ
যেখানে নক্ষত্র লুব্ধ বিড়ম্বিত পাতার আড়ালে
যেখানে রাজস্ব-দান সংগুপ্ত প্রহরে
অথবা একান্ত কেন্দ্রে সব একাকার।

(অনেক আকাশ/ নায়িকা-তিন)

সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন অত্যন্ত উঁচু মানের শিল্প রুচিবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। শিল্পকে তিনি স্থান দিয়েছেন সবার উপরে। আবার শিল্পের জন্য শিল্প-(Art for Art Sake) এ মতকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি অতিনান্দনিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। জীবন বিশ্বাস, মানুষের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা চলমানতাকে একসঙ্গে গেঁথেই তিনি শিল্পের জয়গান গাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। সে জন্য চল্লিশের অন্যান্য কবি যেমন ফররুখ, সুকান্ত ও সুভাষ সম্পর্কে খানিকটা তাঁর অনীহা ছিল।

ফররুখ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি অনেক বার তাকে বলেছি যে, দোভাষী পুঁথিতে একমাত্র কাহিনী বিন্যাসই লক্ষযোগ্য। দোভাষী পুঁথির শব্দ ব্যবহার এবং সেখানকার অর্থবহতা আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না। তার কারণ শব্দের অর্থ নির্ণয় তাদের লক্ষ্য ছিল না। পুঁথিকারগণ তাদের কাহিনী বর্ণনার ব্যস্ততায় নিমগ্ন ছিলেন। ফররুখ আমার কথা মানতেন না।' (ফররুখ সম্পর্কে)

চল্লিশের শ্রেষ্ঠ কবি ফররুখ সম্পর্কে তাঁর আচরণ ছিল রহস্যজনক। সমসাময়িক কবির প্রতি কাব্য হিংসা থাকা স্বাভাবিক কিন্তু তাঁর ছিল অনীহা এবং দ্বিধা। যদিও পরবর্তীতে তিনি মুখে ফররুখকে বড় কবি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সৈয়দ আলী আহসান কবিতাকে রাখতে চাইতেন স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ। Yeats ``The modern World is more powerful than any propaganda, that no nation can isolate itself from the crises of the modern world." সৈয়দ আলী আহসান বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে এতো ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে কারণে তিনি কাব্যযাত্রাকে একটি বৈশ্বিক ধারার সঙ্গে যুক্তকরণে প্রয়াস পান। তিনি বিদেশী ভাষায় কবিদের প্রকরণ এবং ধারার অনুবৃত্তি করতেও প্রয়াসী হন। যে কারণে সব সময় তিনি ছিলেন দোদুল্যমান। কোন পথে এগুবেন তা নিয়ে ছিলেন সন্দিহান। দেখা যায় তিনি 'চাহার দরবেশ' নামে বিশ্বাস ও ঐতিহ্য আশ্রিত কাব্য ১৯৪৫ এ রচনা করে তা প্রকাশ করেন ১৯৮৫ তে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি এই মূল্যবান কাব্যকীর্তিটি লুকিয়ে রাখেন। কেন?

www.pathagar.com

তাঁর ভাষায়-"আমার সময়কার কবিতাগুলোকে আমি গ্রন্থাকারে পরবর্তীকালে প্রকাশ করিনি। কেননা আমার বিচারে সেগুলো আমার কাব্য রচনার উন্মেষের সংবাদ বহন করে সত্য কিন্তু কোনও প্রকার কাব্যগত সিদ্ধির পরিচয় বহন করে না। ১৯৪৫ সালে আমি 'চাহার দরবেশ' রচনা করি। কবিতাটি ছ'টি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম এবং সর্বশেষ পর্ব দু'টি চারজন দরবেশের সমস্বর এবং মাঝের চারটি পর্ব এক একজন দরবেশের বক্তব্য। যদিও কাহিনীটি দোভাষী পুঁথি থেকে নেয়া, কিন্তু কাব্য নির্মাণ কৌশলের মধ্যে আমি টি.এস. এলিয়েটের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড' এর অনুসরণ করেছিলাম।"

(কাব্য সমগ্র গ্রন্থের ভূমিকা)

এখানে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে তিনি যেহেতু পুঁথি সাহিত্যের কাহিনী থেকে 'চাহার দরবেশ' কবিতাবলী 'নির্মাণ' করেন কিন্তু ফররুখ (সমসাময়িক কবি) একই উপাদান নিয়ে কাব্যের নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করতে পেরেছেন-তাই তিনি সে পথ পরিহার করতে চেয়েছিলেন। তবে সৈয়দ আলী আহসান শেষ পর্যন্ত আদর্শ চিন্তাকে বাতিল করেননি। বাদও দেননি কবিতার বিষয় হতে। তার প্রমাণ তিনি 'চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা' ও 'রজনীগন্ধা' কাব্যগ্রন্থ দু'টি পরবর্তীতে প্রকাশ করেছেন। ততোদিনে তিনি দ্বিধার পথ পেরিয়ে এসেছেন। ফররুখ আহমদ সম্পর্কে তার মত পরিবর্তন ছাড়াও মধ্যযুগীয় মুসলিম কাব্য মানস তাঁর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বিভিন্ন প্রয়াসে। এবার দেখি 'চাহার দরবেশ' এ তিনি কি বলতে চেয়েছেন-

১. প্রাণ-সম্পদ এখনো অনেক দূরে
অনেক দূরেতে জীবন-সৌধ আলোর অন্তঃপুরে
এখানে রাত্রি কালো কুয়াশায় ঢাকা
তমিশ্রা পথে মৃত্যুর ছবি আঁকা।

(চাহার দরবেশ)

২. রেশমে গাঁথিয়া বসরাই গুল শোনাবো প্রেমের গান
ঝড়ের মতন উড়ে যাবে দূরে আমার প্রণয় কথা
পাখির পাখায় লিখিব আমার প্রণয়ের মত্ততা
বসরা দেশের কুসুমিত মাটি গোলাপী গন্ধে পাঠালো আমন্ত্রণ।

(চাহার দরবেশ)

আগেই বলেছি সৈয়দ আলী আহসান অসম্ভব শিল্প সচেতন কবি। কবিতায় ছন্দ ব্যবহার, শব্দ নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ছিলেন নিপুণ কারিগর। তিনি বিশ্বাস করতেন কবিতাকে মেধা দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে নির্মাণ করতে হয়। তিনি এও বিশ্বাস করতেন ছন্দের জন্য কবিতা নয়-কবিতার জন্য ছন্দ। আর প্রথাবদ্ধ ছন্দই একমাত্র কবিতা নয়-ছন্দ ভেঙেও কবিতার জয় নিশান উড়ানো সম্ভব। তিনি একজন আধুনিক ঝকঝকে কাব্য-মনস্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেভাবে অক্ষর বৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, পয়ার ছন্দ ব্যবহার করে সিদ্ধতা প্রতিপন্ন করেছেন তেমনি অদ্ভুত গতিময় গদ্যাকারে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ

www.pathagar.com

ব্যবহার ও বাক্য বিন্যাসে অসাধারণ যাদু দেখাতে পেরেছেন। বাংলা কবিতার একক নিদর্শন 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতা। কবিতাটি বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নতুন ধাঁচের কবিতা। তিরিশের কবিরা অনেকেই যে ঘরে প্রবেশের জন্য মাথা কুটে মরছিলেন-সৈয়দ আলী আহসান অনায়াসে সে ঘরে প্রবেশ করে দেখিয়ে দিলেন। কী এক আশ্চর্য দেহ সৌষ্ঠব! কী এক মেজাজ! কী এক সম্মোহনী শক্তি কবিতার! উদাহরণ দিচ্ছি-

আমার পূর্ব-বাংলা কি আশ্চর্য
শীতল নদী
অনেক শান্ত আবার সহসা
স্ফীত প্রাচুর্যে আনন্দিত
একবার কোলাহল, অনেক বার
শান্ত শৈথিল্য
আবার অনেকবার স্তিমিত কণ্ঠস্বরের
অনবরত বন্যা
কতবার বক আর গাঙ শালিক
একটি কি দু'টি মাছরাঙা
অবিরল কয়েকটি কাক
বাতাসে বাতাসে প্রগল্‌ভ কাশবন
ঢেউ-ঢেউ নদী প্রচুর কথার
কিছু গাছ-আর নারকেল শন পাতার
ছাউনির ঘর নিয়ে
এক টুকরো মাটির দ্বীপ। (আমার পূর্ব বাংলা)

এই যে কবিতার গতিময়তা, চিত্রকল্প, শব্দের অনুরণন, ব্যাঞ্জনা যা বাংলা কবিতায় এক বিরল ঘটনা। হৃদয়কে টানতে টানতে এমন এক পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়া-যেখানে মানবিক বোধ রহিত না হয়ে পারে না।

তাঁর ভাষায়-'যা কিছু আমি দেখেছি এবং দেখছি বলেই সেগুলোর একটি চিত্রকল্প আমার স্মৃতিতে নির্মিত রয়েছে, সে সব স্মৃতিস্পটগুলো বিশেষ উপলব্ধি ব্যাখ্যার জন্য দৃশ্য গোচর তাৎপর্য নিয়ে শব্দের সাহায্যে উন্মোচিত হয়েছে।'

(কাব্য সমগ্র' গ্রন্থের ভূমিকা)

সৈয়দ আলী আহসানকে কবি হিসেবে এখনো তেমন মূল্যায়ন করা হয়নি। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রতিষ্ঠানিক মর্যাদা পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপস্থিতি জীবদ্দশায় তাঁকে উপেক্ষা করতে কেউ পারেনি সত্য কিন্তু তাঁর যথার্থ মূল্যায়নে তেমন উৎসাহী হয়নি। অনেকটা ইচ্ছাকৃত অবহেলা এবং বলয়কেন্দ্রিক পরিবেশ তাঁকে একপাশে সরিয়ে রেখেছে। তাই সাহিত্য সমালোচক বৃন্দের (আমাদের দেশে সংখ্যায় আঙ্গুলিমেয়) সৈয়দ আলী আহসান মনোযোগ কাড়তে পারেন নি।

www.pathagar.com

এখানে আমরা বিভিন্ন সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে সৈয়দ আলী আহসান-এই বিষয়টি দেখার প্রয়াস পাবো।

১. ত্রিশের কাব্যাদর্শের সঙ্গে আমাদের যে সকল কবি সংলগ্ন হতে পেরেছিলেন, সৈয়দ আলী আহসান তাঁদেরই সমসাময়িক হলেও, এ-কথা মনে করার কারণ আছে যে, ত্রিশের ধারাকেই তাঁর কাব্যের নিশ্চিত স্থিরীকৃত উৎস হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া তাঁর পক্ষে কখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।'

(আধুনিক কবি ও কবিতা/ হাসান হাফিজুর রহমান পৃঃ ২৬১)

২. সৈয়দ আলী আহসান অভিজাত মনোভাবের কবি। বস্তুত ঃ এই অভিজাত মনোভারের প্যাটার্ন আন্তর্জাতিক কাব্য-নিরীক্ষায় যেমন নির্ধারিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, বাংলা কাব্যের যজ্ঞশালায় এর তেমন পরীক্ষা হয়নি।

(আধুনিক কবি ও কবিতা/ হাসান হাফিজুর রহমান পৃঃ ২৬১)

৩. .....সৈয়দ আলী আহসান সম্পূর্ণভাবে 'স্বাতন্ত্র্য ধর্মী'। কবি সৈয়দ আলী আহসানকে বুঝতে হলে আমাদের কালের আমাদের সমাজ, সংস্কাব, ধর্মীয় চেতনা, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পরিবেশ পরিমণ্ডলের সুস্পষ্ট ইতিহাস পরিচয় আবশ্যক।

(ড. কাজী দীন মুহম্মদ)

৪. আমার বিচারে তিনি প্রেমের কবি। এই প্রেম শুধু কবিপুরুষের আস্বাদ করবার বিষয়বস্তু নয়। এ যেন কোনো এক অজ্ঞেয়কে আবিষ্কারের ঐকান্তিকতায় ব্যাকুল। যখন তিনি নারীকে আহবান করেন তখন জগৎ ব্যাপী মানবকূলের মধ্যে যত যুবতী আছে, হোক তারা পদ্মাপারের ধীবরকন্যা অথবা সিনাই পর্বতের ছাগচরানী যাযাবরী একই আহবানের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। (সৈয়দ গভীরতম আমার অন্বিষ্ট/ আল মাহমুদ।)

৫. .....তিনি কবিতায় শব্দ ব্যবহারকে শব্দের প্রয়োগকে সর্বাধিক মূল্য দিয়েছেন। এই বিষয়ের আলোচনায় ধর্ম-পাগল মানুষ যেমন ধর্ম নিয়ে, রাজনীতি-পাগল মানুষ যেমন রাজনীতি নিয়ে, সঙ্গীত-পাগল মানুষ যেমন সঙ্গীত ও সুর নিয়ে, ভোজনরসিক যেমন খাদ্য নিয়ে, কৃষক যেমন কৃষি নিয়ে অক্লান্তভাবে কথা বলে যান সৈয়দ আলী আহসান তেমনি ঘুরে ফিরে শব্দের প্রতি তাঁর অনুরাগকে প্রকাশ করেন।

(তিনি শুধু এক কবি/ শাহাবুদ্দীন আহমদ)

৬. সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২) আমাদের জৈষ্ঠ কবিদের একজন। তাঁর কবিতায় ভাবুকতা ও দার্শনিকতা খুব বেশি। জীবনের অন্তর্স্বরূপের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা তিনি করেন। কিন্তু ভাববাদী, অলোক ধ্যানে তদ্‌গত কবি রূপে ও রহস্যলোকের অনির্দেশ পরিক্রমণেই তাঁর আনন্দ। তিনি প্রধানত মধুর রসের কবি, সফল যত্নবান কবি।'

(আমাদের কবিতা/ বশীর আল হেলাল)

৭. একজন কবির পরিচয় নির্ভর করে তার কাব্য ভাষা ও নন্দনতত্ত্বের প্রকর্ষের উপর। এ জন্য একজন কবিকে প্রচণ্ড মেধাবী, সাহিত্যের প্রাজ্ঞ পাঠক নিয়ন্ত্রিত আবেগী এবং নির্মোহ সমালোচক হওয়া প্রয়োজন। সৈয়দ আলী আহসানের মধ্যে এ গুণের সমাহার ঘটেছে যথার্থভাবে। (সৈয়দ আলী আহসানের কাব্য সৌন্দর্য/হাসান আলীম)

www.pathagar.com

উপরিউক্ত মন্তব্যসমুহের মধ্য দিয়ে সৈয়দ আলী আহসানের কবিত্বকে পুরো উপলব্ধি করা সম্ভব না হলেও কবির কাব্য-মেজাজ, ভাষা এবং ধারা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, চল্লিশের এই কবি সাহিত্য সমালোচকদের কেন যে আকর্ষণ করতে পারেননি তা বোধগম্য নয়। বলা যায় দারুণভাবে উপেক্ষিত। এ ব্যাপারে তাঁর ছোট ভাই চল্লিশের আরেক পণ্ডিত কবি ড. সৈয়দ আলী আশরাফের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। 'তাঁর কাব্য বিচার সেই ব্যক্তিই সুষ্ঠভাবে করতে পারবেন যিনি বিশ্ব সাহিত্য সম্বন্ধে সঠিকভাবে ওয়াকিবহাল'।

যদি তাই হয়, তবে কি এ কথা মানতে হবে, সৈয়দ আলী আহসানকে মূল্যায়ন করার মতো বিশ্বসাহিত্য জ্ঞানসমৃদ্ধ সমালোচক আমাদের দেশে বরাবর অভাব পড়েছে? বিষয়টি এভাবে নাও হতে পারে। বরং আমার অভিমত হচ্ছে কবি বরাবর প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা অলংকৃত করেছেন, নিজস্ব ভূবনে থেকেছেন রাজাধিরাজ হিসেবে, শুচিগ্রস্ত মানুষের মতো আর সাহিত্যকে রাখতে চেয়েছেন সকল আবিলতা, মত ও পথের বাইরে আলাদা জগতে। সেটা কি এই দেশ ও মাটির বাইরের কোন ভূবনে? নিশ্চয়ই নয়। তাহলে? এই যে একটি সংশয় এই যে একটি দ্বিধা এর সঠিক জবাব পেতে হলে আমাদের আরো গভীরে যেতে হবে। সৈয়দ আলী আহসানের জীবন ও সাহিত্যের মর্মমূলে প্রবেশ করতে হবে। এখানে সেই চেষ্টা সঙ্গত কারণেই করছিনে।

৭. সাহিত্য গবেষক

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর পরে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং সাহিত্য সম্পর্কিত গভীর অন্বেষা এ গবেষণায় আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন সৈয়দ আলী আহসান তাঁদের অন্যতম। প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই এর সঙ্গে যৌথভাবে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ আধুনিক যুগ' (১৯৫৪) এককভাবে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রাচীন যুগ' (১৯৯৪) এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মধ্যযুগ' (২০০৩) গ্রন্থ তিনটি তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসভিত্তিক এক মূল্যবান গবেষণা। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান হচ্ছে তিনি বাংলা ভাষার ইতিহাস এবং মুসলমানদের অংশগ্রহণকে অত্যন্ত নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে হিন্দু সাহিত্য গবেষকরা যেখানে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগকে 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ সেখানে মধ্যযুগের সমৃদ্ধ সাহিত্যের নিদর্শন তুলে ধরেছেন। সৈয়দ আলী আহসান 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : মধ্যযুগ' গ্রন্থে আলাওল, আরাকান রাজ সভায় বাংলা ভাষা চর্চা, 'লাইলী-মজনু প্রণয়োপাখ্যানের দৌলত উজীর বাহরাম খান, দোনা গাজী, মালে মুহাম্মদ, শাহ মুহাম্মদ সগীর, আবদুল হাকিম প্রমুখ মধ্যযুগীয় মুসলিম প্রতিনিধিদের সাহিত্য কর্মকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন।

এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় সৈয়দ আলী আহসানের সাহিত্য গবেষণায় মধ্যযুগীয় মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের অভিমত-'বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আরম্ভ ধরা যায় ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয় থেকে। সে সময় থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। হিন্দী সাহিত্যে যেমন, তেমনি বাংলা সাহিত্যেও মধ্যযুগে ধর্মীয় সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। আবার হিন্দী সাহিত্যের প্রভাবও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পড়েছিল। এ সাহিত্যের ব্যাপকতা বিপুল, কিন্তু এ সাহিত্যের সকল অংশ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন-পদাবলী সাহিত্যে। অজস্র পদাবলী রচিত হয়েছে মধ্যযুগে-তার অধিকাংশই বিশেষত্বহীন। সেজন্য আমি আমার আলোচনায় চৈতন্য দেবের জীবন কথা আলোচনা করেছি এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কাব্য কুশলতা নিয়ে কিছুটা ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছি। মধ্যযুগে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাব্যকথা অনেক লিখিত হয়েছিল। আবার মুসলমানদের ধর্মীয় কথা নিয়েও কাব্য রচিত হয়েছিল। আমি উভয়কেই সমান মর্যাদা দিয়েছি। এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের যে সমস্ত ইতিহাস রচিত হয়েছে তাতে মুসলমানদের রচিত সাহিত্য বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। আমি আমার এই গ্রন্থে সেই গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছি।'

(প্রাসঙ্গিক/ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : মধ্যযুগ)

এছাড়া তিনি সাহিত্য বিচার, মূল্যায়ন এবং শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

৮. শিক্ষাবিদ

সৈয়দ আলী আহসানের জীবনের অর্ধ শতাব্দী জুড়ে রয়েছে একজন সফল শিক্ষাবিদের অধ্যায়। যিনি ইংরেজিতে এম. এ ক্লাসের ছাত্র থাকা অবস্থায় ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (১৯৪৪) শিক্ষকতায় প্রবেশ করেন। এরপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক পদে অধিষ্ঠান থেকে এবং দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে শিক্ষাবিদ হিসেবে বিরল ইতিহাস গড়েছেন তিনি। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ভারত বিভক্তির পর স্কুল পর্যায়ের ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের দারুণ সংকট মোচনে সৈয়দ আলী আহসান এগিয়ে আসেন। এছাড়া ইসলামী শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং চারু ও কারু কলা ইনষ্টিটিউট, শিল্পকলা একাডেমীতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন তাঁর বহুমুখী বর্ণাঢ্য ও সফল শিক্ষক জীবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সুকৃতির স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা লাভ করেন। শিক্ষাবিদ হিসেবে সৈয়দ আলী আহসানের অবদান পূর্বে সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্তে উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছি।

৯. অনুবাদক ও সম্পাদনা

সৈয়দ আলী আহসান জার্মান ও ফরাসী ভাষায় সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। জার্মান সাহিত্যকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের পরিচিত করার তাঁর প্রয়াস খুবই তাৎপর্যবহ। তিনি 'আধুনিক জার্মান সাহিত্য' এবং 'জার্মান সাহিত্য একটি নিদর্শনী' গ্রন্থ দুটির কিছু অনুবাদ, সম্পাদনা ও ভুমিকা লিখেছেন যা মূল্যবান কাজ হিসেবে স্বীকৃত। এ ছাড়া তিনি

www.pathagar.com

'ইকবালের কবিতা' অনুবাদ সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া হুইটম্যানের কবিতা, উইলিয়াম মেরিডিথের নির্বাচিত কবিতা, সোফোক্লিসের নাটক 'ইডিপাস, সৈয়দ আলী আহসানের উল্লেখযোগ্য অনুবাদ কর্ম।

১০. ধর্ম তত্ত্বজ্ঞ

সৈয়দ আলী আহসান সুফী পরিবারের সন্তান হওয়ায় এবং পরিবারে ইসলামী আদর্শের চর্চা থাকায় শৈশব থেকে ধর্ম বিষয়ে সচেতন এবং তার অনুসারী ছিলেন। তিনি আমপারা অনুবাদে হাত দেওয়া ছাড়া হযরত মুহম্মদ (স) এর একটি পুর্নাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ (মহানবী) রচনা করেন। তিনি একজন উদারনৈতিক ধর্মীয় আদর্শের অনুসারী ছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসানের আরেকটি অবদানের কথা এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত তা হলো, প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কর্তৃক গঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় সংস্কৃতি কমিশনের (১৯৮৯) তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। উক্ত কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে তিনি নিরলস পরিশ্রম করে যে রিপোর্ট পেশ করেন তা আমাদের জাতিসত্তার দলিল ও দিক নির্দেশক হতে পারতো। সৈয়দ আলী আহসানের পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও সুদুরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয় এই কমিশন রিপোর্টে পাওয়া যায়। দুঃখজনক যে এই কমিশন রিপোর্ট পৃথিবীর আলো বাতাস পায়নি। তাই, এই মূল্যবান দলিলটিও বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। একজন প্রকৃত প্রতিভাবান শিল্পী বহুমুখী হয়ে থাকেন। সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন একজন অত্যন্ত উঁচু প্রতিভাধর শিল্পী। তাই শিল্পের যে মাধ্যমেই তিনি হাত রেখেছেন সেখানেই তিনি ফুল ফুটিয়েছেন। এমনকি রন্ধন শিল্পেও। তাঁর হাত শুধু কাব্য নয়, শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয় বিশ্লেষণ নয়, কিংবা জটিল বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ নয়, তাঁর হাত বিবিধ শিল্প বন্ধনে ছিল পটিয়সী।

আগেই বলেছি সৈয়দ আলী আহসান একজন বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। একটি জাতি যেমন কৃতি ব্যক্তিদের নিয়ে গৌরবান্বিত হয়। তিনি তেমনি এক মনীষী পুরুষ। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শিক্ষা-দীক্ষা, মুগ্ধ বাচনিকতাকে দেশে-বিদেশে, বিশেষত : তার শত্রুরাও সমীহ করতে বাধ্য হতো। সমঝে চলতো তারা। অথচ দুঃখজনক ব্যাপার এই মনীষীকে আমরা চিনতে পারিনি। জীবদ্দশায় চিনতে ভুল করেছি। এ আমাদের অজ্ঞানতা, জ্ঞানের দীনতাই বলব।

www.pathagar.com

বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব

শ্রীদীনেশ চন্দ সেন বি-এ, ডি-লিট্

বাঙ্গলা ভাষা মুসলমান-প্রভাবের পূর্ব্বে অতীব অনাদর ও উপেক্ষায় বঙ্গীয় চাষার গানে কথঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। পণ্ডিতেরা নস্যাধান হইতে নস্য গ্রহণ করিয়া শিখা দোলাইয়া সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করিতেছিলেন, এবং "তৈলাধার পাত্র" কিম্বা "পাত্রাধার তৈল" এই লইয়া ঘোর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁহারা হর্ষচরিত হইতে "হারং দেহি যে হরিণি" প্রভৃতি অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতেছিলেন, এবং কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি পদ্য-রসাত্মক গদ্যের অপূর্ব্ব সমাস-বদ্ধ পদের গৌরবে আত্মহারা হইয়াছিলেন। রাজসভায় নর্ত্তকী ও মন্দিরে দেবদাসীরা তখন হস্তের অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া এবং কঙ্কণ ঝঙ্কারে অলি গুঞ্জনের ভ্রম জন্মাইয়া "প্রিয়ে, মৃগ্ধময়ি মানমনিদানং" কিম্বা "মুখরমধীরম, তাজ মঞ্জীরম্" প্রভৃতি জয়দেবের গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিতেছিল। সেখানে বঙ্গ-ভাষার স্থান কোথায়? ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গ ভাষাকে পণ্ডিতমণ্ডলী 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের অপাংক্তেয় ছিল–তেমনই ঘৃণা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল।

তিড়হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরীর আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোন শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মুসলমান বিজয় বাঙ্গলা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন-করিল। গৌড়দেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া গেল। তাঁহারা ইরান তুরাণ যে দেশ হইতেই আসুন না কেন, বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া বাঙ্গালী সাজিলেন। আজ হিন্দুর নিকট বাঙ্গলাদেশ যেমন মাতৃভূমি সেদিন হইতে মুসলমানের নিকট বাঙ্গলাদেশ তেমনই মাতৃভূমি হইল। তাঁহারা বাণিজ্যের অছিলায় এদেশ হইতে রত্নাহরণ করিতে আসেন নাই, তাঁহারা এদেশে আসিয়া দস্তুর মত এদেশবাসী হইয়া পড়িলেন। হিন্দুর নিকট উহা তদপেক্ষাও বেশী আপনার হইয়া পড়িল।

বঙ্গভাষা অবশ্য বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল, বুদ্ধদেবের সময়ও ইহা ছিল, আমরা ললিত বিস্তরে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যকে একরূপ মুসলমানের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাহা আমরা পরে দেখাইব।

চারিদিকে হিন্দু প্রজা– চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টার রোল, আরতির পঞ্চ প্রদীপ, ধূপ ধূনা, অগুরুর ধোঁয়া– চারিদিকে রামায়ণ মহাভারতের কথা, এবং ঐ সকল বিষয়ক গান।

www.pathagar.com

প্রজাবৎসল মুসলমান সম্রাট স্বভাবতই জানিতে চাহিলেন, "এ গুলি কি?" পণ্ডিত ডাকিলেন, তিনি তিলক পরিয়ে, শিখা দোলাইয়া নামাবলী গায়ে দিয়া হুজুরে হাজির হইয়া বলিলেন,

'এগুলি কি জানিতে চাহিলে আমাদের ধর্মশাস্ত্র জানা চাই। দ্বাদশ বর্ষকাল ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে প্রবেশাধিকার হইতে পারে।" বাদশা ক্রুদ্ধ হইলেন, "আমি ব্যাকরণ বুঝি না, রাজ-কাজ ফেলিয়া আমি ব্যাকরণ শিখিতে যাইব, তাহাও বামুন আমাকে পড়াইবে না, –ও সফল হইবে না! দেশী ভাষায় এই রামায়ণ মহাভারত ও ভগবত রচনা কর।" গৌড়েশ্বর দেশী ভাষা শিখিয়াছিলেন, না হইলে প্রজা শাসন করিবেন কিরূপে? তিনি পূরো দস্তুর বাঙ্গালী সাজিয়াছিলেন– সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। দেশী ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করিতে হইবে, এই আদেশ শুনিয়া পণ্ডিতের মুখ শুকাইয়া গেল– ইতরের ভাষায় পবিত্র দেব-ভাষা রচনা করিতে হইবে, চণ্ডালকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান দিতে হইবে! কিন্তু শত শত কল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, শত শত স্মৃতি লিখিয়া শত শত বৎসরে যাহা না করিতে পারেন, শাহানশাহ্ বাদশাহের একদিনের হুকুমে তাহা হয়– রাজশক্তি এমনই অনিবার্য্য। অগত্যা প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মণকে তাহাই করিতে হইল। পরাগলী মহাভারতে উল্লিখিত আছে, "শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরত খান রচাইল পাঞ্চালী সে গুণের নিধান।" এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, হুসেন সাহের পুত্র নসরত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইছিলেন। পাঞ্চালী (পাঁচালী) অর্থ মহাভারত। নসরতের আদেশে রচিত মহাভারতের উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। এই গ্রন্থ অনুমান ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। তখনও নসরত সম্রাট হন নাই– তাঁহাকে শুধু 'নায়ক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য পূর্ব্বাঞ্চলে প্রেরিত হন, তাঁহার বংশধরগণ ফেনী নদীর তীরস্থ পরাগলপুরে (নোয়াখালী জেলায়) এখনও বাস করিতেছেন, এখনও তাঁহারা তথাকার ভূম্যাধিকারী। এক সময়ে পরাগল খাঁ ও তৎপুত্র ছুটি খাঁর প্রতাপ এই প্রদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল, ছুটি খাঁর সম্বন্ধে কবি শ্রীকরণ নন্দী লিখিয়াছেন, "ত্রিপুর নৃপতি যার ভয়ে এড়ে দেশ পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।" তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন মহারাজ ধন্যমাণিক্য। তাঁহার মত এত বড় পরাক্রমশালী রাজা ত্রিপুরার ইতিহাসের আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন চাণক্য তুল্য রাজনীতিবিশারদ রায়চাগ। এহেন সম্রাটও ছুটি খাঁর ভয়ে উদয়পুরের পার্ব্বত্য দুর্গের নিভৃত কোণে আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকরণ নন্দী আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক জনৈক সুপণ্ডিত কবিকে মহা-ভারতের অনুবাদ রচনা করিতে নিযুক্ত করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বহুস্থানে পরাগল খাঁর প্রশংসা করিয়াছেন– 'শ্রীযুক্ত পরাগল খান পদ্মিনী ভাস্কর' তিনি। 'রস বোদ্ধা', 'গুণগ্রাহী' ইত্যাদি বিশেষণ তাঁর প্রতি সর্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ

www.pathagar.com

নন্দী উভয়েই মহাভারত অনুবাদের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়াছেন। কবীন্দ্র লিখিয়াছেন, 'নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর/তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর। লস্কর পরাগল খান, মহামতি/পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি/সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি। লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া/চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া। পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি/পূরাণ শুনন্ত নিত্য হরষিত মতি।' কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তিনি মহাভারতের স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুবাদ রচনা করেন। পরাগলের বিজয়দৃপ্ত সুযোগ্য পুত্র ছুটি খাঁ শ্রীকরণ নন্দীর দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

শ্রীকরণ নন্দী তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় ঐতিহাসিক অনেক কথাই লিখিয়াছেন। পরাগল খাঁর আদেশে বিরচিত মহাভারতের এক জায়গায় কবীন্দ্র পরাগলতনয় ছুটি খাঁর উল্লেখ করিয়াছেন ; 'তনয় যে ছুটি খান পরগ উজ্জ্বল/কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল।'

সেই স্বভাবের নিভৃত পরম সুন্দর নিকেতনে– চন্দ্র শেখর পর্ব্বতের ক্রোড় দেশে, শ্যামল বনস্পতি সচল মুক্ত পংক্তির ন্যায় নির্ঝরধারা অধ্যুষিত পরম রমণীয় রাজধানীতে বসিয়া প্রজারঞ্জক মহাবীর মুসলমান সেনাপতিরা হিন্দু পণ্ডিতের দ্বারা রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক– এই ছিল হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা। সে কামনা চরিতার্থ হইয়াছে। আজ ৪৫০ বৎসর পরে তাঁহাদের মাতৃভাষার গৌরবের সঙ্গে প্রজারঞ্জক এই রাজাদের কাহিনী দেশ-বিশ্রুত হইয়াছে। পরাগল খাঁর পিতা রাস্তি খানের সমাধি এখনও পরাগল পুরে বিরাজিত। ঐ পল্লীতে বিশাল পরাগালী দীঘি। এখনও সেই মহামনা লস্কর খানের স্মৃতি বহন করিয়া তরঙ্গায়িত হইতেছে।

হুসেন সাহ এবং অপরাপর মুসলমান সম্রাটেরা দেশীয় ভাষার কতটা অনুরাগী ছিলেন, তাহার প্রমাণ প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। কবি বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন– 'সে নসিরা সাহ জানে যারে হানিল মদন্ বাণে। চিরঞ্জীবী রহু গৌড়েশ্বর, কবি বিদ্যাপতি ভনে।।' অন্যত্র, 'প্রভু গায়েশ উদ্দীন সুলতান।' পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন কবি বিজয় গুপ্ত তাঁহার মনসাদেবীর ভাসান গান রচনা করেন, তখন গৌড়ের তখ্তে হুসেন সাহ সমাসীন ছিলেন। কবি অতি সশ্রদ্ধভাবে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন– 'সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক।' কবি যশোরাজ খান হুসেন সাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। 'সাহ হুসেন, জগত ভূষণ, সেই রস জানে। পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর ভনে যশোরাজ খানে।' কৃত্তিবাস রামায়ণের আদি অনুবাদ কর্ত্তা। তিনিও কোনো গৌড়েশ্বরের আদেশে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।

গৌড়ের শামসুদ্দিন ইউসুফ সাহ ১৩১৫ শকে (১৩৭৩ খৃঃ) মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি দিয়া তাঁহার দ্বারা ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের অনুবাদ করিয়াছিলেন। মালাধর বসু কুলীনগ্রামবাসী বিখ্যাত বসুবংশীয় এবং কৃত্তিবাসের প্রায় সমসাময়িক কবি।

www.pathagar.com

পর পর অনেকগুলি মুসলমান সম্রাটের সঙ্গে বঙ্গীয় পুরাণানুবাদকদের নাম গ্রথিত দেখা যায়। সুতরাং– আমাদের নিঃসন্দেহ ভাবে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, গৌড়েশ্বরগণের সহায়তা না পাইলে বঙ্গভাষা মাথা উঁচু করিয়া সুধী সমাজে দাঁড়াইতে পারিত না, মাথা হেঁট করিয়া পল্লীর এক কোণে চির উপেক্ষিতা হইয়া পড়িয়া থাকিত। এই সকল পুস্তক যে বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত হইতেছিল, ব্রাহ্মণগণ উহা কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহাদের রচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গলা প্রবাদবাক্য হইতে পরিষ্কার ভাবে জনা যায়। 'অষ্টাদশ পুরাণমনি রামস্য চরিতানিচ। ভাষায়াং মানবং শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ' অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণ ও রামায়ণ যাহারা বাঙ্গলা ভাষায় শ্রবণ করিবে, তাহারা রৌরব নামক নরকে গমন করিবে। ব্যক্তিগত ভাবে কৃত্তিবাস ও কালীদাস এই কুকার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের ক্রোধ বহ্নি হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কায়স্থকুলোদ্ভব কাশীদাস তাঁহার মহাভারতের প্রতি পত্রে ব্রাহ্মণদের এত স্তবস্তুতি করিয়াও তাঁহাদের অভিশাপ হইতে অব্যাহতি পান নাই। তিনি তো ভণিতায় 'মস্তকে রাখিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ' প্রতি পৃষ্ঠায় লিখিয়া তাঁহাদের মনতুষ্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ রচিত এই প্রবাদ বাক্য– 'কৃত্তিবেশে কাশীদেশে আর বামুন ঘেঁষে এই তিন সর্ব্বনেশে' (কৃত্তিবাস কাশীদাস এবং যাহারা বামুনদের সঙ্গে ঘেষিয়া সমান হইতে চায়– এই তিন সর্ব্বনেশে) এখনও স্মরণীয় হইয়া আছে। এ হেন প্রতিকূল ব্রাহ্মণ সমাজ কি হিন্দু রাজত্ব থাকিলে বাঙ্গলাভাষাকে রাজসভার সদর দরজায় ঢুকিতে দিতেন? সুতরাং এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মুসলমান সম্রাটেরা বাঙ্গলাভাষাকে রাজদরবারে স্থান দিয়া ইহাকে ভদ্র সাহিত্যের উপযোগী করিয়া নূতন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

আরাকান রাজের প্রধান সচিব মুসলমানধর্ম্মী ছিলেন কিন্তু তাঁহার নাম ছিল মাগন ঠাকুর। ১৬২৬-২৭ খৃঃ অব্দে মাগন ঠাকুর সৈয়দ আলওয়াল নামক কবিকে মালিক মহাম্মদ রচিত পদ্মাবৎ নামক হিন্দী কাব্যের বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিতে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গলা পদ্মাবৎ গ্রন্থের উল্লেখ আমরা পুনরায় করিব। দৌলত কাজি নামক এক কবি 'লোর চন্দ্রানি' নামক কাব্য রাজানুগ্রহে রচনা করেন।

মুসলমান রাজরাজড়ারা যে রীতি প্রবর্তন করেন, তাহা ব্রাহ্মণগণের নিষেধ বিধিও উপেক্ষা অগ্রাহ্য করিয়া প্রচলিত হইয়াছিল; শাহান সাহ বাদশাহগণ যাহা করিলেন, ছোট ছোট হিন্দু রাজন্যবর্গ তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বঙ্গভাষা ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজসভায় প্রতিষ্ঠা পাইয়া বিজয়ী হইল; ব্রাহ্মণগণই স্বয়ং রৌর নরকের ভয় অতিক্রম করিয়া শাস্ত্র গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রণয়নে তৎপর হইলেন! আমরা ষোড়শ শতাব্দীর কবি ষষ্ঠিবরকে জগদানন্দ নামক মুরুব্বির আদেশে মহাভারতের অংশ-বিশেষের অনুবাদ করিতে দেখিতে পাই। এই ব্যক্তি সম্ভবত কোন জমিদার বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ এই ভাবে বঙ্গদেশে বাঙ্গলাভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিলেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহাদের প্রভাব আমাদের ভাষার বক্ষে আরবী ফার্সীর ভুগুপদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিল। প্রাকৃত ভাষার উপর ঐ সকল বিদেশী ভাষার দুচ্ছেদ্য ছাপ্ পড়িয়া গেল। মুসলমানেরা রাজতখ্তে বসিলেন, তাঁহারাই সর্ব্ব বিষয়ে দেশে প্রাধান্য লাভ করিলেন। বিলাসের আসবাব, রাজদরবারে যাহা কিছু শাসন সংক্রান্ত সমস্ত উচ্চপদ তাঁহাদের অধিকৃত হইল। বাঙ্গলা ভাষার অভিধান বদলাইয়া গেল। "রাজস্ব" শব্দ 'খাজনায়" পরিণত হইল, "প্রজা"রা "রায়ৎ" হইয়া গেল। "মহাপাত্র" "উজীর" হইলেন, "নিশাপতি" 'কোটাল" হইল, "ধর্ম্মাধিকারী" "কাজী" হইলেন, "ভৃত্য" "নফর" হইল। "দোষী ব্যক্তি" "আসামী" হইল, অভিযোগকারী "ফৈরাদী" হইল।" "বিচারালয়" বা "রাজসভা" "আদালত" ও "দরবারে" পরিণত হইল। "প্রভু" হইলেন "হুজুর", দাস হইল "খেদমৎগার"। এইরূপ অসংখ্য শব্দ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, জাতীয় জীবনের উচ্চস্তরের ভাষা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যেখানে বিলাস,– যেখানে আমোদ-প্রমোদ, সেখানেও বিজেতাদের ভাষা প্রভাব বিস্তার করিল। যাহা সামাজিক জীবনের অধস্তরের কথা সেই শব্দগুলি শুধু প্রাকৃত ভাবাপন্ন রহিয়া গেল। কুটির বা কুঁড়ে কথার পরিবর্তন হইল না, মেটে তেলের দীপটি কুঁড়েঘরে "প্রদীপ" বা "পদিম" হইয়া জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু রাজপ্রাসাদে বা প্রাসাদোপম গৃহের আলো, ঝাঁড়, ফানুস, দেয়ালগিরি প্রভৃতি নাম বিদেশী কায়দা অবলম্বন করিল। শেষোক্ত শব্দটির শেষাংশ ফারসীর অপভ্রংশ। ভাত, দাইল, তেল, ঘি, ক্ষেতের শস্য প্রভৃতি শব্দ নাম বদলাইল না। কিন্তু খাদ্য যেখানে উপাদেয় ও বিলাসীর যোগ্য, তখন তাহা 'খানা' হইয়া গেল। ক্ষেত যখন প্রভুত্বের নিদর্শন সেখানে তাহা "জমি"। "ভুস্বামী" জমিন্দার হইয়া পড়িলেন। দেশের বাণিজ্য ধীরে ধীরে মুসলমানের হস্তগত হইল, উহার নাম হইল "কারবার", কারবারের সঙ্গে "আমদানী" "রপ্তানি"ও বঙ্গভাষায় ঢুকিল। সৌখিন লোকদের সুগন্ধি– অগরু ও চন্দনের স্থলে "আতর" "খোশ্‌বো" অধিকার করিয়া লইল। আকাশের বায়ু, তারা, চাঁদ, সূর্য্য এগুলি অভিধানে রহিয়া গেল কিন্তু যেখানে বড় মানুষদের গৃহ কৃত্রিম আলোমালায় সুশোভিত হইল, সেখানে তাহা রোশ্‌নাই নাম ধারণ করিল। পূর্ব্বে "মাগধী", "সূত" ও "বন্দীরা" শ্রুতিমধুর বন্দনা-গীতি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতের সঙ্গে মিল রাখিয়া প্রত্যুষে গান করিত, –সেই সংগীতের মোহনীয় গুণে রাজাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত, কিন্তু এখন তাহার স্থলে "রশৌনচৌকী" "নহবৎ" ইত্যাদি শব্দ প্রবর্ত্তিত হইল। রাজসিংহাসন এখন "তখ্‌ত্‌নামায়" পরিণত হইল। তাহা ছাড়া বিচারালয়ের সমস্ত শব্দ, "মতরজ্জম, 'নাজির', 'দলিল', 'দপ্তরখানা', 'মুসাবিদা' 'পেয়াদা' 'খাজাঞ্চি খানা' 'উকীল' 'মোক্তার' 'আইন' 'আরজী' প্রভৃতি শত শত শব্দ প্রাচীন ভাষার প্রাকৃত শব্দের স্থল কাড়িয়া লইয়া নিজেদের অধিকার বিস্তার করিল।

www.pathagar.com

আমরা দেখিতে পাইলাম,– বঙ্গভাষা মুসলমান সম্রাটদের কৃপায় দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিয়া 'দ্বিজের' ন্যায় সম্মান লাভ করিল। বঙ্গভাষার উপর আরবী ও ফারসী তাহাদের সুস্পষ্ট ছাপ অঙ্কন করিয়া দিল। এইবার আমরা দেখাইব তাঁহারা শুধু বঙ্গভাষার উপর পূর্ব্বোক্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা বঙ্গভাষাকে অপূর্ব্ব কবিত্ব সম্পদে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহারা! মুসলমানী কেতাব লিখিয়া বাঙ্গলাকে উর্দ্দুর দিকে টানিয়া আনিয়াছেন সত্য, কিন্তু বিকৃত মুসলমানী বাঙ্গলায় আমরা বঙ্গভাষায় তাঁহাদের রচনার উৎকর্ষের বিশিষ্ট নিদর্শন পাই নাই।

অনুমান ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ফতেয়াবাদ পরগণায় সৈয়দ আলওয়ালের জন্ম হয়। আলওয়াল জীবনে বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, যৌবনে এক জাহাজে চড়িয়া তাঁহার পিতা মজলিশ কাজির সংগে বঙ্গোপসাগরে যাইতেছিলেন। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা তাঁহাদের জাহাজ আক্রমণ করে, সেই সমুদ্রবক্ষে জাহাজের উপর ছোট খাট একটি জলযুদ্ধ হয়। আলওয়ালের পিতা যুদ্ধে নিহত হন। কোন রকমে অব্যাহতি লাভ করিয়া আলওয়াল আরাকান যাইয়া তথাকার সচিব মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। মহামনা মাগন ঠাকুর তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহারই আদেশে আলওয়াল পদ্মাবৎ কাব্যের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় সুজা বাদশাহ আরাকানে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সহিত আরাকান রাজ্যের মনোমালিন্য ঘটে। সুজা বাদশাহের গুপ্তচর বলিয়া আলওয়াল একটি মিথ্যাবাদী লোকের সাক্ষ্যে অভিযুক্ত হন, –এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া সাত বৎসর কাল কারা যন্ত্রণা ভোগ করেন। তৎপরে উদ্ধার পাইয়া তিনি "ছয়ফল মল্লিক ও বদিউজ্জামাল" নামক একখানি বাঙ্গলা কাব্য রচনা করেন। আলওয়ালের আরও অনেক কাব্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও সাদরে পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। তিন শত বৎসর পরেও যে কবির কাব্য জনসাধারণ হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছে–তাঁহার কবিতার গুণাগুণ আর সমালোচনা সাপেক্ষ নহে। তিন শত বৎসর যাবৎ যে কাব্য লোকের হৃদয়ে আনন্দ দান করিয়াছে, তাহার সমালোচনার আর বাকী কি আছে?

বাঙ্গলার একটি প্রদেশের একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। ইহা এত ছোট যে ইহাকে একখানি ইতিহাসিকা বলা চলে, ইহার প্রায় ৪০০ ছত্র কবিতা আছে। শমসের গাজি নামক এক ব্যক্তি কালক্রমে এমন প্রবল হইয়া উঠেন যে, তিনি ত্রিপুরেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎস্থলে নিজে অধিষ্ঠিত হন। শমসের আলীবর্দ্দি খাঁর সমসাময়িক লোকও প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এখনও শমসের গাজির গান ত্রিপুরায় গীত হইয়া থাকে– অবশ্য ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থে এঁর বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। শমসের গাজির বিবরণ সমস্তই ঐতিহাসিক। ইনি রাজ পদ প্রাপ্ত হইয়া দেশে শিক্ষা প্রচলনের যে রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, ধান চাউল ও অপরাপর খাদ্যদ্রব্যে এবং সোনা-রূপার যে দর বাধিয়া দিয়াছিলেন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেশের যে উন্নতি

www.pathagar.com

সাধন করিয়াছিলেন, তাহার একটি নিখুঁত ও খাঁটি চিত্র আমরা এই পুস্তকখানিতে পাইয়াছি। নানারূপ ঐতিহাসিক তত্ত্বে এই পুস্তকখানি পূর্ণ। যদিও গ্রন্থকারের নাম নাই, তথাপি তিনি যে মুসলমান ও শমসের গাজির অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন, বই পড়ার পর তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বইখানি, রাজকৃষ্ণবাবুর কথায় বলিতে গেলে একটি মুষ্টিভিক্ষা, কিন্তু উহা সুবর্ণ মুষ্টি, যেহেতু প্রাচীন বাঙ্গলায় ঐতিহাসিক পুস্তক অতি অল্পই আছে। প্রায় ১২বৎসর পূর্ব্বে নোয়াখালির জজ আদালতের সেরেস্তাদার মৌলভি লুৎফুল খবীর সাহেব এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিয়া আমাকে একখণ্ড উপহার পাঠাইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশর তাঁহার রাজমালায় শমসের গাজির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের উন্নত চরিত্রগুলি সুন্দর ও মহিমান্বিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে উপস্থিত করেন, তবে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে তাহাদের দ্বারা প্রভবান্বিত হইবে। উত্তর পশ্চিমে অনেক হিন্দু মহরমের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে এবং উৎসবের দিনে তাজিয়া বাহির করে। নিদারুণ তৃষ্ণায় জল বিন্দুর জন্য কোমল কুসুম কোরকের মত সখিনা ও কাসেম শুকাইয়া মরিলেন– কারবালা ক্ষেত্রের সেই করুণ কাহিনী কি শুধু মুসলমানেরই জাতীয় সম্পত্তি না সমস্ত বিশ্ববাসীর রস-সম্পদ? বঙ্গের যে পল্লীসঙ্গীত মুসলমান কৃষকের অতুলনীয় সম্পদ, যে গৌরব নভঃস্পর্শী, অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য, তাহার কথা আমি পরে লিখিতেছি। এখন এই সঙ্গীতের স্রোত মুসলমান সমাজে অবরুদ্ধ করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন শুকাইয়া মরিবে– বাড়ীখানি গঙ্গার তীরে অবস্থিত, সেই সুরনদীকে বদ্ধ করিলে জাতীয় জীবনের রসধারা কে সঞ্জীবিত রাখিবে? আমির খসরু সেতারের উদ্ভাবন করিয়া ছিলেন, মিঞা তানসেন সঙ্গীত বিদ্যারূপ হিমাদ্রির কাঞ্চন জঙ্ঘায় অধিরোহণ করিয়াছিলেন ইহারা কি ইসলামের ·ক্র ছিলেন?

এ পর্য্যন্ত আমরা অনেক মুসলমান বাঙ্গলা কবির নাম করিয়াছি, কিন্তু তাহা অতি নগণ্য অংশ। পূর্ব্ববঙ্গের নিরক্ষর মুসলমান চাষা ও মাঝিরা মুখে মুখে যে সকল গান বাঁধিয়া থাকে, তাহা অনেক সময় অতি সুন্দর কবিত্বময়। মুসলমান বাউলদের 'মূরসিদা' গান দেহতত্ত্ব বিষয়ক, তাহার ভাব-সম্পদ আধ্যাত্মিক, অনেক স্থলে তাহা এত সুন্দর যে আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়, সামান্য ফকির ও বাউলেরা কি করিয়া ধর্ম্মরাজ্যের সেই সকল সুক্ষ্ম তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছে! শত শত মূরসিদা গান সেই সকল বাউল, মাঝি ও কৃষকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া বাঙ্গলার পল্লীর আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই সকল পল্লীর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব করিবার সামগ্রী– আমরা কখনও করিয়াছি? এই বঙ্গদেশে কত মসজিদ, কত ইষ্টক ও শিলালিপি, কত কীর্ত্তিস্তম্ভ মুসলমানদের বিজয়ের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যেখানে মুসলমানদের

www.pathagar.com

গৌরব ও পরাক্রান্ত অভিযানের কথা নাই, যেখানকার ধূলি পীর দরবেশদের পদধূলি কিম্বা সমাধিতে পবিত্র হয় নাই। কত জন তাহার খবর রাখেন?

এ পর্য্যন্ত আমরা দেখাইয়াছি বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর মুসলমানদের কতটা প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমান কবি রাজসিংহাসনের দাবী করিতেছেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে এরূপ মুসলমান কবির আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা কবিকুল চক্রবর্ত্তী, যাঁহাদের যাশোভাদির নিকট আলাওল এমন কি ভারতচন্দ্রের খ্যাতিও পরিম্লান হইয়াছে।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিনখণ্ড পল্লীগীতিকা প্রকাশিত করিয়াছে। তাহাতে মুসলমান কবিদের যে কবিত্বের নিদর্শন আছে, তাহা অতুলনীয়। দুঃখের বিষয় এই সকল পল্লীগীতি সম্বন্ধে এদেশের লোক ততটা অবহিত নহেন। এই পল্লীগীতিকার প্রথম খণ্ডে "দেওয়ানা মদিনা" নামক একটি পালাগান প্রকাশিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে ফরাসীদের বিখ্যাত লেখক মহাত্মা রোম্যা রোলাঁ লিখিয়াছেন, এরূপ অদ্ভুত কাব্য তিনি গ্রাম্য কৃষকের নিকট হইতে প্রত্যাশা করেন নাই। পল্লী কৃষক কবি কিরূপে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় এই আশ্চর্য্য কীর্ত্তির মঠ রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

"দেওয়ানা মদিনার" প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন 'জালাল গাএন'। তিনি যখন ভাটিয়াল সুরে এই গানটি গাহিতেন, তখন বেদনায় শ্রোতাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিত ও তাঁহারা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন। উহা 'রয়াল' আট পেজি ফর্ম্মার ৩য় পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ। এত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে এরূপ করুণ রসাত্মক কাব্য আমরা আর কোন সাহিত্যে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রোম্যা রোলাঁ সমালোচনা রাজ্যের সম্রাট, তিনি নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে কবিকে তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসা দিয়াছেন। আমরা অধীন জাতি, আমরা নিজেদের কবি সম্বন্ধে একটা বড় রকমের প্রশংসা দিতে ভয় পাই। বিদেশী কবিগণের পশ্চাতে তাঁহাদের সমালোচকেরা দুন্দুভি-নিনাদ করেন ও তাঁহাদের ডঙ্কা-নিনাদে বসুধা কম্পিত হয় এবং লোকেরা গরুড় পক্ষীর ন্যায় জোড়হস্ত হইয়া থাকে- কিন্তু আমাদের পল্লীর ক্ষেত্রে যদি অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডও থাকে তাহা মাটির ঢেলার মত উপেক্ষিত হয়। "কাঠুরে এক মাণিক পেল, পাথর ব'লে ফেলে দিল, অভিমানে কাঁদছে মাণিক মহাজনে টের পেল না" –আমাদের পরাধীন দেশের কাঞ্চন কাঁচ হইয়া যায়, জয়দৃপ্ত বিদেশীদের কাঁচও কাঞ্চন মূল্যে বিকাইয়া থাকে।

জামাত উল্লা বয়াতির রচিত "মাণিক তারা" বা "ডাকাতের পালা" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই পালা গানটির কাব্য-ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়। কৃষক-কবি চাষাদের জীবনের যে নিখুঁৎ ছবি আঁকিয়াছেন বঙ্গ সাহিত্যে তাহার সমকক্ষ কবিতা কতটি আছে জানি না। এই পালাটির কোনস্থানে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় লিপি কুশলতা, কোথাও হাস্যরসোজ্জ্বল হৈমন্তিক রোদ্রের ন্যায় সুখদ-পদবিন্যাস, কোথাও পূর্ব্বরাগের রমণীয়তা– এ সমস্তই এমন দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে যে জামাত উল্লাকে সারস্বত কুঞ্জের প্রথম

www.pathagar.com

পংক্তিতে স্থান দিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। গ্রাম্য কবির এই কাব্যখানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত। পাড়াগেঁয়ে ভাষা কোন স্থানে প্রাদেশিকতার বাহুল্যে দুর্ব্বোধ, কিন্তু ধূলিমাটিমলিন হীরকের জ্যোতি কি সেই সকল বাহিরের মলিনতা ফুটিয়া বাহির হয় না? মাণিক তারার কবিত্ব-ভাতির গ্রাম্য ভাষার মধ্য হইতে সেইরূপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ডেও অনেকগুলি পালাগান আছে, তন্মধ্যে "মঞ্জুর মার পালা"টি উৎকৃষ্ট। যদিও কবির নাম পাওয়া গেল না, তথাপি ইহা যে মুসলমান কবির লেখা-সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মণির নামক এক মুসলমান সাপুড়ের কথা লইয়া এই কাব্য রচিত!

তৃতীয় খণ্ডের পল্লীগীতিকার আর কয়েকটা উৎকৃষ্ট পালা আছে, তাহার একটা মনসুর ডাকাত বা কাফন চোরার পালা। এই মনসুর ডাকাতের জীবনের গতি কি ভাবে ফিরিয়া গিয়াছিল–অতি জঘন্য নীচ ও নৃশংস-দস্যু বৃত্তি ছাড়িয়া সে কিরূপে একজন শ্রেষ্ঠ পীর ও সাধু হইয়াছিল, সেই মনস্তত্ত্বের আধ্যাত্মিক চিত্র-পটখানি কবি এই পালা গানটিতে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। মাঝে মাঝে এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ চরণ আছে যাহা পড়িলে কবিকে পল্লী–কালিদাস বলিয়া প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। একটি নববিবাহিতা নারী পল্লিপথে প্রথম শ্বশুর-বাড়ী যাত্রা করিয়াছেন। জোৎস্না ধবধবে রাত্রি আট জন পাল্কীবাহক তাহাকে লইয়া যাইতেছে– কবি সেই রাত্রি দুটি ছত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন–জ্যোৎস্না রাত্রি, দোলা চলিয়া যাইতেছে– কেহ যেন মুষ্টি মুষ্টি বেলফুলের কলি দ্যুলোক হইতে ভূলোকে ছড়াইয়া ফেলিতেছে, এমনই সুন্দর জ্যোৎস্না।

এই জ্যোৎস্না রাত্রে মনসুর ডাকাত কুর্ম্মাই খালের একটা বাঁকের কাছে, কেতকী ঝাড়ের আড়ালে লুকাইয়া পাল্কী খানির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে।

দোলার গতি, জ্যোৎস্নার বর্ণনা কবিতাগুলিকে এমন একটা ছন্দ দিয়াছে যে, মনে হয় যেন আমরা বাহকদের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি ও মনসুর ডাকাতের ব্যাঘ্রমূর্ত্তি চাক্ষুষ করিতেছি।

কিন্তু মনসুরের পরিবর্ত্তনের কথাটি অতি অপূর্ব্ব। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দিনে পাঁচবার নমাজ পড়িবে। এই দুর্দ্দান্ত দস্যু যে রমণীকে প্রকৃতই ভালবাসিয়াছে, তাহার নিকট এই প্রতিজ্ঞা–সুতরাং তাহা দুর্লভ্য।

হাতীখেদার গানটি একশত বৎসর পূর্ব্বের রচনা। এমন একটা বিষয় লইয়া যে কবিতা রচিত হইতে পারে, তাহা অনেকেরই ধারণার অগম্য। কিন্তু গ্রাম্য মুসলমান কবি ইহাতে অপর্য্যাপ্ত কাব্যরস ঢালিয়া দিয়াছেন। কবিতাগুলির বিদ্রূপছন্দ যেন শিকারীদের পদশব্দের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে। কবিতাগুলি একবারে স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতি রাখিয়া কোন স্থানে বন্দুকের আওয়াজ, অগ্নিদাহের চটপট শব্দ, কোথাও শিবিরে দর্শকদের কোলাহল ও মশালের আলোকমালার দীপালির শোভা– যেন পাঠককে প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

করাইয়া সেই অদ্ভুত বন্য-অভিযানের একেবারে কেন্দ্রস্থলে লইয়া গিয়াছে। হাতীগুলির ভীষণতা, বুদ্ধিহীনতা, অকারণ আশঙ্কাদলবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা-খেদার মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের আর্ত্তনাদ ও না খাইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া যাওয়া, -এই সমস্তই হয়ত নিত্যন্ত নীরস বিষয়-কিন্তু এগুলিকে যে-কবি এরূপ রসাত্মক করিতে পারিয়াছেন-তাঁহার কবিত্ব ধন্যবাদার্হ-ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ভাষা চাটগেঁয়ে, অনেক স্থলে বুঝিয়া উঠা কঠিন, কিন্তু নারিকেলের খোলাটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে যেরূপ ভিতরের সকলই সুসাদু ও সরস, ভাষার বাধাটা অতিক্রম করিলে এই কবিতাও তেমনিই উপভোগ্য ও পরম উপাদেয় বোধ হইবে।

আমরা মুসলমান বিরচিত আরও অনেক পালাগানের উল্লেখ করিতে পারিলাম না-সে গুলিতে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু আমাদের স্থান ও সময়াভাব।

মুসলমান সম্রাটগণ বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের এইরূপ জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা বহু ব্যয় করিয়া শাস্ত্রগুলির অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং সেগুলি আগ্রহ সহকারে শুনিয়া আনন্দিত হইতেন। আরব-দেশবাসীরা অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীরা শুধু ধনরত্ন আহরণের চেষ্টায় ভিন্ন দেশ জয় করিতেন না, সেই সকল দেশে যদি জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকিত, তাহাও তাঁহারা লুটিয়া লইতেন। আবুল ফজলের ভ্রাতা ছদ্মবেশে কাশীতে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আসিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ করিয়া সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহাতে নুতন কথা কিছুই নাই। বঙ্গসাহিত্য মুসলমানদেরই সৃষ্ট, বঙ্গভাষা বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। বহু পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করিয়া মুসলমান কবিগণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, -পালাগানের তাঁহারা যে শক্তি ও কবিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যিক আসরে তাঁহাদের স্থান প্রথম পংক্তিতে। কয়েকজন শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু এখন বঙ্গ-সাহিত্যের কাণ্ডারী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু গোটা বঙ্গদেশের সাহিত্য এখনও মুসলমানের হাতে- এই কথার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। ময়নামতীর গান হইতে আরম্ভ করিয়া গোরক্ষ-বিজয়, ভাসান গান ও পূর্ব্বোক্ত শত শত পালা গান, মূরশিদা গান, বাউলের গান, এ সমস্তই মুসলমানদের হাতে। তাঁহারাই অধিকাংশ স্থালে মূল গায়েন। তাঁহারাই তরজার গুরু। এই বঙ্গদেশ যে সুধামধুর কবিত্বরসে অভিষিক্ত, তাহার প্লাবন আনিয়াছে মুসলমান কৃষকেরা। একবার ধান কাটার পর বঙ্গদেশ-বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া আসুন, দেখিবেন, মুসলমান কৃষকেরা দল বাঁধিয়া কত প্রকারে গান গাহিয়া এদেশকে আনন্দ বিতরণ করিতেছে। কত বাউলের দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান, কত মাঝির ভাটিয়াল গান, কত রূপ কথা ও মনোহর কেচ্ছা ও গাজির গান তাহারা বাঙ্গলা দেশকে শুনাইয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করিতেছে। হিন্দুরা এ বিষয়ে কোনক্রমেই মুসলমানের সমকক্ষ নহে। দু'চারিজন শিক্ষিত লোক লইয়া এদেশ নহে। দুচারিজন উপন্যাস পড়ুয়ার হাতে বঙ্গদেশটি নহে। বঙ্গদেশ বলিতে যে সপ্তকোটী লোক বুঝায় তাহার শতকরা ৯০ জনেরও

www.pathagar.com

বেশী আধুনিক উচ্চ-শিক্ষার কোন ধার ধারে না। এই সুবৃহৎ জনসাধারণের শিক্ষা মুসলমান কৃষকেরা তাহাদের ক্ষমতা অনুসারে দিতেছে, সে ক্ষমতাও বড় সাধারণ নহে। যাহারা পদ্মাবতের ন্যায় এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য বুঝিতে পারে, দেহতত্ত্ব বিষয়ক অতি সুক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারে, তাহারা কি 'মুর্খ' অভিধান পাইবার যোগ্য? এই বিপুল জনসাধারণের ভাষা বাঙ্গলা, মুসলমানগণ এখনও এই ভাষার উপর পল্লীগ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন।

যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার পরিবর্ত্তে উর্দ্দূভাষা এদেশে প্রচলনের প্রয়াসী, তাঁহারা কখনই সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইবেন না। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের বাঙ্গলাই মাতৃভাষা, মায়ের মুখে তাহারা বাঙ্গলা ভাষা প্রথম শুনিয়াছে– সে ভাষা তাহাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা। ঘরের সামগ্রী তৈরী থাকিতে এরূপ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন তো কিছু দেখিতে পাই না। যদি বড় কিছু দিতে পার তবে ছোট জিনিষটি ছাড়িয়া দাও। সূর্যের আলো আনিবার ব্যবস্থা করিয়া ঘরের প্রদীপটি নির্ব্বাণ কর, নতুবা যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া ঘর আঁধার করিবে মাত্র।'

সওগাত চৈত্র, ১৩৩৫

www.pathagar.com

গোলাম মোহাম্মদ-এর কাব্য লক্ষ্য
হাসান আলীম

গোলাম মোহাম্মদ (১৯৫৯-২০০২) আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি। স্কুল-কলেজ জীবন থেকেই তিনি লিখতেন। কবিতা আর গানই তার রচনার প্রধান বিষয়। বিংশ শতকের ৮০-দশক থেকেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তার লেখা ছাপা হতে থাকে। কিন্তু তার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল একটু বিলম্বে। ১৯৯৭-তে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত তার ৫টি কাব্যগ্রন্থ ও ২টি শিশু কিশোর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থগুলো হলো ঃ ১. অদৃশ্যের চিল (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭), প্রকাশক ঃ সুবচন প্রকাশনী। ২. ফিরে চলা এক নদী (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮), প্রকাশক ঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ। ৩. হিজল বনের পাখি (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯), প্রকাশক ঃ স্বচ্ছন্দ প্রকাশন। ৪. ঘাসফুল বেদনা (একুশে বইমেলা, ২০০০), প্রকাশক ঃ স্বচ্ছন্দ প্রকাশন। ৫. হে সুদূর হে নৈকট্য (ফেব্রুয়ারি ২০০২), প্রকাশক ঃ স্বচ্ছন্দ প্রকাশন। ৬. ছড়ায় ছড়ায় সুরের মিনার (মে' ২০০১), প্রকাশক ঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ। ৭. নানুর বাড়ি (ফেব্রুয়ারি, ২০০২), প্রকাশক ঃ স্বচ্ছন্দ প্রকাশন।

গোলাম মোহাম্মদ স্বত:স্ফূর্ত ভাবেই কাব্য রচনা করতেন। তার অধিকাংশ রচনাই হৃদয় নিঙড়ানো ভাব মুর্চ্ছনায় পরিসিক্ত। হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগেই কাব্যকথা কলি প্রকাশিত হয়। এ ক্ষেত্রে মেধার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন পড়ে। উদ্দেশ্যহীন হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস-ই কেবল তার কাব্য নয়। তার কবিতায় আবেগের সাথে মেধা ও পরিকল্পনা মিশ্রিত হয়েছে।

উদ্দেশ্যহীন নয় তার কাব্যযাত্রা পথ। তার কবিতা জীবন ঘনিষ্ঠ। জীবন লক্ষ্যের সাথেই তার কাব্য কলিরা প্রস্ফুটিত হয়েছে। জীবন ঘনিষ্ঠ কবিতাকে কিছুতেই জীবন থেকে পৃথক করা যায়না। এ জন্য তার কবিতা সার্থক এবং জীবনবাদী।

গোলাম মোহাম্মদ-এর কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে এবং গভীর নিরীক্ষা করলে তার দর্শন ও লক্ষ্যপথ সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

কি তার লক্ষ্য? স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন জাগে। প্রত্যেক কবির-ই স্বপ্ন থাকে, লক্ষ্য থাকে। স্বপ্ন সাম্পানে চড়ে প্রত্যেক কবিই তার অভীষ্ঠ লক্ষ্য পানে ছুটে চলে।

গোলাম মোহাম্মদ-এর কাব্য লক্ষ্য ছিল তার দেশ মাতৃকা তথা সমগ্র বিশ্বে সার্বিক শান্তি অর্থাৎ মানবকল্যাণ সাধনের জন্য বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ সৃষ্ট এবং তাঁর রসূল হযরত মুহম্মদ (স)-এর প্রদর্শিত সত্য জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রেম ও পরজীবনের সাফল্য লাভ করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট করা দরকার যথা, ১. মাতৃভূমি তথা দেশ প্রেম, ২. বিশ্ব মানবিকতা, ৩. বিশ্বশান্তি তথা মানবতাবাদ, ৪. সত্য জীবন পথের অনুসরণ ও

www.pathagar.com

রসূল প্রেম, ৫. আল্লাহর ভালবাসা তথা স্রষ্টা সন্নিধান বা নৈকট্য লাভ করা। এবং ৬. পরজীবনে সাফল্য লাভের স্বপ্ন কল্পনা ছিল গোলাম মোহাম্মদের কাব্য লক্ষ্য।

এসব লক্ষ্য কমবেশি অনেক কবি তথা তার সতীর্থ কবিদের কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। গোলাম মোহাম্মদের এসব লক্ষ্য অভিন্ন হলেও তার স্বপ্নকল্পনা তার কাব্যভাষা ছিল আলাদা সুর নিষ্কনময়। তার কবিতা সহজেই অনেকের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

দেশ প্রেম

দেশ প্রেমের উন্মুল কবিতা অনেক কবিই লিখেছেন। মানুষ জন্মগতভাবেই তার জন্মভূমি, পরিপার্শ্ব, প্রকৃতি, মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকূলকে গভীরভাবে ভালবাসে। ভালবাসার এ প্রকাশ অনেকে করতে পারে অনেকে পারে না। যারা লিখে প্রকাশ করতে পারেন বিশেষত: ছন্দোময় চিত্রল ভাষায় যারা উপস্থাপন করতে পারেন তারাই কবি।

কবিদের ছন্দময় চিত্রল ভাষা সবার সমান নয়। তাই যুগযুগ ধরে কবিদের এ ভালবাসার পংক্তি নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে।

দেশপ্রেমের ভালবাসার এ বহি:প্রকাশ বিভিন্ন রকম– (ক) প্রকৃতি ও নিসর্গের স্তুতি, (খ) দেশের মানুষের দুর্গতি ও নিপীড়িত জনের প্রতি মর্মবেদনা প্রকাশ, (গ) দেশরক্ষা, ও বহি:শত্রুদের প্রতি ঘৃণা ও দ্রোহের উচ্চারণ, (ঘ) ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ, (ঙ) দেশের বীর শ্রেষ্ঠদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন প্রভৃতি।

গোলাম মোহাম্মদ-এর কাব্যে উপরোল্লিখিত ভালবাসার সবগুলো বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়।

গোলাম মোহাম্মদের নিসর্গ তথা প্রকৃতি প্রেম অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। তার এ ভালবাসার পংক্তিতেও রয়েছে এক ধরনের অস্তিবাদী দর্শন। দেশের বীর সন্তানদের প্রতিও তার ভক্তিময় দরদী উচ্চারণ লক্ষ্য করার মত।

উদ্ধৃতি ঃ

(১) পাখি
পাখিরে তোর ঈমান বড়ই পাকা
আহা!
তোর গানে যে মনের বিনয় মাখা
(পাখিরে তোর)

(২) হলুদ পাখি! তোমার মধুর গানে
শূন্য মাঠে সবুজ ফসল আনে
হৃদয় জানে তোমার পংক্তি বাণী
কোন সে ফুলের ঘ্রাণে ভেজা তোমার কণ্ঠখানি।
(হলুদ পাখি)

(৩) স্বপ্ন যেন খুকীর নরম চুল
কান্না এলে চাঁদকে পড়ে মনে
মন উড়ে যায় কনকচাঁপার বনে

www.pathagar.com

চলছি ভেসে তুফান তুফান গতি
বন্ধু আমার পদ্মা-মধুমতি। (বন্ধু আমার পদ্মা-মধুমতি)

(৪) এই মাঠে কি সোনার দামের পাট ছিল না?
চাষীর তখন ডাট ছিল না?
আমার সোনার পাট কেন আজ চাষীর দীর্ঘশ্বাস
কে করেছে শীর্ণ চাষীর এমন সর্বনাশ। (আমার সবু মাঠে)

(৫) সেই নদীটির প্রাণ ফিরিয়ে কেউ কি পার দিতে
তার হয়ে কি লড়ার সাহস আছে কারো চিতে
লড়তে যদি পারো
সেই নদীটি হাসবে সুখে আরো। (সেই নদীটি)

(৬) একটি দেশের সোনার দামের
পাটের মূল্য নেই
একটি দেশের স্বাধীন মানুষ
দুঃখে হারায় খেই। (সেই পাখিটি)

(৭) ফুলকে যারা পাচার করে
ফুলকে করে চুরি
তাদের প্রতি নিন্দা এবং
ঘৃণা ভুরিভুরি। (ফুল)

(৮) ও আমার ঘাসের গালিচা পাতা মাটি
ও আমার পরম আদর মাখা মটরের ভুঁই। (ঘাসফুল বেদনা)
(৯) তোমার হিংসার তীর নামিয়ে রাখো ঘাতক
দেখ নাই, দেশ প্রেম কিভাবে বেঁচে থাকে! (মানিপ্লান্টের কাণ্ডের মত)

(১০) দোর্দণ্ড শকুনগুলো
মানচিত্রের কলজে কামড়ে খাচ্ছে
সিরাজুদ্দৌলার মত খুন হচ্ছে নদী
ভূখণ্ডের অর্ধেক পরাধীনতার মত মরুভূমি
রাঙামাটির মধুর নিসর্গ
চুরি করতে চায় দুর্বৃত্ত বেনিয়া। (ভালবাসার পারদ)

(১১) স্বাধীনতা মানে কারবালা মাঠ দজলা ফোরাত নদী
হোসেনের মত বীর লড়াকুর প্রাণদান নিরবধি
স্বাধীনতা মানে উৎপাতহীন সীমান্ত নির্ভয়
সবুজ পতাকা মর্যাদাময় গর্বিত দুর্জয়। (সবুজ পাতাকা)

www.pathagar.com

বিশ্ব মানবতা

কবিরা অনুভূতি প্রবণ। সুখ দুঃখ, বেদনা কবিচিত্তকে দ্রুত আলোড়িত করে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে যে কোন ধর্ম বর্ণ ভাষার মানুষ নির্যাতিত হলে মানবতাবাদী কবিরা সোচ্চার হন প্রথম। গোলাম মোহাম্মদ একজন মানবতাবাদী, মানবদরদী কবি ছিলেন।

পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দুর্দান্ত প্রতাপে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জনপদকে, অন্যধর্মের লোকদের আক্রমন করছে। সাম্রাজ্যবাদী খৃস্টশক্তি মুসলিম জনপদে দেশে দেশে হত্যা, ধর্ষণ, জুলুম, নির্যাতন করছে।

মজলুম মানুষেরা ধুকে ধুকে মরছে। তাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, অস্ত্র নেই– তারা নিজ ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হচ্ছে।

আজকের পৃথিবীতে খৃস্ট সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রুসেড ঘোষণা করছে। বসনিয়া, চেচনিয়া, ইরাক, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তানসহ কাশ্মীর, বার্মায় মুসলিম নির্যাতন চলছে। এ জন্য কবিচিত্ত স্থির থাকতে পারে না– যে কোন মানবতাবাদী কবিই এই ঘৃণ্য সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করবে। কবি গোলাম মোহাম্মদ তাই নির্যাতিতের পক্ষে সুদৃঢ় উচ্চারণ করেছেন।

উদ্ধৃতি ঃ

(১) ইউরোপে কোন ইসলামী দেশ সহ্য করা হবে না,
তারা সূর্য দেখেনি, ইতিহাসের সত্য পাঠে তারা সীমাহীন শিশু
তারা দেখেনি একটা গুলি ছাড়াই
সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে লুটিয়ে পড়লো পাকা ফলের মতো।
স্পেন আর বসনিয়া এক নয়, আলীযা!
একদিন দানিয়ুব চোখ মেলেই দেখবে
আলীযার পায়ের চিহ্নে ফুল হাসছে
আর নিহত শিশুদের মুষ্টিবদ্ধ হাত বিক্ষোভে বলছে
– আমাদের রক্তের ঋণ ফিরিয়ে দাও, দানিয়ুব।
(আলীযা তোমার জন্য অনুভব)

(২) আকাশের ছাদ থেকে নীল খসে খসে
রক্ত সেখানে পুঞ্জিভূত লাল
স্বাধীনতার কবুতর মিশে যাচ্ছে সেই লালের ভেতর
যে হাতে স্বাধীনতা নেই
ঈদের চাঁদ তার কাছে বাচ্চাদের খেলনার মত নকল, বিরূপ
বিষাক্ত পৃথিবীর আকাশে উৎসবের চাঁদ কিভাবে অঙ্কুরিত হবে?
পৃথিবী! ফিলিস্তিনীদের প্রাণ তোমার কাছে এতই মূল্যহীন
ওরা শুধু খুন হবে হরিয়াল পাখির মতন? (হরিয়াল পাখির মত)

www.pathagar.com

(৩) মজলুম মানুষের আহাজারিতে ঝলসে ওঠে না
কোন বখতিয়ারের হাতিয়ার
কাশ্মিরী শিমুর কান্নায় যখন ঝিলামের পানি প্রশস্ত হয়
বিপন্ন নারীর চিৎকারে যখন কাঁপতে থাকে ভূ-স্বর্গ
তখনও সাড়া তোলে না।
পুঁজির পাহাড় আঁকড়ে পড়ে আছে ভোগবাদী বিশ্বাসীরা
জিহাদের আওয়াজ ঐখানে বিরক্তিকর জঞ্জাল
মানচিত্রের বিস্তারিত সবুজে আবু আবদুল্লাদের কৃতকৌশল
তাতার দস্যুর খুরের শব্দে কম্পমান বাগদাদ। (আলোকিত অতীত)

(৪) ফিলিস্তিন, আফগান, মিন্দানাও,
পিরেনীজ, পার্বত্যবাসীর অন্তর এখন অগ্নিময়
পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ মৃত্যু এবং বারুদের মুখোমুখি
মুমিনের চোখ আজ কোন প্রার্থনায় প্লাবিত হবে? (প্লাবিত প্রার্থনা)

(৫) সেই অশ্ব খুর ধ্বনি, জানবাজ মুজাহিদ!
দীনদার সৈনিক সম্রাট আজ নেই।
সেনা ছাউনী থেকে কার বেরিয়ে আসবে খালিদ সাইফুল্লাহ
দাম্ভিক পরাশক্তি অবনত মাথায় লিখে দেবে বশ্যতার দলিল। (ইতিহাসের পোট্রেট)

(৬) গ্রোজনীতে নৃশংস হামলা হচ্ছে
পূর্ব থেকে পশ্চিম কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই
ভাইয়ের মৃত্যুতে কাঁদছে না ভাই,
পৃথিবীর ছাদ- বিশ্বজুড়ে কিসব মিথ্যার মিসাইল
পৃথিবীর শত কোটি মানুষের কণ্ঠ আজ কত ক্ষীণ!
চতুর সভ্যরা সুকৌশলে মিথ্যে বলছে
ভাগ করে ফেলছে আমাদের ঘর- আমাদের দুর্গ। (কাক ও বিক্ষোভ)

আল্লাহ ও রাসূল প্রেম

আধুনিকতার নামে কবিতায় নৈরাশ্যবাদ এবং নাস্তিবাদ হাঁটু গেঁড়ে বসেছিল। কবিতার অঙ্গনে ঢুকেছিল বস্তুবাদ এবং ভালগারিজম। বিশংশতকে আধুনিকতার এই নোংরা হাওয়া পাল্টাতে শুরু করে ক্রমে ক্রমে এবং ৮০ ও ৯০ দশকে এসে আস্তিক্যবাদের বিমল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

আধুনিক কাব্যে বিশ্বাসের সুদৃশ্য ইমরাত তৈরি হতে থাকে বিপুলভাবে। মধ্যযুগে আমাদের সাহিত্য ছিল সমৃদ্ধ। আধুনিকযুগে বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ্বাসের ধারা অজস্র সমৃদ্ধিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

একসময় সাহিত্যে আস্তিক্যবাদ ছিল আধ্যাত্ম রস নিসিক্ত মরমীবাদে উচ্ছ্বসিত। এখন আমাদের সাহিত্যে আস্তিক্যবাদ এসেছে বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে অনিবার্যভাবে। স্রষ্টা

www.pathagar.com

প্রেম ও রাসূল প্রেম গণবিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। নেহায়েত কাল্পনিক আনন্দবাদ থেকে এ প্রেম নির্ঝর উদ্‌গত হয়নি বরং সময়ের প্রয়োজন মেটাতে মানব সত্যের বাস্তব ভূমি থেকে তা উৎসারিত হয়েছে। গোলাম মোহাম্মদ সময়ের আধুনিক সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই তার কাব্যে বিশ্বাসের কথা, গণ মানুষের জীবনাচার উঠে এসেছে। তিনি নিজেও এই বিশ্বাসের স্বর্ণ সন্তান। বিশ্বাসের উচ্চারণে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি তার ভক্তিবাদ স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তার এ উচ্চারণ ও প্রকাশ অত্যন্ত শিল্প সম্মত।

উদ্ধৃতি ঃ

১. রহস্যের আবডালে থাকে জোছনার রূপা ঝিলমিল
দেহ নেই, প্রেম আছে, 'কবিতা' আত্মার মত অদৃশ্যের চিল। (অদৃশ্যের চিল)

২. আরব যুবক চলে, মধ্যাহ্নের আলো তার মুখ অবয়বে
হিলফুল ফুজুলের সুবাসিত রূপকার হীরকের দ্যুতি ঝলমল
জোছনার ফলা যেন, দু'চোখ জুড়ানো ফুল বেহেশতের পবিত্র উজ্জ্বল
ভোরের উদয় যেন মুখরিত চারিদিক জাগে কলরবে। (জোছনার ফলা)

৩. কি সৌভাগ্যবান সেই নারী!
যিনি উদয়ের আগেই চিনে নিলেন মহিমান্বিত নক্ষত্র
ফোটার আগেই বেছে নিলেন বিশ্বজয়ী আশ্চর্য এক ফুল
কি তার অভ্রভেদী চোখ!
আস্তরণের আড়ালে লুকানো
মৃগনাভী হীরক গুছিয়ে নিলেন পরম নিশ্চিন্তে। (অভ্রভেদী চোখ)

৪. এখানে জমানো অঢেল হীরক খনি
ক্বদর রাতের সফলতা বরকত
অনুসন্ধানে গভীর অভিপ্রায়ে
নূরের কুসুম আরশের নেয়ামত। (সিয়ামে শুদ্ধ কর)

৫. নিজেকে গুছিয়ে নাও; সাধনায় কর আত্মদান
নাজাতের পুষ্পমালা বেহেশত তোমার সম্মান। (হেজাযের পথে)

৬. সেই রাত সিজদার স্মরণের বিনীত সময়
সে রাতে আঁধার নেই, আলো আর আলোর বিজয়। (বিনীত সময়)

৭. সাদা সওয়ার সিপাহীরা কবে
লাফিয়ে পড়বে আকাশ ভেঙ্গে, হযরত?
হায় রাসূল! আপনার কালেমা পাঠক উম্মতেরা
আজ মর্মান্তিক মৃত্যুর ভেতর ছটফট করছে। (গ্লানির উপত্যকা)

www.pathagar.com

স্রষ্টার নৈকট্য লাভের উৎকণ্ঠা

বুদ্ধিবাদী প্রতিটি সৃষ্টিই তার স্রষ্টার সন্নিধান ও নৈকট্য কামনা করে। স্রষ্টাই সমস্ত সৃষ্টির মূল। সমস্ত সৌন্দর্যের এবং পূর্ণতার মূল কেন্দ্র হচ্ছে স্রষ্টা। এই স্রষ্টার নৈকট্য কামনা তাই প্রতিটি মরমীবাদী বুদ্ধিবাদী মানুষের। কবিরা স্রষ্টার অনুকরণে কথার সৃষ্টি করেন। তারাও একপ্রকার স্রষ্টা– তবে তা স্রষ্টার প্রচ্ছায় মাত্র।

গোলাম মোহাম্মদ একজন প্রকৃত প্রেমিক কবি। তিনি স্রষ্টার বিপুল সন্নিধান চান। তিনি সেই সুদূর সৌন্দর্য্যের নৈকট্য চান।

স্রষ্টার নৈকট্য পেতে হলে তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। এ জন্য মৃত্যুর প্রতিও কবিদের কৌতুহল ও মমত্ববোধ জেগে ওঠে। গোলাম মোহাম্মদের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ এবং পরিণতি হচ্ছে 'হে সুদূর হে নৈকট্য'।

এ গ্রন্থে তার মৃত্যু চিন্তা এবং স্রষ্টা প্রেম চরম পরিণতি লাভ করেছে। পরজগতের রহস্যময় জীবন, স্রষ্টাদর্শন, নৈকট্যলাভ– এক অজানা আনন্দ, বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যময় চৈন্তিক সুখ। গোলাম মোহাম্মদের এই দর্শন প্রেম তার বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে কম বেশি অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্ধৃতি ঃ

১. ফুটলেই গোলাপ ঝরে যায় একদিন
পাপড়ি ঝরে ঝরে ফুরিয়ে যায় ফুল
একবার ছড়া দিয়ে কিভাবে ফুরিয়ে যায়
গড়ে ওঠা ধানের সবুজ
খাঁ খাঁ মাঠে তাই বেদনা ঘুরে বেড়ায়
ধূসর ডানার মৃত্যুরা কত মানুষ নিয়ে যাচ্ছে। (বিদায়/ ঘাস ফুল বেদনা)

২. আসলে মানুষ কতটা পায়
জন্ম-মৃত্যু এইসব সময়ের পাশফেরা
আতঙ্কের ছায়া চিন্তার যেমন রাতকে মিছেমিছি ভয়ের মনে হয়
সেই কবে থেকে আমরা ঝুলে আছি
জীবনের সাথে মৃত্যুর দিকে
অনন্ত অনন্ত কাল (জীবনের সাথে/ ঐ)

৩. অক্টোপাসের মত বেদনার অনেকগুলো হাত
একাই নোড়ারম্যাটা! কী বিস্ময়কর বেদনার নাম! (একাই নোডারম্যাটা/ ঐ)

৪. দিন তার রাত হলো, রাত হলো মৃত্যুর মত অন্ধকার
পাতার সবুজ আর মুছে গেল রাঙা রাঙা ফুলের বাহার। (পদ্মার ভাঙনের মত/ ঐ)

৫. হে আমার প্রেম! আশ্রয় ও অবকাশ
চোখ বুজলেই থেমে যায় আলোর প্রিজম
দিনরাত, রাতদিন সমতল অবসর যেন শিল্পখণ্ড। (হে সুদূর হে নৈকট্য)

www.pathagar.com

৬. শব্দের সৈকতে এসো
নীল চোখ মুগ্ধতায়
ডুবে যাই রহস্যের বিচিত্র ভ্রমনে। (শব্দের সৈকতে/ হে সুদূর হে নৈকট্য)
৭. মৃত্যুর সাথে কাল একজন কবির বাসায় দেখা
পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আলিঙ্গন তার
এই ভাবেই মৃত্যুরা আমাদের পিছে পিছে হাঁটছে। (মৃত্যুর সাথে/ ঐ)
৮. এখন আমি একা থাকতে পারি
একা একা বসে গুণতে পারি সময়ের সবগুলো পদশব্দ
মানুষেরা যে আসলেই এক–
একা আসে একা যায়। (একা/ ঐ)
৯. নিমগ্ন হতে দাও– জিকিরে জিকিরে
ডুবে যেতে দাও অনন্ত সুরের সাথে
আমাকে উচ্চারণ করতে দাও মাগফেরাতের
শব্দমালা। পবিত্র কালামের ভাষা
শব্দের অলঙ্কারে ধ্বনিত মাধুর্য্যে হৃদয়ের
সবটুকু নিবেদন। (হে ঘুম/ ঐ)
১০. মহাকাশ ডেকে যায় চিরচেনা অনিবার্য স্বরে
মন তবু পড়ে থাকে নদী তীরে খেড়ো ঘর বিকেলের মাঠে
চিরন্তন পথিকের থাকে নাকি আবাস নিবাস
থাকে নাকি ভালোবাসা পিছু টান মিছে বন্ধন
সারি বেঁধে ছুটে চলা সেই এক সমাবেশ দূরের সভায়
কেউ আগে কেউ পরে গন্তব্যের মিলন নগর। (দূরের সভায়? ঐ)

কবি গোলাম মোহাম্মদ একজন শুদ্ধ ও সম্পন্ন কবি। তার কাব্যগ্রন্থ অল্প সংখ্যক হলেও এর মধ্য দিয়ে তিনি তার গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন। স্রষ্টার সন্নিধানের পরম পরিণতি তিনি স্বল্প সাধনাতেই লাভ করেছেন। তার অধ্যাত্ম সুখ– তার কাব্য ধর্ম নিতান্ত চেষ্টাকৃত নয়। এক প্রকার স্বভাব নিয়তি তাকে ভাবুক ধ্যানি, মরমী কবি করেছে। তার সাধনায় জীবন চারণে তিনি যেমন সফল তেমনি তার কাব্য কর্মে। ৫/৭টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই তিনি পরিকল্পনামাফিক লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।

তার প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের রচনা রীতি, বক্তব্য ও ভাষা আলাদা ছিল। চর্বিত চর্বন নয় তার ভাষ্য কপোতেরা– এক প্রকার রহস্যময়তার চিল এক প্রকার অদৃশ্যের পাখি তার কাব্যগ্রন্থগুলোকে ঠিকই সুদূরের নৈকট্যে পৌঁছে দিয়েছে।

তার শিল্পময় কাব্যোচ্চারণ তার অধ্যাত্ম হৃদয়কে তার সম্পন্নতাকে সুনির্দিষ্ট করে–

'চলো জোছনার তসবী দানায় সিক্ত শুদ্ধ হই
চলো নীলিমার বিশাল ছোঁয়ায় সিজদায় নূয়ে রই।'

www.pathagar.com

সিরিয়াল

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

কুদ্দুস ছাত্র জীবনে ইংরেজীতে খুব কাঁচা ছিল। ইংরেজী স্যার বলেছিল, ইংরেজী শিখতে হলে ভাল করে গ্রামার পড়তে হবে। গ্রামার শিখতে হলে ভাল করে টেন্স পড়তে হবে।

ফোর থেকে এইট পর্যন্ত প্রত্যেক ক্লাসেই তাকে টেন্স পড়তে হয়েছে। পাস্ট-পারফেক্ট টেন্স-এর উদাহরণ দিতে গিয়ে সব শিক্ষক একটি বাক্য বলতেন। 'ডাক্তার আসিবার পূর্বেই রোগী মারা গেল।'

মাঝে মাঝে দুএকটা ব্যতিক্রম উদাহরণও শুনেছে। 'বৃষ্টি শুরু হওয়ার পূর্বেই তারা বাড়িতে পৌছুল। বিবাহের পূর্বেই-ছেলেটা রোজগার করতে শিখল।'

কুদ্দুস এখন রোজগার করে। যদিও খুব সামান্য। একটি বড়সড় ছাতা সে সব সময় সাথে রাখে। বাড়ি পৌছার পূর্বেই-বৃষ্টি শুরু হলে যাতে কোন অসুবিধা না হয়। কিন্তু বিয়ে করাটা এখনও হয়ে ওঠেনি।

একটি-প্রাইভেট ক্লিনিকের কনসালটেন্ট-এটেনডেন্ট আব্দুল কুদ্দুস। দৈনিক ত্রিশ-চল্লিশ-জন রোগীর সিরিয়াল মেনটেইন করতে হয় তাকে। ডাক্তার আসার অনেক আগে থেকেই রোগীরা সিরিয়াল দিয়ে অপেক্ষায় থাকে। আজ পর্যন্ত ডাক্তার আসার পূর্বে কোন রোগী মারা যায়নি এই ক্লিনিকে। তবু এখনো শিক্ষকরা ছাত্রদের টেন্স পড়ানোর সময় এই উদাহরণই দেয়।

টেন্স ভাল করে বুঝার জন্য কুদ্দুসকে ভারব্-এর তিনটি ফরমূলা পড়তে হত। পড়তে খুব ভালই লাগ্ত। ডু-ডিড-ডান, টেক-টুক-টেকেন, গিভ-গেভ-গিভেন। দ্রুত এবং জোরে পড়তে আরো ভাল লাগ্ত। বাই-বট-বট, ফাইট-ফট-ফট, ক্যাচ-কট-কট।

কর্ম জীবনে এসে এসব ভুলে গেছে কুদ্দুস। এখন সে প্রতিদিন খাতার পাতায় রোগীদের নাম লেখে। কলিং বেলের শব্দ-হলে সিরিয়াল ডাকে। একজনকে ভিতরে ঢোকায় এক জনকে ওয়েটিং এ রাখে।

ছাত্রজীবনের একটি কথাই বার বার মনে করে সে। 'বিবাহের পূর্বেই ছেলেটা রোজগার করতে শিখল।' দুই বছর ধরে সে রোজগার করছে। কিন্তু এখনো বিবাহ করা হল না। বিয়ের রীতি নীতি এখন পাল্টে গেছে। এখন আর বাবা-মা, চাচা-চাচী, মামা-মামী, খালা-খালু পাত্রী খুঁজে দেয় না। যার বউ তাকেই খুঁজে নিতে হয়।

কাজটা অনেকের জন্য সোজা, আবার অনেকের জন্য কঠিন। গৃহশিক্ষকরা ছাত্রী-থেকেই পাত্রী খুঁজে নেন। বাড়ির মালিকরা ভাড়াটিয়ার মেয়ে পছন্দ হলেই প্রস্তাব দিয়ে ফেলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গার্মেন্টিস, হাসপাতালে পুরুষ মহিলা একসাথে কাজ করতে করতে কখনো শুভ সুচনা আবার কখনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

www.pathagar.com

ক্লিনিকের মহিলা কর্মচারী আয়া-বুয়া, ক্লিনার, নার্স মেট্রন। ডাক্তাররা ডাক্তারই বিয়ে করে। কোন মহিলা ডাক্তারের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসও নেই কুদ্দুসের।

কুদ্দুসের সময় নেই নার্সদের সাথে গল্প করার এবং পরিবারের খোঁজ খবর নেয়ার। সে একজন শিশু বিশেষজ্ঞের এটেনডেন্ট। দৈনিক ত্রিশ চল্লিশ জন রোগীর তালিকা ও সিরিয়াল তাকে মেনটেইন করতে হয়।

বিচিত্র রকমের অসংখ্য রোগী আসে প্রতিদিন হাসপাতালে। রোগীর তালিকা থেকে কেউ কখনো পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে না। ডাক্তারের কাছে শিশু নিয়ে আসে মায়েরা। কারণ সন্তানের রোগ লক্ষণ, সুবিধা-অসুবিধা মায়েরাই ভাল জানে।

কুদ্দুস কারো সাথে খোশ গল্প করে না। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। আজ এক মহিলা কয়েকবার অনুরোধ করেছে, সিরিয়াল ব্রেক করে তাকে আগে সুযোগ দিতে। কুদ্দুস তার কথায় কর্ণপাত করেনি। এরকম অনুরোধ প্রতিদিনই দু একজন করে থাকে।

ডিউটি শেষ করে বাসায় ফিরছে কুদ্দুস। হাতে একমাত্র সঙ্গি ছাতাটা। বৃষ্টি আসার পূর্বেই বাড়ি পৌছার কোন তাড়া নেই তার। হঠাৎ করে ঝরঝর করে বৃষ্টি শুরু হয়। তার থেকে কয়েক হাত সামনে হাঁটছে এক মহিলা। আশেপাশে দাঁড়ানোর মত কোন জায়গা নেই।

শাড়ির আঁচল দিয়ে কোলের শিশুটির মাথা ঢাকার চেষ্টা করে মহিলা। পিছন থেকে তার মাথার উপর ছাতা ধরে কুদ্দুস। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকায় সে। লোকটাকে চিনতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে।

-সরেন এখান থেকে। আপনার কোন উপকারের দরকার নেই আমার।

-আপনার কোন উপকারের ইচ্ছাও আমার নেই। আমি উপকার করছি আপনার বাচ্চাটার। এমনিতেই অসুস্থ। বৃষ্টিতে ভিজলে মারাত্মক হয়ে যেতে পারে।

-কিছু হবে না। বৃষ্টিতে ভিজলে চর্মরোগের আরো উপকার হয়।

-ডাক্তারী ভালই জানেন দেখা যায়। তবে ক্লিনিকে গিয়েছিলেন কেন? বৃষ্টির পানিতে চুবালেই পারতেন।

-শ্যাটাপ ননসেন্স।

-ওরে বাবারে। আপনার বাবা কি আর্মীতে চাকরি করেন?

-জ্বিনা, আমার বাবা পুলিশে চাকরি করতেন।

-তাই বলেন। মেজাজ আর গলাটা পেয়েছেন পৈতৃক সূত্রে। ইচ্ছে না থাকলেও একটু উপকার আপনার করতে হচ্ছে। শাড়িটা একটু ঠিক করে নিন। বেখেয়ালে টানাটানিতে ডিসপ্লেস হয়ে আছে।

-আমি অত বেখেয়াল নই। দেখছেন না, হাত বন্ধ? বাসায় যেয়েই ঠিক করব।

-বাসায় গেলে আরো বেঠিক হলেও কেউ দেখবে না। বাচ্চাটা আমার কোলে দেন।

বলেই কুদ্দুস এক হাতে টান দিয়ে মহিলার কাছ থেকে বাচ্চাটা নিজের কোলে তুলে নেয়। শাড়ি ঠিকঠাক করে বাচ্চার দিকে হাত বাড়ায় মহিলা।

www.pathagar.com

-দেন।

-এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? বাচ্চাটাতো একটুও কাঁদছে না।

-তাতে হয়েছে কি? কাঁদছে না বলে কোলে নিয়ে আপনাকে নাচতে হবে নাকি?

-আমার বাপ-দাদার চৌদ্দ-পুরুষের কেউ কোনদিন নাচেনি। আপনি নাচেন নাকি?

-চুপ করেন। টকেটিভ ননসেন্স কোথাকার?

-সরি আপা, বেশী কথা বলা ছোট কালের বদ অভ্যাস। তবে-খারাপ কথা বলার অভ্যাস নেই। বৃষ্টি থামতে মনে হয় দেরী হবে। চলুন, আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেই। নাচতে ইচ্ছে না করলেও বাচ্চাদের আদর করতে ইচ্ছে হয়।

-বেশী আদর করলে আপনার অসুবিধা হবে। চর্মরোগ খুবই ছোঁয়াচে।

-আমার সে ভয় নেই। ডাক্তার না হলেও ডাক্তারের সাথে কাজ করি। রোগ বালাইরে ভয় পাই না।'

-সেই জন্যই বুদ্ধিশুদ্ধি কম। আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি আপনার উপর রেগে আছি?

-তা খুব বুঝতে পারছি। এরকম কিছু লোক প্রতিদিন রাগ করে। আমার কিছু করার নেই।

-আমার সিরিয়ালটা আগে দিলে কি এমন অসুবিধা হত?

-সেটা আপনি বুঝবেন না। সিরিয়াল ব্রেক করে কাউকে সুবিধা করে দিলে অন্য পেশেন্টরা রাগ করে। তাদের রাগ যুক্তিসংগত। কিন্তু আপনাদের রাগ বেআইনী। আমি আইনকে শ্রদ্ধা করি। যদিও আমার বাবা পুলিশ ছিল না।

-খোঁচা মারার বিদ্যা আমার জানা নেই। পুলিশের কথা বললেন কেন? আমার বাবা পুলিশ বলেই কি সব পুলিশই ঘুষ খায় মনে করেন?

-আপনি আবার একটু বেশী বুঝে ফেলেছেন। এতবেশী বুঝা ভাল না। আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধার কথা বলেছি। ঘুষের কথা তো বলিনি।

-হয়েছে আমাকে আর বুঝাতে হবে না। এই-যাহ্। আপনার সাথে বকবক করতে করতে বাসা পিছনে ফেলে চলে এসেছি। আপনি যাবেন কোথায়?

-কোন অসুবিধা নেই। আবার পিছনের দিকে হাঁটুন। আমার বাসাও পিছনে। গল্প করতে করতে হাঁটার মজাই আলাদা। কাহিলও লাগে না, পাও ব্যাথা করে না।

-এবার একটু চুপ করেন। নইলে হাঁটতে হাঁটতে আবার ক্লিনিকে চলে যাব।

-আমি আবার অত বেখেয়াল নই। দুই বছর ধরে একই পথে হাঁটছি। বাসা থেকে অফিস, অফিস থেকে বাসা। হজের সময় হাজীরা যেমন সাফা মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ায়। আমার বাসার সামনে গেলেই অটোমেটিক পা থেমে যাবে।

-হয়েছে, আর চাপা মারতে হবে না। তবে আগে থামেননি কেন? আপনার বাসা পার হয়েই তো এসেছি।

-তখন তো আমার বাসা টার্গেট ছিল না। আপনার বাসাতো আর আমি চিনি না। আমি অতো কৃপণ নই যে, আপনাকে বৃষ্টির ভিতর ছেড়ে দিয়ে আমি বাসায় ঢুকে যাব।

www.pathagar.com

-প্লিজ, এবার চুপ করুন। যথেষ্ট বলেছেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর ভদ্র মহিলা বললো,

-এই যে সাহেব এবার থামতে পারেন। এই বাসার দোতলায় আমারা থাকি।

-ঠিক আছে, আজকে আর চা টা খাব না। এখন আসি।

-আমি কি আপনাকে চা খেয়ে যেতে বলেছি?

-বলার সময় দেইনি, তাই বলতে পারেননি। আচ্ছা, আসি আপা। আর যেন দেখা না হয়।

-এটা কোন ধরনের ভদ্রতা? আর যেন দেখা না হয়।

-মানে, আপনার বাচ্চা সেরে উঠুক। আর যেন ডাক্তারের কাছে যেতে না হয়। আমি মানুষের কল্যান কামনা করি। আমিতো আর ডাক্তার নই, যে রোগীদের বার বার আসার জন্য পরামর্শ দেব।

-আপনার ডাক্তার বুঝি রোগীদের সব সময় ধরে রাখতে চায়?

-শুধু আমার ডাক্তার নয়। সব ডাক্তারই রোগী বিদায় করার সময় মনে মনে বলে, আবার হবে তো দেখা, এ দেখাই শেষ দেখা নয় তো।

-ঠিক আছে। আপনি ভাল থাকুন। আর দেখা না হোক। তবে আপনার একটা ভুল ভাঙিয়ে দিচ্ছি। বাচ্চাটা আমার নয়। আমার বড় বোনের। বোন-দুলাভাই দুজনই চাকরি করে। বাচ্চাটা আমি দেখাশোনা করি। আমার এখনো বিয়ে হয়নি।

-এতক্ষণে অরিন্দম কহিল বিষাদে। এমন একটা ভুল ধারণা নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছি? আচ্ছা, আসি আবার দেখা হবে।

-হোয়াট? আবার দেখা হবে মানে?

-ও, তাইতো। কেন আবার দেখা হবে? তাতো বুঝতে পারছি না। আপনি কি স্কুলে টেন্স পড়েছেন?

-কিসের মধ্যে কি জিজ্ঞেস করছেন? এমন কোন বেকুব ছাত্র আছে নাকি, যে টেন্স পড়েনি?

-আচ্ছা, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের উদাহারণ দিতে কি লিখতেন? ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল, না কি বৃষ্টি আসার পূর্বেই বাড়িতে পৌছিল?

-এ আবার কোন প্যাঁচাল শুরু করলেন। ধান ভানতে শিবের গীত। আমি লিখতাম, তারা স্টেশন পৌছার আগেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

-একই রকম অবাস্তব সব উদাহারণ।

-মানে?

-আপনি কি গাড়ি ছাড়ার পরে কখনো স্টেশনে গিয়েছেন? ডাক্তারের ক্লিনিকের কি অভাব আছে? ডাক্তার আসার আগেই কখনো রোগী মরে? এসব হলো অবাস্তব উদাহারণ। আমি হলাম বাস্তববাদী মানুষ। আমি লিখতাম, বিবাহের পূর্বেই ছেলেটা রোজগার করতে শিখ্‌ল। কিন্তু আমি দুবছর ধরে রোজগার করছি, অথচ বিয়ে করিনি।

www.pathagar.com

-কেন করেননি?

-এমন এক চাকরি করি, বউ দেখার সুযোগই পাই না।

-এটা কোন সমস্যা হল? আপনার ক্লিনিকে এত লোক চাকরি করে। কত লোক আসে যায়। কাউকে বলেছেন কখনো?

-দুনিয়াতে কাজের চেয়ে অকাজের লোক বেশী। আজ পর্যন্ত আপনার মত কেউ ভুল ভাঙেনি। মনে করেছি ডাক্তারের কাছে মায়েরাই বাচ্চা নিয়ে আসে। খালারাও যে আসে, তা জানতামই না।

-তাতে হয়েছে কি?

-মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। মাসী মানেই খালা।

-হেঁয়ালী রাখুন। কি বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন।

-কিছুদিন আগে একটা কবিতা পড়েছিলাম
একই বিল্ডিং এ দুজনের অফিস
রোজ দেখা হয় সিঁড়িতে
চোখা-চোখি আর হাসি বিনিময়ে
মজে যায় তারা পীরিতে
মনে মনে ভাবে কবে তারে আমি
বসাবো বিয়ের পিঁড়িতে
পরে জানা গেল সে বিবাহিত
ছেলে পড়ে ক্লাস থিরিতে।

-এসব কবিতা কোন পাগলে লিখে?

-আমার মতই কোন ছাগল পাগল। তা না হলে কি বাচ্চার মা মনে করে সিরিয়াল পিছনে ফেলি? ডাক্তারের কাছে শুধু মায়েরাই বাচ্চা নিয়ে আসে না। খালারাও আসে। এ ভুল এতদিন কেউ ভাঙেনি। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। মাসী মানেই খালা। অথচ আমি খালার কদর বুঝিনি।

-কি সব আবল তাবল বকতাছেন?

-নেক্সট টাইমে যখনই আসবেন, আপনার সিরিয়াল সবার আগে পাবেন।

-বাচ্চার যদি আর অসুখ না হয়?

-কারো অসুখের দরকার নাই। এটা অন্য সিরিয়াল।

www.pathagar.com

শিল্পতত্ত্ব

ইব্রাহীম মন্ডল

মানুষের ইতিহাস লেখার অনেক পূর্ব থেকেই জন্ম হয়েছে শিল্পকলার। বিশেষ করে শিল্পকলার অঙ্গ চিত্রকলার। যখন ভাষা সৃষ্টি হয়নি, মানুষ আভাস-ইঙ্গিতে কথা বলতো, তখন থেকেই মানুষ শিল্পকলার সাথে সম্পৃক্ত। পরবর্তী সময় আভাস-ইঙ্গিতকে তারা ফর্মে রূপ দেয়, অর্থাৎ চিত্রের আকৃতি করে বা এঁকে তাদের প্রয়োজন একে অন্যকে বোঝাত। পরবর্তী সময় ঐ চিত্রাকৃতিগুলো থেকেই তৈরী করা হয় বর্ণ বা অক্ষর।

তাই শিল্পকলার ইতিহাস ও ভূমিকা অত্যন্ত প্রাচীন। সভ্যতার আলো পৃথিবীতে পৌছানোর অনেক পূর্বে অর্থাৎ গুহাচিত্র থেকে শিল্পকলার ইতিহাস শুরু। প্রাচীন যুগে ছবি ছিল ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যা, অধিকার অর্জন করা। তারা ছবিতে রং এনেছে প্রয়োজনের তাগিদে, বস্তুকে চিহ্নিত করার জন্য। তারা ঘোলাটে রং ব্যবহার করেছে। প্রাচীন যুগে মানুষ জীবন-দর্শন ও সৌন্দর্যের জন্য ছবি আঁকেনি। মৃত দেহকে সংরক্ষণের জন্য তারা স্থাপত্য নির্মাণ করেছে। শিকার ধরার জন্য তীরবিদ্ধ বাইসনের ছবি এঁকেছে, বংশ বৃদ্ধির জন্য এঁকেছে গর্ভবতী ঘোড়া ও নারীর ছবি। তাদের বিশ্বাস ছিল তীরবিদ্ধ ছবি এঁকে রাখলে পশু দুর্বল হবে।

মহৎ শিল্পকলা সৃষ্টির জন্য মানুষ আঁকা শুরু করেনি। নিজেদের অবস্থানটাকে জানাতে ও জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে ধরে রাখতেই ছবি আঁকতে হয়েছিল তাদের, হরিণ শিকারকে সহজ করতে এবং বাইসন মেরে খাদ্য যোগাড়ের আনন্দকে ধরে রাখতে তারা গুহার গায়ে ছবি এঁকেছে। হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচার লড়াই-এর বীরত্ব গাথার ছবি এঁকেছে। ভয়কে জয় করতে ছবি এঁকেছে।

ছবি আঁকার ইতিহাসটি সেই থেকেই শুরু এবং শুরু থেকেই ছবি আঁকার ব্যাপারটি জীবন সম্পৃক্ত। জীবনকে কেন্দ্র করেই ছবি আঁকার ইচ্ছেটি মানুষের মনে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তবে এই আবিষ্কারটি যে নিজেদের ব্যঙ্গ করতে তা নয়, নিজস্ব অনুভূতি ও উপলব্ধিগুলোকে ছবির মাধ্যমে উপস্থিত করাই ছিল তাদের প্রধান কাজ।

আজকের শিল্পকলায় তা বস্তুনিষ্ঠই হোক আর নির্বস্তুই হোক, আদিকালের সেই বোধ থেকে মোটেই আলাদা নয়। আজ সেগুলোই শিল্প সৃষ্টির উৎস। আদিকালে সব বোধগুলো অনুভূত হয়েছিল বলেই ছবি এঁকে প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেছে মানুষ এবং তখন থেকেই আঁকার ব্যাপারটির সূচনা হয়েছে, আর সেদিন সূচনা হয়েছিল বলেই যুগে যুগে তার চর্চা হয়ে আজকের হাজার রকম ঢংয়ের আবিষ্কারের পথ খুলে গেছে। অতএব বলা যায় গুহাচিত্র থেকেই শিল্পকলার ইতিহাস শুরু।

www.pathagar.com

Old Stone Age বা পুরাতন প্রস্তর যুগ ৪০,০০০-১০,০০০ খৃষ্টপূর্ব থেকে মানুষ ক্রমোন্নত জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় থেকে মানুষ বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার প্রস্তুত করতে শিখে এবং উন্নতির সাথে সাথে শিল্প চর্চা শুরু করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের শিল্পচর্চা এবং সূচনাপর্ব সংঘটিত হয় আনুমানিক ৩০,০০০ বছর পূর্বে। এই শিল্প কলার মধ্যে গুহাচিত্রের প্রাধান্য পাওয়া যায়, যেগুলির বিষয়বস্তু নান্দনিক না হয়ে তৎকালীন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনে হয়েছে। যেমন বাইসন, বন্য হরিণ, Mammoth.ঘোড়া, ষাঁড়, পাখি, সিংহ, প্যানথার, গন্ডার প্রভৃতি। এছাড়াও মানুষের প্রতিমূর্তি পাওয়া যায়। গুহাচিত্রকর্ম ছাড়াও পাথরের ভাস্কর্য অথবা খোদিত প্রাণী মূর্তির নিদর্শনও দেখা যায়। নিছক শিল্পরস বোধে আনন্দদানের জন্য শিল্পীরা তাদের শিল্প সৃষ্টি করেনি, এর পিছনে আছে বিশেষ কোন কারণ এবং শিকারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে প্রাগৈতিহাসিক গুহাশিল্পের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। তারা বিশ্বাস করত শিকারের পশুর তীরবিদ্ধ ছবি আঁকলে পশুটি মারা যাবে অথবা তার আত্মার অধিকার পাওয়া যাবে অথবা ঐ পশুর প্রতিরোধ ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে। এই বিশ্বাস থেকে তারা শিকার করার আগে সেই প্রাণীর তীরবিদ্ধ ছবি আঁকতো। চিত্রাঙ্কনের জন্য তারা বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। লাল এবং হলুদ রঙের মাটির খন্ড দিয়ে ড্রইং করতো এবং রঙ করার সময় এই মাটিগুলো গুড়ো করে পশুর ছর্বির সাথে মেশাত। এছাড়া পশুর রক্ত, কয়লা, নীলরঙের পাথর প্রভৃতিও রঙ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। বিভিন্ন রকম নল ও পশুর লোম দিয়ে রঙ তুলি এবং পশুর চামড়া, হাড়, গাছের ছাল, পাতা, পাথর পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এছাড়াও দেয়ালকে মসৃণ করতে পাথরের খন্ড এবং খোদাই কাজ করতে পাথরকুচির সূচালো অংশ ব্যবহার করত।

শিল্প কী? এর উত্তর বিভিন্ন মনীষী ও আর্ট ক্রিয়েটিকগণ নানাভাবে দিয়েছেন। শিল্প সমালোচক দার্শনিকরা বিভিন্ন মতও প্রকাশ করেছেন। কারো কারো মতে শিল্প হচ্ছে; অপ্রকাশিত রহস্যময় জীবনের প্রকাশ। বিখ্যাত মনীষী টলস্টয় বলেন, শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত অনুভূতি, রং, রেখা, শব্দের সাহায্যে অন্যের মনে সঞ্চারিত করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। তার মতে শিল্পের উদ্দেশ্য শুধু অনুভূতির সঞ্চার।

শিল্পের উদ্ভব হয়েছে মানুষের সহজাত সৃজনশীল স্বভাব থেকেই। এর অন্যতম উদ্দেশ্য আমাদের জীবনে পূর্ণতা ও বিস্তৃতি যোগ করা। শিল্পকে বলা যেতে পারে আনন্দময় কোন আকার বা রূপ সৃষ্টির চেষ্টা। কিন্তু শিল্পের উদ্দেশ্য সব সময় শুধুমাত্র আনন্দ দেয়া নয়। পৃথিবীর সব কিছুই শিল্পের উপকরণ হতে পারে, ধ্বনি, রং, মানুষ, গাছপালা, জীব-জন্তু সব। মানুষ এই উপকরণ নিয়ে নিজের চাহিদা বা ইচ্ছামত এমন একটি রূপ তৈরী করে যা তার বোধকে তৃপ্ত করে। এ জন্য সরলভাবে শিল্পকে বলতে পারি শিল্পীর কোনো অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার এবং বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গী যা আমাদের মনেও গভীরভাবে সংক্রমিত হয় বা আমরাও কোনোভাবে সেই অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসি। অথবা বলা যায় শিল্প মানুষের কল্পনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার রূপ দান করার এক বিশেষ চেষ্টা, যা মানুষের সুকুমার বৃত্তির প্রতিফলন।

www.pathagar.com

শিল্প নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলেছে যথার্থ শিল্পের স্বরূপ উদঘাটনের লক্ষ্যে। ভালো শিল্প, মন্দ শিল্প, সার্থক শিল্প, অসার্থক শিল্পের যৌক্তিক ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে শিল্পী এবং দর্শক সমাজকে তারা প্রতিনিয়তই সচেতন করে চলেছেন। শিল্পে ফর্ম (Form), সৌন্দর্য (Beauty), অনুকরণ (Imitation), পরিপ্রেক্ষিত (Perspective), অনুপাত (Proportion), ঐকতান (Harmony), ভারসাম্য (Balance), ঐক্য (Unity) প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত এবং সার্থক শিল্পের ব্যাখ্যাদানে এগিয়ে এসেছেন প্লেটো, এরিষ্টটল, ক্রোচে, হেগেল, রঁমারঁলা, অস্কারওয়াইল্ড, অবনীন্দ্রনাথসহ বিশ্বখ্যাত অগণিত দার্শনিক এবং শিল্পতাত্ত্বিকগণ।

দার্শনিক প্লেটোর মতে, আর্ট হচ্ছে অনুভূতির প্রকাশ, অনুকরণ নয়। যে অনুকরণে শিল্পী মনের স্পর্শ নেই তা যান্ত্রিক ব্যাপার মাত্র। অনুসৃত শিল্পকে মানুষ যখন নিজের মনের মতো করে মূর্ত করে তখনি সেটা আর্ট বা চিত্রকলা হয়ে ওঠে। সক্রেটিস বলেছেন, 'আর্ট সত্য এবং বাস্তব থেকে আলাদা।' সেন্ট অগাস্টিন বলেছেন, 'আর্ট হচ্ছে আবিস্কার বা অনুকরণ নয়।' কান্ট বলেছে, 'শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সর্ববাধাহীন এবং যে কোন বিশেষ জাগতিক উদ্দেশ্য বিরহিত।' সুতরাং শিল্পতাত্ত্বিক অস্কারওয়াইল্ড এবং অন্য তাত্ত্বিকদের অভিমত অনুযায়ী সুস্পষ্ট যে, প্রকৃত শিল্পী কখনোই বাস্তবে দেখা বিষয়বস্তুর স্বরূপ বা হুবহু আঙ্গিকে ক্যানভাসে তুলি ধরেন না। যারা এ বিষয়ে ততটা সচেতন নন কিংবা আদৌ সচেতন নন তারা ততোটা সার্থক কিংবা একেবারেই সার্থক শিল্পী নন। যারা এ বিষয়টি সম্পর্কে যত বেশি সচেতন, যারা এই নিয়মনীতি মেনে যত বেশি সার্থকরূপে শিল্প নির্মাণ করেন তারা তত বড় শিল্পী, তত বেশি সার্থক শিল্পী এবং তাদের সৃষ্ট শিল্প তত বেশি সার্থক এবং যথার্থ শিল্প, প্রকৃত শিল্প।

অতএব আমরা বলতে পারি, যে দৃশ্য অদৃশ্যকে শিল্পীর চিত্তরসে রসায়িত করে বা স্থিতিশীল রূপ ও মহিমা দান করে সেটিই শিল্পকর্ম হয় এবং যিনি এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তাকেই শিল্পী বলা হয়।

লিওনার্দো তাঁর সূক্ষ্ম অনভূতি ও এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সব দিকেই এক অসীম সম্ভাবনাময় জগত দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিরাজমান ছিল সর্বত্রই এক অপূর্ব সুন্দর, সূক্ষ্মও বিচিত্র ভূবন। নজরুলের এই কথাগুলির সঙ্গে এর কিছুটা মিল রয়েছে, 'এই বৃহৎকে বুঝবার সাধনাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।' চিন্তার জগতে মগ্ন থাকার তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ তাই আপনমনে বসে আছে কুসুম বনেতে।' লিওনার্দোর চিন্তায় কিভাবে বিজ্ঞান ও অযৌক্তিকতা সহাবস্থান করে এবং পরস্পরকে অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী করে। তাই এখানে অযৌক্তিকতার উল্লেখ কিঞ্চিৎ আশ্চর্যজনক, হয়ত এই ধরনের অযৌক্তিকতার কিছু যুক্তি রয়েছে। লিওনার্দোর অবস্থানের মৌলিকত্ব, যেটাতে চিত্রাঙ্কন একটি সমগ্র অথবা সর্বগুণান্বিত শিল্পকলার স্বরূপ কল্পনা করা যায় সেটার পরিণাম হয় এক ধরনের বস্তুনিষ্ঠতা, যা সাধিত হয় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে। এটা একটি শিল্পকর্মকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় যেখানে সেটা নির্বোধ বাধা বা

www.pathagar.com

বোঝাসমূহ থেকে মুক্ত। এই অবিরাম আভ্যন্তরীণ বিতর্কের মাধ্যমে....., শিল্পী ক্রমশ তাঁর সংবেদনশীলতা ও অনুভব শক্তিকে উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে পারেন; কোন আবেগ প্রবলভাবে প্রকাশ করার জন্য নয়, যা সাধারণত স্থূলরুচিসম্পন্ন হয়, বরঞ্চ মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রাণবন্তভাবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে।

লিওনার্দো প্রবল আবেগ প্রকাশ করতে পছন্দ করতেন না; অন্যান্য শিল্পীদের মত, যাদের কর্মে রয়েছে সংযম, যেমন পুসাঁ থেকে মাটিস পর্যন্ত। এই ধরনের প্রবল আবেগকে একটি "ভাবঘনিষ্ঠ সাধারণত্ব'র পরিণাম বলে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন যে এই 'আভ্যন্তরীণ বিতর্ক'কে অভূতপূর্ব সুযোগ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ বিতর্ক ও চিন্তা অত পরিমাণ হওয়া উচিত নয় যে ছবি আঁকা সেটা থেকে বাধাগ্রস্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে লিওনার্দো বেশ কয়েকটি ছবি অসমাপ্ত রেখে যান।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে মহান ও প্রভাবশালী স্বাধীন শিল্পী হলেন পিকাসো, যিনি (জর্জ ব্রাকের সাথে) 'কিউবিজম্' সৃষ্টি করেন। তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধ (SPANISH CIVIL WAR) দ্বারা গভীরভাবে প্রভান্বিত হয়েছিলেন এবং ১৯৭৩ সনে তাঁর বিখ্যাত ছবি গুয়ের্নিকা (GUERNICA) আঁকেন যেটাকে মহান ও পীড়াদায়ক রচনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে অবশেষে ফ্যাসীবাদীরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তৎকালীন একটি প্রদর্শনীতে, যেটাতে পিকাসো উপস্থিত ছিলেন, সেখানে গুয়ের্নিকা ছবিটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ছবিতে স্পেনের গৃহযুদ্ধের নিষ্ঠুরতা প্রতিফলিত হয়েছে। যখন পিকাসো ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তখন একজন সামরিক কর্মকর্তা পিকাসোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছবিটি আপনি করেছেন?" জবাবে পিকাসো যা বলেছিলেন সেটা চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে, 'না, আপনি করেছেন।' ছবিটি **New york'**এর Museum of MODERN ART এ সংরক্ষিত রয়েছে। এই ঘটনাটি থেকে শিল্পীদের যে অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেটা প্রতীয়মান হয়।

শিল্প নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। সেই যে খ্রিষ্টপূর্ব ১০,০০০ সাল থেকে ম্যাগডেলিনিয়ন মানুষদের অঙ্কিত গুহা গাত্রের চিত্র থেকে বিতর্কের শুরু হয়েছে আজও তার শেষ হয়নি। বিতর্কের মধ্য দিয়ে শিল্পের যত মত, পথ ও ধারার আবির্ভাব ঘটেছে বিতর্ক যেন ততই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। আর এমনিভাবেই বিভিন্ন দার্শনিক ও শিল্পতত্ত্ববিদের বিভিন্ন মতবাদে পূর্ণ হয়ে গ্রন্থের পর গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করছে। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পরীতিতে শিল্পশাস্ত্রকার পণ্ডিত যশোধর আবিষ্কৃত 'ষড়ঙ্গ'-এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে এই ষড়ঙ্গকে ভারতীয় শিল্পের প্রাণ হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি বেঙ্গল স্কুলের প্রধান পুরুষ তিনি এই ষড়ঙ্গকে অগ্রাহ্য করলেন। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ, ষড়ঙ্গ-এর এই ছয়টি বিষয়কে অবলম্বন করে শিল্পচর্চার যে প্রচলন ছিল তিনি তার বিরোধিতা করেন।

www.pathagar.com

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিল্পীর জন্যে, শিল্পের জন্যে যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন, সেই স্বাধীনতার কথা পৃথিবীর সকল শিল্পবোদ্ধা পণ্ডিত এবং তাত্ত্বিকেরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রায় সকলেই শিল্পীর স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বলেছেন, শিল্পী কোন বাঁধাধরা শাস্ত্রবিধি মানবেন না কোন কিছু দেখে অনুকরণ করবেন না, শিল্পী তার নির্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন করে তাতে মনের মাধুরী মিশিয়ে নান্দনিক রসসিক্ত শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষকে চমৎকৃত করবেন। নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর শিল্প ভাণ্ডারকে করবেন পরিপূর্ণ। এই সৃষ্টিধর্মী শিল্প সম্পর্কে তাই Plato বলেছেন`The real artist does not imitate, he creates something new.' Socrates বলেছেন Art is removed from the actuality something new.' Sent. Augustine বলেছেন `Art is invention not imitation ও সুতরাং উল্লেখিত তথ্যসমূহে সুস্পষ্ট যে প্রকৃত শিল্প হবে শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি। দৃশ্যমান জগতের চেনাজানা কোন বিষয়ের হুবহু অনুকরণ নয়।

অধরার ও অদেখার পিছনে ছুটে চলেছেন শিল্পী। শিল্পীর অন্তরলোক উদ্ভাসিত হয় উৎসারিত হয় কল্পনায়। তবু সুন্দর ধরা দেয় না। আকাঙ্ক্ষিত পরম সুন্দরকে কখনই শিল্পী পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। তাই শিল্পীর শিল্পও কখনো পূর্ণতা পায় না।

তিনি বলেছেন বর্তমান প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সমস্যা সত্ত্বেও কোন শিল্পীরই নিজ দেশের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। উদাহরণ হিসেবে বলেছেন, যেমনটি হননি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ। তার মতে কামরুল হাসানের তিন কন্যা ছবিতে কিউবিজমের ভাঙচুর থাকলেও রড় এবং মেয়েদের শরীরী আদল একেবারেই বাঙালি।

শিল্পী দা-ভিঞ্চি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণ করেছেন যে, কবিতা এবং সঙ্গীতের চেয়ে চিত্রকলা অনেক বেশি উচ্চমানসম্পন্ন। তিনি বলেন, সঙ্গীতের চেয়ে চিত্রকলা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। তার মতে, একজন কবির চেয়ে একজন চিত্রশিল্পী প্রকৃতির যাবতীয় বিষয়বস্তুর ফর্মকে যথাযথভাবে চিত্রে তুলে ধরতে সক্ষম এবং এ কারণেই একজন চিত্রশিল্পীর সম্মান সবার চেয়ে উচ্চে। দা-ভিঞ্চি যে শুধু চিত্রকলা বিষয়েই দক্ষ ছিলেন তা নয়। তিনি অন্যান্য বিষয়েও ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

চিত্রকলা বিভিন্ন বিষয়কে যথাযথভাবে সূত্রবদ্ধ কিংবা প্রকাশ করতে সক্ষম, বিভিন্ন বিষয়ের গতি-প্রকৃতি, জীবজন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রক্রিয়া ও তার দ্রুত গতি প্রকাশ করে। চিত্রকলা গাণিতিক, কারণ চিত্রকলার আলোছায়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির সঠিক মাপজোক এবং অনুপাত সঠিকভাবে নির্ধারণ করে। লিওনার্দো দা-ভিঞ্চির রেখে যাওয়া ম্যানাসক্রিপ্টই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। তিনি প্রায় ৫,০০০ পৃষ্ঠার পুঁথিতে তার মতবাদ ব্যক্ত করে গেছেন। যার এক স্থানে লিখেছেন যে, সূর্য স্থির। তার গতি নেই। অর্থাৎ কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিওর বহু পূর্বেই তিনি এটা অনুমান করেছিলেন।

www.pathagar.com

চিত্রকলা হচ্ছে গবেষণামূলক বিজ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্নধর্মী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর নির্ভরশীল। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এ সকল বিষয়ে শুধু অভিমতই ব্যক্ত করেননি, তিনি নিজে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শিল্পকর্ম নির্মাণ করেছেন। মানুষের দেহের গঠন, অনুপাত ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঠিক মাপজোকের প্রয়োজনে প্রায় ত্রিশটি মৃতদেহ নিজ হাতে কেটে-চিরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

শিল্প সম্পর্কে মতামতের অন্ত নেই। শিল্পী, সমালোচক, ঐতিহাসিক এবং ফিলোসফারদের মতে শিল্প হচ্ছে, অপ্রকাশিত রহস্যময় জীবনের প্রকাশ। জীবন সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা সমালোচনা, বস্তুর বাহ্যিক আনন্দ, একমাত্র বৈধ সর্বজনীন বা বিশ্বজনীন ধর্ম, নিছক খেলা, আদর্শবাদের বাহ্যিক রূপ বাধ্যবাধকতামুক্ত, অবাস্তবের আবিষ্কার (বাস্তব সুন্দর নয় এই অর্থে), নিজ অভিব্যক্তি, মানবতার প্রকাশ ইত্যাদি। শিল্পে মানবতা এবং শিল্পীমনের একান্ত অনুভূতির প্রকাশ শিল্পে সাহিত্যে আমরা নানাভাবে মূর্ত হতে দেখেছি। এক্সপ্রেশনিজম বা প্রকাশবাদ হচ্ছে সকল শিল্পের মধ্যে হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের একটি মৌলিক বিষয়। লুৎরেক, গগিন, ভ্যানগগ এঁরা ইমপ্রেশনিজম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তাঁদের হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ঘটিয়েছেন। প্রকৃতিকে ইচ্ছেমতো গড়েছেন। এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা এবং শিল্পকর্মে তা অন্তঃপ্রবিষ্ট করা। শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে মানবিক ধ্যান-ধারণা ও তার রীতি-পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে বহু পূর্ব থেকেই। মানবতাবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত শিল্পী সচেতনভাবে তার হৃদয়ের মানবিক চেতনার বিভিন্ন দিকগুলো কাজে প্রক্ষিপ্ত করে থাকেন।

গ্রীক দার্শনিক এবং গণিতবেত্তা পিথাগোরাসের মতবাদ অনুযায়ী সঙ্গীত মানুষের অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং মানসিক প্রশান্তি আনয়ন করে। চরিত্র সংশোধনেও মানব হৃদয়ে সুন্দর প্রভাব ফেলতে সাহায্য করে। পিথাগোরাসের পর দার্শনিক প্লেটো এই তত্ত্বের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন, যা পরবর্তী পর্যায়ে ঈষৎ পরিবর্তনের মাধ্যমে দার্শনিক এ্যারিস্টটল গ্রহণ করেন। এরও পরে দার্শনিক স্টইক এ তত্ত্বের অনুসারী হন। তিনি অবশ্য কবিতার প্রতিও আগ্রহী ছিলেন এবং সৌন্দর্য বিষয়ক তত্ত্বের প্রতিও ছিলেন সমভাবে শ্রদ্ধাশীল। সর্বোচ্চ সত্যের বাহন হিসেবে, অপ্রস্তুত প্রশংসার দ্বারা মানব জীবনকে অলংকৃত করবার বাসনায় তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কবিতা শিক্ষাদানের প্রতি জোর দিয়েছিলেন অথচ দার্শনিক এপিকিউরাস সঙ্গীতকে প্রশ্রয় দেননি, তিনি ছিলেন সঙ্গীত বিরোধী। তাঁর মতে, সঙ্গীত থেকে কিছু গ্রহণ করবার নেই। সঙ্গীত যে সুখানুভূতি এবং প্রশান্তি দানে সক্ষম তিনি তা বিশ্বাস করতেন না।

ডোনাটেলো, মাইকেল এঞ্জেলো এবং ভ্যানগগ-এঁরা সকলেই মানবতাবাদী শিল্পী। ভ্যানগগ বলতেন, 'আমি আঁকতে চাই মানবতা, মানবতা আবার মানবতা।' ১৯৪২-৪৩-এ সমগ্র বাংলা জুড়ে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তা ছিল মানুষেরই সৃষ্টি। এই দুর্ভিক্ষের কারণে মানবতার যে চরম অবমাননা জয়নুল লক্ষ্য করেছিলেন তার প্রতিবাদ করেছিলেন তাঁর

www.pathagar.com

বলিষ্ঠ তুলি ও কালির মাধ্যমে। আমাদের সমাজের দুঃখ এবং ক্ষতচিহ্ন অবলোকন করে জয়নুল সে সমস্ত দুঃখ-বেদনা এবং প্রবঞ্চনার দহন থেকে মানবসত্তাকে মানুষের মর্যাদা ও মূল্যবোধকে বাঁচাতে সদা তৎপর ছিলেন। তাঁর আজীবন প্রচেষ্টাই ছিল—দেশ, সমাজ ও মানুষের কল্যাণ। তিনি এ দেশের মানুষকে, দেশকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে দেশের ছোট-বড় সকলে দেশকে, দেশের মানুষকে আপন করে নেয়ার গোপন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

শিল্পশাস্ত্রে অনুকরণ বা ইমিটেশন বলে একটি কথা আছে। ইংরেজি ইমিটেশনের আভিধানিক অর্থ হলো অনুকৃতি, অনুক্রিয়া, অনুবর্তন, অনুকরণ, নকল, মেকি, কৃত্রিম প্রভৃতি। অর্থাৎ কোন মূল বিষয়বস্তু নয়। মূল বিষয়বস্তুর অনুরূপ কিংবা হুবহু রূপ। যেমন কিছু অলঙ্কার পাওয়া যায় যার বাহ্যরূপ হুবহু স্বর্ণের মতো, অথচ স্বর্ণের নয়। হুবহু রূপোর মতো, অথচ রূপোর নয়। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও একই কথা। কোন কোন চিত্র দেখতে হুবহু পিকাসোর চিত্রের অনুরূপ, কিন্তু পিকাসোর নয়। হুবহু কামরুল হাসানের চিত্রের মতো, অথচ কামরুল হাসানের নয়। অর্থাৎ এগুলো সবই নকল। নকল বা ইমিটেশন অলঙ্কারের যেমন কোন মূল্য নেই, মূল্য নেই তেমনি নকল শিল্পকলার। এ সকল শিল্প বিষয়ের মূল্য যে একেবারে নেই, তা অবশ্য নয়। মূল্য আছে। তবে তা সোনার কিংবা রূপোর মূল্যের সামন নয়। কিংবা মূল চিত্রের সমান নয়। এর মূল্য নগণ্য। এ মূল্যের পার্থক্য মূল চিত্র এবং চিত্রের ছাপানো পোস্টারের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্য। সুতরাং ইমিটেশনের মূল্য যে অতি নগণ্য সেটা স্পষ্ট।

একজন লেখক কিংবা সমালোচককে, সব বিষয়ে একজন শিল্পীর সমানধর্মী হতে হয়। অর্থাৎ শিল্পনৈপুণ্য ও শিল্পকুশলতা এবং শিল্প বিষয় ও পদ্ধতি সম্পর্কে একজন শিল্পীকে তত্ত্বীয় বিয়য়ে যেমন অভিজ্ঞ হতে হয় তেমনি অভিজ্ঞ হতে হয় একজন লেখক কিংবা সমালোচককেও। অন্যথায় বিভ্রান্তি অনিবার্য। একজন লেখক সহজেই পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারেন তার ভুল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে। বিভ্রান্ত যে শুধু পাঠকদেরই করেন তা নয় সাথে সাথে লেখক নিজের অজ্ঞতাকেও প্রকাশ করেন। একই সাথে সার্থক শিল্পী, শিল্প এবং শিল্পরসিক দর্শকদের মাঝে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেন। যা শিল্পীর জন্যে শিল্পের জন্যে এবং দেশের জন্যে ক্ষতিকর। লেখক ভুলে যান যে, বাস্তব ঘটনাপ্রবাহকে চিত্রে স্থান দেয়া শিল্পীর কাজ নয়। শিল্পীর কাজ তথা দায়িত্ব প্রকৃত বিষয়ের সারবস্তুর গূঢ়সত্তা আবিষ্কার করা এবং তার বিশেষ গুণগুলো ফুটিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব অর্থপূর্ণ ফর্ম বা সিগনিফিকেন্ট ফর্ম সৃষ্টি করা। বাস্তবে ঘটে যাওয়া বিষয়ের অনুকরণে রচিত শিল্পকর্ম আর সেই ঘটনার ফটোগ্রাফিতে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না। এই সহজ কথাটি শিল্পী যেমন ভুলে যান, তেমনি ভুলে যান লেখকও। ফলে শিল্প এবং সমালোচনা উভয়ই নিম্নমানসম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের প্রবক্তা শিল্পী জয়নুল আবেদীন বলেছেন, আমি ছবি আঁকি মহৎ শিল্পী হওয়ার জন্যে নয় জীবনকে সুন্দর করার জন্য, জীবনকে সুন্দর করতে

www.pathagar.com

যে শক্তি বিরোধিতা করে তাকে চিহ্নিত করার জন্য। যে শিল্প জীবনকে সুন্দর করতে দিক-নির্দেশনা দেয় তা-ই মহৎ শিল্প। যে শিল্পী তা সৃষ্টি করেন তিনিই মহৎ শিল্পী।

বস্তুত শিল্পের জন্য এ ধারণার পরিবের্ত শিল্প জীবনের জন্য এ তথ্য এখন সাধারণ ভাবেই গৃহীত। শিল্পী জয়নুল আবেদিনের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও মনে করি শিল্প সত্যের জন্য, শিল্প সুন্দরের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য।

শিল্পীরা রূপবিলাসী রূপকার এবং রূপটাই আর্ট। মানুষ স্বভাবগত ভাবেই সৃজনশীল।

চারু শিল্প ঃ অবচেতন মনের প্রকাশ, মনের আবেগ অনুভূতির রং রেখায় ও ফর্মের মাধ্যমে নান্দনিক উপস্থাপন। শিল্প হল সৃষ্টি, আবিষ্কার, অনুকরণ নয়, যা ইলুয়েশন তৈরি করে ভাবায়, তাড়িত করে। শিল্পীর নিজস্ব ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি চেতনার প্রতিফলন একান্তই অনিবার্য।

কারুশিল্প ঃ সুচিন্তিত মনের প্রকাশ। অবস্থা চিন্তা করে সুক্ষ্মতর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নকশা করা কোন জিনিসের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে ডিজাইন করা। পবিত্র কুরআনের পৃষ্ঠা, মৃৎ পাত্র, মসজিদের মেহরাব, মিম্বার, খাট, পালঙ্কের ডিজাইন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী ডিজাইন বা নকশা।

পোস্টার ঃ ফরাসী শিল্পী জল্যাসন'র মতে রঙ্গীন ছবির সঙ্গে খুব কম রং মিশিয়ে এমন একটি জিনিস দাঁড় করানো যা খানিক দূর থেকেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং পথ চলা লোক এক ঝলক দেখে বিজ্ঞপ্তি বা ম্যাসেজটা বুঝতে পারে।

ভারতবর্ষে গোড়ার দিকে পোস্টার ব্যবহার হয়েছিল ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসেবে। অনেকের মতে পোস্টারের গোড়াপত্তন হয়েছিল প্রাচীন গ্রীস ও রোমে। এর প্রধান কাজ হল প্রচার। রাজনৈতিক বা কোন পণ্যের প্রচার, কোন মতাদর্শের প্রচারও হতে পারে। কার্যকারিতার জন্যে আজকের আধুনিক দুনিয়ায়ও পোস্টার ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। কোন দেশ বা জাতির মধ্যে বিপ্লব শুরু করতে হলে জনগণকে সচেতন করতে, উদ্বুদ্ধ করতে পোস্টার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলন, ইরানের বিপ্লব, বাংলাদেশের '৫২-র ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলনেও পোস্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনী প্রচার মাধ্যম হিসেবেও এর জুড়ি নেই।

ইলাস্ট্রেশন ঃ ইলাস্ট্রেশন নিজের কথা বলে না অন্যের কথা বলে। কোন গল্প, কবিতা, বা কাহিনী পাঠকের বোধগম্য করার জন্য যে চিত্র উপস্থাপন করা হয় তাই ইলাস্ট্রেশন। বাঁদী পরিবেষ্টিত লাবণ্যময়ী যে রমনীর চিত্র বিখ্যাত আরব্যরজনীর গ্রন্থে বহু বিচিত্র গল্প কাহিনীতে পরিবেশন করা হয়েছে এইসব চিত্র কখনো শিল্পের মর্যাদা পায় না। শিল্প কোন প্রয়োজন মেটায় না। যে শিল্প যত বেশি প্রয়োজন মেটায়, যতো বেশি অন্যের তথ্য উপস্থাপন করে সে শিল্প তত বেশি শিল্পের মর্যাদা হারায়। যেমন ইলাস্ট্রেশন, পোস্টার। এ ক্ষেত্রে Francis Bacon-এর কথা স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছেন যে 'Art is a method of opening up areas of feeling rather

www.pathagar.com

than merely an illustration of an object.' সুতরাং ইলাস্ট্রেশন প্রধান শিল্প নয়। কারণ সে নিজের কথা বলে না। বলে অন্যের কথা।

নন্দনতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা

নন্দনতত্ত্ব হচ্ছে সৌন্দর্য বিষয়ক বিশেষ জ্ঞান। নন্দন শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এর সকল অর্থই সুন্দরের সাথে সম্পর্কিত। কারণ নন্দন শব্দের অর্থ ১. সৌন্দর্য ২. দৃষ্টিনন্দন এবং ৩. আনন্দদায়ক। সুতরাং নন্দনতত্ত্ব যে সৌন্দর্য বিষয়ক তত্ত্ববিদ্যা বা অধিবিদ্যা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এই সৌন্দর্য বিষয়কে নিয়ে রয়েছে বহু বিতর্ক। যেমন বিতর্ক রয়েছে দর্শনের বিভিন্ন বিষয় নিয়েও।

নন্দনতত্ত্বের মূল বিষয় শিল্পের সৌন্দর্য এবং শিল্পের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও রয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকথা। অবনীনন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, সুন্দরের পার্থক্য শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেই ঘটে না, স্থান এবং সময়ের কারণেও পার্থক্য ঘটে থাকে। সুতরাং সুন্দর একটি অস্পষ্ট এবং অধরা বিষয়। সুন্দরকে ধরা যায় না। তাহলে শিল্পীরা রং তুলির মাধ্যমে যে সুন্দরকে ধরার জন্য, যে সুন্দরকে সৌন্দর্য পিপাসু বোদ্ধা দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করবার জন্য দিনরাত কাজ করে চলেছেন, সেই সুন্দরের সংজ্ঞা কি? সুন্দর প্রকৃতপক্ষে অনুভূতির বিষয়।

শিল্পরসে আপ্লুত হয়ে নন্দিত হওয়া অর্থাৎ আনন্দিত হয়ে তারই যথাযথ ব্যাখ্যা দেয়াই হচ্ছে নন্দনতত্ত্বের মুল বিষয়বস্তু। মনের মধ্যে শিল্পক্ষুধা জাগ্রত হলেই শিল্পরস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে আর ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলেই মহৎ কিছু সৃষ্টি হয়। এই মহৎ সৃষ্টির সময় শিল্পীর মনের অবস্থা তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, শিল্পে আনন্দের অভিব্যক্তি ও দর্শক পাঠকের মনে তার বিস্তার, সেই সৃষ্টি সৌন্দর্যের অন্তরের সৌন্দর্য দর্শনের সমন্বয় ঘটিয়ে তবেই নন্দনতাত্ত্বিক নির্ণয়।

ছবি দেখে ভালো লাগা, গান শুনে মুগ্ধ হওয়া, স্থাপত্যকর্মে কীর্তিমান হওয়া, গল্প লেখা, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত দৃষ্টির সঙ্গে বিচারকের মতো সতর্ক থেকে নন্দনতাত্ত্বিক সূত্রগুলির উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করে, আলোচনা, পর্যালোচনা করে সমালোচনার কষ্টি পাথরে যাচাই করাই নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। সৌন্দর্যের সত্য, স্বরূপ ও প্রকৃতির ইঙ্গিতবহ আবেদনময় এই শব্দটি 'নন্দনতত্ত্ব' বাংলা সাহিত্যে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকৃপণ দান। প্লেটো গণিতের মধ্যে এই সুন্দরকে দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'এ হল জ্যামিতির বিশুদ্ধ কাঠামো।' উইলিয়াম হগার্থ তার Analysis of beauty গ্রন্থে বলেছেন, 'জীবনের ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্যকে সীমিত করা যায় না।' হিবন কেলম্যান The History of Ancient Art গ্রন্থে বলেছেন, 'ভাবের প্রকাশই সুন্দর'। অবনীন্দ্রনাথের মতে সুন্দরের কোন সংজ্ঞা থাকতে পারে না।

শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের সামগ্রিকতা আছে। শিল্প দর্শন ও বিশ্লেষণের দিক দিয়ে তার বিচারের পরিপ্রেক্ষিত বিশ্বজনীন। রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সৌন্দর্যের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তির রুচি। তার সৌন্দর্য চিন্তার বিষয়গুলি হচ্ছে সত্য-শিব-সুন্দর। তার মতে

www.pathagar.com

শিল্প প্রয়োজনে নিরপেক্ষ। আবার শিল্প চৈতন্যে জীবনবাদী। নজরুলের কল্যাণবোধ, সমাজবোধ, তেজদীপ্তি নতুন মাত্রা পেয়েছে। তিনি লিখেছেন সত্য সুন্দর, বেদনা সুন্দর, প্রলয় সুন্দর, শক্তি সুন্দর, ক্ষমা সুন্দর, প্রিয়ঘন সুন্দর, আনন্দঘন সুন্দর। সর্বোপরি সব শিল্পই শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যাতীত সুন্দরের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

আধুনিক শিল্পকলা

আধুনিকতার মানে অগ্রসরতা। আধুনিকতার সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। ফলে সংজ্ঞায়িত করা যায় না আধুনিক শিল্পকলাকেও। যদিও নানা মনীষী নানাভাবে আধুনিকতাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতা কি, তাহলে আমি বলব, ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদগতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ।' অর্থাৎ আধুনিকতা বলতে আমরা বুঝব এমন দৃষ্টিভঙ্গী যা ব্যক্তিগত ভাবাবেগ মুক্ত, বৈজ্ঞানিক এবং যার মধ্য দিয়ে আমরা জগৎটাকে দেখার পাশাপাশি ব্যাখ্যাও করতে পারব। আর যে শিল্পকলায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন পাওয়া যায় তাই আধুনিক শিল্পকলা।

'আধুনিকতা', শব্দটির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শিল্পকলার ক্ষেত্রেই শুধু নয় সকল ক্ষেত্রেই আধুনিক শব্দটি জড়িত। যেমন, আধুনিক পোশাক পরিচ্ছদ, আধুনিক জীবন-যাপন, আধুনিক যন্ত্রপাতি, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, আধুনিক সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি। আধুনিক শব্দটি মূলত 'গতি' শব্দটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সভ্যতার যে অগ্রগতি তার সাথে শিল্প সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে সৃষ্টিশীল উদার চিন্তাচেতনা ও মুক্তবুদ্ধিরও একটি প্রচণ্ড গতি লক্ষ্য করা যায়। চলমান সভ্যতার প্রতিটি যুগেই আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছে। প্রতিটি মুহূর্তকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই এর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যে দেশ এই সমস্ত বিষয়ের সাথে যত বেশি সম্পৃক্ত হতে পেরেছে, সে দেশ তত বেশি সভ্য এবং আধুনিক হতে পেরেছ। সুতরাং আধুনিক শব্দটি বর্তমান সময়েরই শুধু নয়, এটি পূর্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। মুক্তমন, উদারনীতি, স্বাধীন শিক্ষা এবং শিল্প, সংস্কৃতির গতি ও প্রগতির সাথে যারা যত বেশি একাত্ম হতে পারে তাদের তত বেশি আধুনিক মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যারা তা পারে না তারা ব্যাকডেটেড বা প্রাচীনপন্থীরূপে পরিচিতি লাভ করে। এ বিষয় থেকে সুস্পষ্ট যে, বিমূর্ত শিল্পীরাই শুধু আধুনিক নয় মূর্ত শিল্পকলার শিল্পীরাও একই সঙ্গে আধুনিক। আধুনিক শিল্পকলার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল বা প্রাচীনপন্থীদের কাছে গ্রহণীয় হয় না অর্থাৎ মূর্ত বিমূর্ত যাই হোক না কেন তারা গ্রহণ করতে পারে না। আজ থেকে পাঁচশত বছর পূর্বে হলেও বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এত বেশি আধুনিক ছিলেন যে, তার উন্নত চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা স্বয়ং রাষ্ট্রনায়ক লরেঞ্জোও গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রায়

www.pathagar.com

একশ চৌদ্দ পনের বছর পূর্বে বিশ্ববিখ্যাত আর এক শিল্পী ভ্যানগণও এত বেশি আধুনিক ছিলেন যে, তখনকার মানুষ তার শিল্পকর্মকে গ্রহণ করতে পারেনি। তাই বলে তাদের চিন্তা চেতনা, পরিকল্পনা, শিল্পকর্ম অর্থহীন হয়ে যায়নি। বরং বিশ্বশিল্পের ইতিহাসে তাদের শিল্পকর্ম অতুলনীয়, অবিস্মরণীয় মহামূল্যবান সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

বিশ শতকের কয়েকটি শিল্প আন্দোলন ঃ

বিমূর্ত শিল্প (ABSTRACT ART)

চিত্রকর্মে অথবা ভাস্কর্যে যেখানে কোন বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য নয় এবং দৃশ্যত তা যখন বস্তু প্রকৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক নয় তখনই তা বিমূর্ত শিল্প হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে। আধুনিক চিত্রকর্মে ১৯১০ সাল থেকে কান্দিনস্কি এবং ১৯১৭ সালের পর থেকে পিয়েৎ মনদ্রিয়ান নিরঙ্কুশ বিমূর্ত ভঙ্গির প্রবর্তন করেন। কখনও কখনও কিউবিষ্ট পদ্ধতির কাজকেও বিমূর্ত বলে মনে হতে পারে। মিরো'র অঙ্কনেও বিমূর্ততা আছে যদিও তার চিত্রকর্ম মূলত 'ইঙ্গিতবহ' না 'সাজেসটিভ'। ক্লডিও মনে (Impressionist) প্রাকৃতিক দৃশ্যকে বিমূর্ত করার সূত্রপাত করে দৃশ্যগোচর পৃথিবীকে বিভিন্ন সমতল আকৃতিতে এবং ছায়া পরিলেখে (Silhouette) পর্যবসিত করেন। পল সেজাঁ আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে জ্যামিতিক আকৃতিকে পরস্পর সংঘবদ্ধ করে বিমূর্ততা সৃষ্টি করেন। আধুনিককালে বিমূর্ততাই শিল্পকর্মের প্রধান কৌশল হয়ে উঠেছে।

ঘনকবাদ (CUBISM)

সকল বস্তুকে জ্যামিতিক কয়েকটি আকৃতিতে পর্যবসিত করা, বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানকে একক আলগ্নতায় রূপান্তরিত করা, একটি স্বচ্ছতায় বা ট্রান্সপারেন্সিতে পশ্চাতের বস্তুকে সম্মুখের বস্তু ভেদ করে দৃশ্যমানতায় উপস্থিত করা কিউবিজম বা ঘনকবাদের মুল শিল্প প্রক্রিয়া। ১৯০৭ সালে পিকাসো এর উদ্ভাবন করেন, পরে 'প্রাক্ক' একে একটি চূড়ান্ত পরিণতি দেন। বর্তমান শতকে কিউবিজম এককভাবে পৃথিবীর শিল্প ধারাকে যেভাবে বিচলিত করেছে অন্য কোন শিল্প আন্দোলন তা পারেনি। পিকাসো একে 'কনসেপচুয়াল' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দাদাবাদ (DADAISM)

চিত্রকর্মে এবং সাহিত্যে প্রতিবাদ হিসেবে একটি প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধতায় দাদাবাদের জন্ম হয় জুরিখে ১৯১৬ সালে। দৃশ্যগত স্বাভাবিকতাকে রূপ দেবার চেষ্টা না করে এককালীনতায় সকল সময় এবং বস্তুকে উপস্থিত করার একটি প্রক্রিয়া দাদাবাদ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই মতবাদের প্রবক্তাদের বক্তব্য ছিল, শিল্প রিয়ালিস্টিক নয়, শিল্প

www.pathagar.com

হচ্ছে সত্য। তাদের বিচারে পরিচিত জীবনের অনুকৃতি হল মিথ্যাচার। আবেগের একটি বিমূর্ততা তারা স্বাক্ষরিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

অভিব্যক্তিবাদ (EXPRESIONISM)

বস্তুগত স্বরূপের উপর গুরুত্ব না দিয়ে আভ্যন্তরীণ উপলব্ধিকে রেখা ও রঙে পর্যবসিত করা অভিব্যক্তিবাদীদের লক্ষ্য। মানবমনের চরমতম অনুভূতিকে বা অবস্থানকে তারা রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এই আন্দোলনটি একটি প্রবল শিল্প আন্দোলন হিসাবে জার্মানিতে ১৯১০ সাল থেকে রূপ পেতে শুরু করে। এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য পথিকৃত হলেন 'ইমিল নলড', 'কেকোলকা' এবং 'বেকমান'।

রূপবাদ (IMPRESSIONISM)

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রথাসিদ্ধতার বাইরে উন্মুক্ত আলোয় বস্তুসত্তার একটি নতুন রূপের চিত্রাঙ্কন করলেন রেনোয়া, মনে, দেগা এবং এদের সমসাময়িক আরও কিছু ফরাসী শিল্প আপতিত সূর্যরশ্মির সতত চঞ্চলতা এবং কম্পমানতায় বস্তু স্বরূপকে রং এর বৈচিত্র এবং ঘনত্বে উদ্ভাসিত করার যে প্রয়াস ঘটেছিল তাকে আমরা রূপবাদ বা ইম্প্রেশনিজম বলে থাকি। ইম্প্রেশনিস্টদের বিষয়বস্তু ছিল ল্যান্ডস্কেপ, নদী, রাহমশাঘাট এবং আভ্যন্তরীণ দৃশ্য, যেমন ক্যাফে, থিয়েটার হল তৎকালীন সময়ের আনন্দ, উচ্ছলতা ও চঞ্চলতাকে রং এর মাধ্যমে শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন। ১৮৭৮ এর দিকে ফরাসি দেশে ইম্প্রেশনিজমের আবির্ভাব ঘটে। রং এর অনুভূতির জন্য বিশেষ ধরনের আবহাওয়া ও মেজাজ দরকার। প্রবল সূর্যালোকে আমাদের চোখ আলো ও অন্ধকারের মধ্যে গমনাগমন করে, ধূসর অথবা অন্য কোন রং-এর ইষৎ আভা চোখে পড়ে না। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সূর্যরশ্মি যেখানে ঘনীভূত তীব্র নয় বরঞ্চ লঘুভাবে পরিব্যাপ্ত সেখানে ধূসর বর্ণের বৈচিত্রগুলো সহজেই ধরা পড়ে। ফরাসী ইম্প্রেশনিস্টরা উন্মুক্ত এলাকায় আলোর অনুভূতিকে চিত্ররূপে ধরার চেষ্টা করলেন। দেখা গেল, আলোর বিচিত্র রং এর বিভাজনের কম্পমানতার কারণে বস্তুস্বরূপ নতুন নতুন গঠন নিয়ে দৃশ্যমান হচ্ছে।

পরাবাস্তববাদ (SURREALISM)

কবি এপোলিনীয়র তাঁর একটি নাটককে পরিচিত করেছিলেন সুরিয়্যালিস্ট বলে ২৪ শে জানুয়ারী ১৯১৭ সালে। ১৯১৯ সালে আঁদ্রে ব্রেত অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে পরাবাস্তববাদ বলে আখ্যায়িত করেন। সাইকোএনালিসিস বা মনঃসমীক্ষণ স্বপ্নের বিচিত্র দৃশ্যগত অথবা উপলব্ধিগত অস্থির রূপকল্পকে যে সব বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করে কাব্যসৃষ্টিতে সেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে 'ব্রেঁত' অভিমত প্রকাশ করে। প্রথমে এ আন্দোলনটি প্রধানত কাব্য কর্মে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু ক্রমান্বয়ে শিল্পীরাও এ আন্দোলন গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালের পর পরাবাস্তববাদ একটি বলিষ্ঠ প্রভাব হিসেবে স্বীকৃতি

www.pathagar.com

পায়। যেসব শিল্পী পরাবাস্তববাদী হিসেবে চিহ্নিত তারা হলেন জোয়ান মিরো, হ্যান্স আরপ, ম্যাক্স আরনষ্ট। মার্ক শাগালও পরাবাস্তববাদী কিন্তু তার রূপকল্পগুলো স্বপ্নের নীলাভ পটভূমিতে বিশ্বাসের সমীক্ষায় সমন্বিত এবং বিস্ময়ের অনিবার্যতায় প্রকাশিত। বিংশ শতকে মনঃসমীক্ষণ চেতন অবচেতনের দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কের কথা বলল। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুরিয়্যালিস্টরা এ সমস্যাকে নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন কাব্যে ও শিল্পকর্মে। শিল্পীরা অধচেতনকে মুক্ত করলেন জীবনের বিচিত্র নিবৃত্তি ও প্রতিবন্ধকতা থেকে। উল্লেখ্য, সালভাদর দালী এই ধারার চিত্র শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। চিত্রশিল্পে সালভাদর দালী এই ধারার সর্বোচ্চ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

ম্যানারিজম (MANNERISM)

রেনেসাঁ উত্তরকালে ইউরোপে এক নতুন শিল্পরীতির উদ্ভব হয় যা ম্যানারিজম নামে পরিচিত। ১৫২০ সালে শিল্পী রাফায়েলের মৃত্যু হয়। এই সময় থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ছিল ম্যানারিজমের সময়কাল। ম্যানারিজমের শাব্দিক অর্থ হল একটি বিশেষ রীতির প্রতি আসক্তি, বিশেষ করে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এই শিল্পধারার বিকাশ ঘটে মূলত ইতালিতে। Maniera শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। ভাসারি শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। জ্যাকোপো পনতরমো, কারেজ্জিও, ব্রুনজিনো– এই শিল্পীরা এ ধারায় কাজ করেছেন।

শিল্প সংক্রান্ত এই আলোচনায় প্রমাণ হয়েছে শিল্প নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই, তবে যে কোন বিতর্ক আলোচনা তথ্য ও বাস্তবসম্মত যুক্তি নির্ভর। শিল্পী দা ভিঞ্চির মতে, 'শিল্প হচ্ছে দর্শনশাস্ত্র বা তত্ত্ববিদ্যার শাখা। যেহেতু দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান ও প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র সেহেতু শিল্প বিষয়ক বিতর্ক দর্শনমিশ্রিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বস্তুত সৃষ্টিধর্মী ও সৃজনশীল গুণাবলী মানুষের জন্য আল্লাহর দেয়া বিরাট নিয়ামত, 'মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর ছায়া বিশেষ সৃষ্টিধর্মী কার্যাবলীর চিরস্থায়ীত্বের ধারক। মানুষ স্বভাবগত সৃজনশীল সহমর্মিতার প্রবল ভাবধারার অধিকারী একটা সুস্পষ্ট ধারণা ও কল্পনার মালিক। বিপন্ন মানবতাকে উদ্ধার এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতার ব্যবস্থা করা, মানুষকে কল্যাণময় জ্ঞানের আলো দ্বারা সমুদ্ভাসিত করাই তার নিরন্তর চেষ্টা ও সাধনা। মানব প্রকৃতিতে নিহিত সৃষ্টিধর্মী গুণাবলী হারিয়ে ফেললে স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসার ধারক হয়ে যায়, ফলে কল্যাণের অকল্যাণের ধারক হয়ে বসে।

শিল্প একটা আত্মিক সত্য, আত্মার সাথে তার নিবিড় গভীর সম্পর্ক। তা ধর্ম বিশ্বাসকে মনে সিক্ত করে বিশ্ব মানবতাকে সেই সব যান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে যা আমাদের বর্তমান জীবনকে দুঃখজনকভাবে বেঁধে রেখেছে। শিল্প মানবআত্মার মুক্তির নিয়ামক হতে পারে যদি তাকে ধর্ম নির্ধারিত জীবনের লক্ষ্যের অনুকূলে প্রয়োগ করা যায়। তাহলেই এই শিল্প মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে।

www.pathagar.com

সেকুলারিজম

ফাহমিদ-উর-রহমান

সেকুলারিজম কথাটা বেশ কুয়াশাচ্ছন্ন। পশ্চিমের পণ্ডিতেরা আমাদের যেভাবে সেকুলারিজম বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন ঠিক সে অর্থে একটা রাষ্ট্রের বা সমাজের কতটুকু সেকুলার হয়ে ওঠা সম্ভব তা বিচার্য। এমন কি খোদ ইউরোপ যেখানে নাকি সেকুলারিজম তত্ত্বের অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘটেছে, সেখানকার রাষ্ট্র ও সমাজও কি পুরোপুরি সেকুলার হয়ে উঠতে পেরেছে? মধ্যযুগে দীর্ঘ লড়াই আর মারামারির পর ইউরোপের চার্চ আর রাষ্ট্র পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর আগে কখনো কল্পনাই করা যেত না ধর্ম আর রাষ্ট্র দুটো বিভিন্ন সত্তা। এখন আধুনিক রাষ্ট্র মানে সেকুলার রাষ্ট্র। অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিক যে ধর্মে রুচি সে ধর্মে বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে খ্রীস্টান, কে নাস্তিক সেটা বিবেচনার বিষয় নয়। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে নাগরিকের ইহলৌকিক ও বস্তুগত কল্যাণ। তার ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। সেই থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের এই বিয়োগ পশ্চিমের অনেক দেশের বৈশিষ্ট হয়ে ওঠে। অন্তত খাতা কলমে। শাসনতান্ত্রিকভাবে।

পশ্চিমের দেশগুলো সেকুলার রাষ্ট্র নিয়ে যতই হাঁকডাক করুক সেখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় ব্যাপার থেকে ধর্মীয় অনুষঙ্গ এমনকি সাম্প্রদায়িকতাকে বিদায় দিতে হবে এটা অনেকেই মানেন না। তার মানে সেখানকার রাষ্ট্র সেকুলার হলেও, সমাজ সেকুলার নয়, নেতৃত্ব সেকুলার নয়। তাহলে সেই প্রশ্ন অবধারিতভাবে আসে সমাজ আর নেতৃত্ব সেকুলার না হলে রাষ্ট্র সেকুলার হবে কি করে? শুধু নামকরণ করলেই সেকুলার রাষ্ট্র হয়ে যায় না। অনেকেরই নজরে এসেছে সম্প্রতি সেকুলারিজমের কথা বলে ফ্রান্সের পার্লামেন্ট সেদেশের রাষ্ট্র প্রধানের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় মুসলিম মেয়েদের স্কুলে হিজাব পরার বিরুদ্ধে এক আইন পাশ করেছে। কে কোন পোষাক পরবে, ধর্মীয় না অধর্মীয় তাতে সেকুলার রাষ্ট্রের বলার কি আছে? সেকুলার রাষ্ট্র তো ব্যক্তির ধর্মীয় স্বাধীনতায় নাক গলাবে না। সেকুলার রাষ্ট্রের মাথাব্যাথা তখনই শুরু হবে, রাষ্ট্র ব্যাপারে ধর্ম যদি অনুপ্রবেশ করে। এ ধরনের জবরদস্তিমূলক আইন পারস্পরিক সহাবস্থান ও বিশ্বাসের ভিতে চিড় ধরিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। এর পিছনে আছে খ্রীষ্টান ইউরোপের নীরব মুসলিম বিদ্বেষ। খ্রীষ্টান-মুসলমান যদি একসঙ্গে না থাকতে পারে তাহলে তো সেকুলার রাষ্ট্রে অরুচি ধরে যাবে। রাষ্ট্রের সরকার যদি সাম্প্রদায়িকতাকে রাজধর্ম করেন তাতে আপাত সুবিধা হলেও সেকুলারিজমের শিকড় ক্ষয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

www.pathagar.com

ফ্রান্সের মানুষ ক্যাথলিক ধর্মের অনুসারী, সেখানকার সমাজেও ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব খুব শক্তিশালী। ফ্রান্সের স্কুলগুলোর একটা বিরাট অংশ নিয়ন্ত্রণ করে সেখানকার ক্যাথলিক চার্চ। রাষ্ট্র শুধুমাত্র অনুদান দেয়। ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা এতদূর বিস্তৃত যে তাদের পরামর্শ ছাড়া সরকার এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কারিকুলাম প্রস্তুত করতে পারে না। হিজাব যদি রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য হুমকি হয়ে ওঠে তবে ক্যাথলিক চার্চের এই ভূমিকা কি সেকুলারিজমের জন্য অনুকূল? মুসলিম দেশগুলোতে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে আজকাল পশ্চিমের মাথাব্যাথার অন্ত নেই। এটা নাকি মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা তৈরী করার কারখানা। কিন্তু ফ্রান্সের ক্যাথলিক, ক্যাথলিক পরিচালিত স্কুলগুলো সম্বন্ধে সে দেশের সরকারও নীরব, পশ্চিমের নীতি নির্ধারকদের উদ্বেগের কথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। সেকুলারিজম চর্চায় এ দুরকম নীতি আমাদের অনেক সময় সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়।

ইউরোপে এনলাইটেনমেন্টের যুগ আসার পর রাজধর্ম করার ধারণা বিলকুল উঠে যায়। আবার এই এনলাইটেনমেন্টের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে ফ্রান্সে। ফরাসী বিপ্লবের পর বিপ্লবীরা রাজার ও চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। একদলতো সৃষ্টিকর্তাকেও অস্বীকার করে বসে। আমেরিকায়, বৃটেনে, ইউরোপের অনেক দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও নাস্তিকতাকে সহ্য করা হয় না। ফরাসীরা করে। সেই ফ্রান্স, যার বিপ্লবের মূল কথা ছিল সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা, এখন কি এই ধারণা থেকে পিছিয়ে আসতে শুরু করেছে। যে রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে না, ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে না সে রাষ্ট্রকে কি সেকুলার বলা যাবে? আগেই বলেছি নামে সেকুলার রাষ্ট্র হলে চলবে না, কাজেও সেকুলারিজম প্রমাণ করতে হবে।

ফ্রান্স যখন ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল তখন কলোনীগুলোতে কি সেকুলারিজমের চর্চা করতো, না সেখানে তারা এক জুলুমতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছিল? ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে ফ্রান্সের ইতিহাস মোটেই গৌরবের নয়।

ফ্রান্সে যেমন, আমেরিকা, বৃটেনেও তেমনি। এই নীরব সাম্প্রদায়িকতা যেন কারোরই চোখে পড়ে না। ১১ সেপ্টেম্বরের পরে খোদ আমেরিকাতে বেশুমার মুসলমানের উপর চোরাগুপ্তা হামলা হয়েছে, তাদের উপর গোয়েন্দাদের নজরদারি বেড়েছে, তাদের মসজিদ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়েছে। একবারতো এক নিরীহ শিখকে মুসলমান ভেবে খুনই করে ফেলা হলো। এটাও কি সেকুলারিজম?

এসব কথা কিন্তু খুব বেশি মিডিয়ায় আসেনি। কারণ শক্তিধরের মিডিয়া প্রভুর দুর্নাম করে না।

১১ সেপ্টেম্বরের পর প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছেন আমরা এবং ওরা। কেন এই বিভাজন। আমেরিকার সংবিধান তো রাষ্ট্রের কোন ধর্মের উল্লেখ করেনি। তাহলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কেন এই বিভক্তি, চিড় ধরানোর আয়োজন। সেকুলারিজমতো সব ধর্ম, সব

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহাবস্থানের কথা বলে। প্রেসিডেন্ট বুশ ক্রুসেডের কথা বলেছেন। ক্রুসেডের অর্থ কি তা যে কোন দুগ্ধপোষ্য শিশুও জানে। তাহলে জেনে শুনে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেন এই ধর্মযুদ্ধের ডাক দিলেন? এই ক্রুসেডের কথা বলে আসলে তিনি একালের পাশ্চাত্যকে সেই মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন যার বিরুদ্ধে একদিন নাকি পশ্চিমের মানুষ লড়াই করেছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমারা যতই বলুক ধর্ম ও রাষ্ট্র দুটি ভিন্ন সত্তা, কিন্তু কাজে কর্মে তার ঠিক প্রতিফলন নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরাতো প্রতিবার নির্বাচিত হবার পর-গির্জায় গিয়ে বাইবেলের উপর হাত রেখে শপথ করেন; প্রতিজ্ঞা করেন এই বলে ন্যায় নীতি ও শাসনতন্ত্র অনুসারে আগামী চার বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। প্রেসিডেন্ট পদতো রাষ্ট্রের পদ, শাসনতন্ত্রের পদ, কোন ধর্মীয় পদ নয়। তাহলে এখানে বাইবেল টেনে আনা কেন? অনেকে বলেন এটা আমেরিকার ঐতিহ্য। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস টেনে ফেলা যায় না। এখন আমেরিকার নীতি অনুসরণ করে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মসজিদে যেয়ে কোরআন হাতে নিয়ে শপথ পড়লে কি ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা পাবে? আমেরিকা যে কাজ করলে ধর্মনিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয় না, একই কাজ করলে মুসলিম দেশের জাত চলে যায়!

বাগদাদের আবু গারিব কারাগারে বন্দী ইরাকীদের উপর মার্কিন বাহিনীর অমানুষিক নির্যাতনের কাহিনী এখন অনেকেরই জানা। যে কোন হানাদার বাহিনী আক্রান্ত দেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এটাও পুরোন কথা। আমেরিকা এর আগে একই কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভিয়েতনামে, পানামায়, ইন্দোনেশিয়ায়। আমার এটিও বলার উদ্দেশ্য নয়। আমি যেটা বলতে চাই তা হলো শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি যে প্রক্রিয়ায় আবু গারিব কারাগারের বন্দীদের উপর মার্কিন বাহিনী নির্যাতনের অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ করেছে তার সাম্প্রদায়িক রূপটি নিয়ে। মুসলিম বন্দীদের এই সব খ্রীষ্টান সৈন্যরা নির্যাতনের মুখে নির্দেশ দিয়েছে আল্লাহকে অভিশাপ দিতে, কোরআন ছুড়ে দিয়ে বলেছে সেটিকে পদলিত করতে এবং যীশুকে ধন্যবাদ দিতে। ইরাক যুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট বুশ স্বীকার করেছেন তিনি প্রার্থনা করে বাইবেল পড়ে যুদ্ধের অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। এরপরেও কি বলা সম্ভব আমেরিকায় কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই? বর্ণবাদ নেই, ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের লেশমাত্র নেই? আমেরিকার কালো মানুষদের উপর সেখানকার শ্বেতাঙ্গদের জুলুম-অবিচারের কাহিনীতো আজ অতীত হয়ে গেছে। সে কথা কেউ মনেও করে না। গত শতকের ষাটের দশকে কালো মানুষদের নেতা ম্যালকম এক্স এই শ্বেতাঙ্গদের জুলুমের প্রতিবাদ করতে যেয়ে সিআই এর নাশকতামূলক হত্যার শিকার হয়েছিলেন। সে কথা অনেকেই জানেন।

আমেরিকার মতো বৃটেনও ধর্মের ব্যাপারে যে খুব উদার তা বলা যাবে না। ওখানকার নিয়ম হচ্ছে ইংল্যান্ডের রানী বা রাজা যেই হবেন তিনি একই সাথে এ্যাংলিকান চার্চের প্রধান ব্যক্তি হিসেবেও বরিত হবেন। অর্থাৎ তাকে হতে হবে প্রোটেসট্যান্ট

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ভূক্ত। চার্চের এ দায়িত্ব থেকে কোন রাজা বা রানীর অব্যাহতি নেই। সেকুলার রাষ্ট্রে অন্য ধর্ম দূরে থাক, খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যেও বহু শাখা-প্রশাখা আছে, এসব কোন কিছুই চলবে না। প্রোটেসট্যান্ট ছাড়া অন্য কোন শাখার কেউ এ পদ পাবে না। ইংল্যান্ডে এ এক অসম্ভব কল্পনা। ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী প্রোটেসট্যান্ট ধর্ম ত্যাগ করে যদি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নেয় তবে সেখানকার জনগণও তা মেনে নেবে এই ভরসাও কম। এ যেন অনেকটা হিন্দু ধর্মের ব্রাহ্মণদের মতো। ব্রাহ্মণ ছাড়া কোন পূজা চলবে না। ধর্ম ও রাষ্ট্র তাহলে পৃথক থাকলো কৈ?

শুধু তাই নয়, অনেকটা আমেরিকার মতোই ইংল্যান্ডেও যখন কোন রাজা-রানীর অভিষেক হয় তখন সেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আর্চবিশপ অফ ক্যান্টারবেরী। এই আর্চবিশপ রাজা বা রানীর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলেই তিনি আইনত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন বলে ঘোষণা করা হয়। ইংল্যান্ডের পাশে আয়ারল্যান্ডে বহুদিন যাবৎ গৃহযুদ্ধ চলছে। এ লড়াই আসলে ক্যাথলিক ও প্রোটেসট্যান্টদের লড়াই। পশ্চিমীরা এটা দেখেও না দেখার ভান করে। তাদের ভাবটা এমন এটি হচ্ছে দুটো সম্প্রদায়ের লড়াই। যাদের একদল শোষিত, অন্যদল শোষক। এই শোষণও কিন্তু চলছে ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে, আর্থ সামাজিক শ্রেণীর উপরে নির্ভর করে নয়।

আশির দশকে পোল্যান্ডের ট্রেড ইউনিয়নিস্টরা সেখানকার সমাজতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু করে এবং সরকার পরিবর্তনের জন্য চাপ দেয়। বলা চলে এ আন্দোলনের ফলে সমাজতন্ত্রী সরকারের পতনও ঘটে। এ আন্দোলনের একটা লক্ষণীয় দিক হলো ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের সাথে পোল্যান্ডের ক্যাথলিক চার্চ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে এবং সরকার পতনে বড় ভূমিকা রাখে। পশ্চিমের কেউ প্রতিবাদ দূরে থাক তখন ক্যাথলিক চার্চের এমনি খোলাখুলি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় কেউ টু শব্দটি করেনি। পশ্চিমী মিডিয়াতো দুবাহু তুলে এসব কিছুকে অভিনন্দিত করেছে।

পোল্যান্ডের রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রেবেশে কারো আপত্তি না থাকলেও মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামপন্থী রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণে কিন্তু পশ্চিমের বিস্ময় ও কৌতুকের শেষ নেই। পশ্চিমের মদদে ফিলিস্তিনীদের ভিটেমাটি উচ্ছেদ করে যে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেটি কি কোন সেকুলার রাষ্ট্র? ঈশ্বরের পছন্দনীয় জনগণের জন্য পবিত্র গ্রন্থে প্রতিশ্রুত ভূমি হচ্ছে যে রাষ্ট্রটির নৈতিক ভিত্তি সেটির প্রতিষ্ঠায় তাহলে পশ্চিমের সেকুলার রাষ্ট্রগুলো কেন উঠে পড়ে লাগলো? রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে ধর্মীয় অনুজ্ঞার এই মিশেলে কিন্তু আজতক ইউরোপ আমেরিকার কোন চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতা আপত্তি করেননি। এমনকি সমাজতন্ত্রী রাশিয়াও তার জীবদ্দশায় এসব কথা আপত্তিকর হিসেবে বিবেচনা করেছে বলে মনে হয় না। অনেকেই জানেন না সমাজতন্ত্রী রাশিয়াই প্রথম ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়।

www.pathagar.com

সেকুলারিজমের কথাই যদি বিচার্য হয় তাহলে ইসরায়েলের চেয়ে সেদিক দিয়ে নাসেরের মিসর, সাদ্দামের ইরাক, আসাদের সিরিয়া অবশ্যই অগ্রগণ্য ছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবেই এসব দেশ সেকুলারিজমের চেতনা প্রচার-প্রসারের চেষ্টা করেছিল। সবদিক দিয়ে বিবেচনা করলে সেকুলার বলে পরিচিত পশ্চিমের উচিত ছিল এসব দেশের সাথেই হৃদ্যতা গড়ে তোলা। আদতে সেরকম কিছু আমরা দেখিনি। ইসরায়েলের সাথে পশ্চিমের এই দহরম-মহরমের মূলে আছে তাদের ঐতিহাসিক মুসলিম বিদ্বেষ। মধ্যপ্রাচ্যের বুকে ইসরায়েল রাষ্ট্রকে জিইয়ে রেখে তারা মুসলিম দুনিয়ার উপর কর্তৃত্ব ও শাসন কায়েম রাখতে চায়।

ভারতের ব্যাপরটা আরো অদ্ভুত। সেকুলারিজম জিনিসটা কখনো এ মাটিতে টেকেনি। প্রাচীন ভারতেও যা, আধুনিক ভারতেও তাই। কেউ কেউ ভারতকে একটা সেকুলার রাষ্ট্র বলতে চান। শাসনতন্ত্রেও ও জিনিসটা আছে। কিন্তু ভারতীয় সমাজ কখনোই সেকুলার হতে পারেনি। ঔপনিবেশিক আমলে ইংরেজের প্রশ্রয়ে কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয় তা মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদ। রাজনৈতিক কারণে যদিও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সেটা স্বীকার করেননি কিন্তু তাদের কার্যকলাপে তা কখনো প্রমাণও হয়নি। প্রথম দিকে কংগ্রেসের সাথে কিছু মুসলমান থাকলেও পরে তারা হিন্দু জাতীয়তাবাদের চেহারা দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন। ধর্মে ধর্মে মিল হয়নি বলে পরে ভারতই ভাগ হয়ে যায়। হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ।

বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রী অরবিন্দ, বিপিন পাল যে জাতীয়তাবাদের কথা বলেছিলেন তা একান্তই হিন্দু ধর্মাশ্রিত। হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের নীতি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কংগ্রেস নেতা গান্ধী রামরাজ্যের কথা বলেছিলেন। এর মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের একটা ইংগিত আছে। গান্ধীকে রাজনৈতিক নেতার চেয়ে ধর্মীয় নেতা হিসেবেই মানায় বেশি।

নেহরু সেকুলার স্টেটের কথা বলেছেন কিন্তু কার্যত কংগ্রেস সরকারের আদর্শের পরিবর্তন হয়নি। নেহরুর ডিসকভারী অফ ইন্ডিয়া মূলত হিন্দু কালচারের একটা ছবি ধারণ করে আছে। ওখানে কোন মুসলমানের স্থান নেই।

ভারত স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস আমলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কম হয়নি। তাতে মুসলমানও কম মরেনি। বাবরী মসজিদতো কংগ্রেস আমলেই ধ্বংস করা হয়েছে। আর বিজেপির কথা না বলাই ভালো।

মুসলিম দেশগুলোতে সেকুলারিজমের এক্সপেরিমেন্ট একটা অভূতপূর্ব ঘটনা। ঔপনিবেশিক আমলে এই তত্ত্ব মুসলিম দেশগুলোতে চাপিয়ে দেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানেরা এ তত্ত্বের উৎসাহী সমর্থক হয়ে ওঠে। কলোনির আগে মুসলিম দেশগুলোতে সেকুলারিজমের কথা কেউ শোনেনি। এখানে সেকুলারিজম অনুপ্রবেশ করানোর পিছনে পাশ্চাত্যের একটা অভিসন্ধি ছিল। সেকুলারিজমের তত্ত্ব দিয়ে তারা মুসলমানের বিশ্বাসে ক্ষয় ধরাতে চেয়েছিল। ইসলাম ধর্ম হিসেবে অন্য ধর্মের

www.pathagar.com

সঙ্গে তুলনীয় নয়। ইসলাম একই সাথে একটি রাষ্ট্র ও ধর্ম ব্যবস্থা। ইসলামী ব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের মতো এ দুটোকে কখনোই ভিন্ন সত্তা হিসেবে দেখা হয়নি। সেকুলারিজম দিয়ে ইসলামের এই আত্মাকে কলুষিত করার চেষ্টা হয়েছে বারবার। এ কারণেই মুসলিম দেশে সেকুলারিস্টরা প্রথম প্রতিপক্ষ বানিয়েছে ইসলামকে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে তুরস্কই প্রথম সেকুলারিজমের দিকে পা বাড়ায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কামাল পাশা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক খেলাফত ভেঙ্গে দেন এবং তুরস্ককে ইউরোপিয়ান মডেলে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। কামাল পাশার এই নতুন চিন্তার নাম কামালিজম। তুরস্ককে ইউরোপিয়ান আদলে গড়ে তুলতে যেয়ে তিনি ইসলামের সাথে তুর্কীদের আত্মিক ও ঐতিহ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্যোগ নেন। এই নতুন ধরনের সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে কামাল তুর্কীদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা সব কিছুতেই আঘাত করে বসেন। সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠার নামে তিনি নতুন একটি মতবাদ তুর্কীদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন। সেকুলারিজমের নামে তিনি সুফীদের উপর নির্যাতন চালান, তাদের খানকাহগুলো বন্ধ করে দেন। মসজিদের সংখ্যা কমিয়ে আনেন। আরবীর পরিবর্তে তুর্কী ভাষায় আজান প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। দাড়ী রাখা ও হিজাব পরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। মোট কথা তিনি তুরস্ক থেকে ইসলামের নাম গন্ধ ঝাড়ে বংশে নির্মূল করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে তুরস্ককে যারা বরাবর একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তাদের উপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। অসংখ্য আলেম ও ধর্মীয় নেতাদের তিনি ফাঁসীতে ঝুলান। তার অত্যাচারের হাত থেকে বদিউজ্জমান সাঈদ নূরসীর মতো সর্বজনমান্য আলেমও রেহাই পাননি। কামালের এই অত্যাচার নির্যাতনের সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার মুসলিম অঞ্চলগুলোর উপর কমিউনিস্ট শাসন ও অত্যাচারের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এসব অঞ্চলের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য নির্মূলের চেষ্টা কমিউনিস্টরা কম করেনি। কিন্তু যে মতবাদ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নিতে উদ্যত হয়, মানুষের আত্মিক প্রশান্তির উৎস যে ধর্ম তা নির্মূলের উদ্যোগ নেয় তা কিন্তু জনগণের মনে দীর্ঘস্থায়ী আসন গাড়তে পারে না। কমিউনিজম এ কারণেই টিকতে পারেনি। কামালিজমও তুরস্কে আজ টলটলায়মান হয়ে উঠেছে। তুরস্কের সমাজে ইসলামের প্রভাব আজও খুব শক্ত। সেখানকার ক্ষমতায় আজ সেকুলারিস্টদের সরিয়ে ইসলামপন্থীরা চলে এসেছে। কামালিজমের প্রহরী আজ সেখানকার জনগণ নয়, সেনাবাহিনী। এই সেনাবাহিনী হচ্ছে পশ্চিমের পেটোয়া ও খয়ের খা। জনগণের অনুভূতির চেয়ে পশ্চিমের আনুগত্য করাই তাদের মোক্ষ। মুসলিম দেশগুলোতে আজ নানা রকমের সেকুলারিজম ও স্বৈরাচার ভিত গেড়েছে। এগুলো আবার নিজেদের অস্তিত্বের খাতিরেই পশ্চিমের সাথে সম্পর্ক রাখে। আবার পশ্চিমও এদের টিকিয়ে রেখেছে যাতে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় না চলে আসে। আজকের মধ্যপ্রাচ্যে নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় চলে আসবে। এটা জেনেই গণতন্ত্রের পূজারী পাশ্চাত্য

www.pathagar.com

স্বৈরাচারের মদদ দিয়ে চলেছে। মোটকথা মুসলিম দেশগুলোতে সেকুলারিজমের এক্সপেরিমেন্ট কোন বড় রকমের সুবিধা অর্জন করতে পারেনি। যেখানে এ চেষ্টা হয়েছে, সেটি মুখ থুবড়ে পড়েছে।

নাসেরের প্যান আরব সোশালিজমও ছিল একটা বড় ধরনের ভাওতা। কামালের মত নাসের ও তার দলবল তাদের প্রতিপক্ষ বানিয়েছিলেন ইসলামপন্থীদের। ইখওয়ানুল মুসলেমিনের উপর নাসেরের জুলুম-অত্যাচার স্বৈরাচারকেও হার মানায়। এত কিছু করেও নাসেরের শেষরক্ষা হয়নি। '৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে নাসেরের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। জনগণও দেখে এই সব সেকুলার নেতৃত্ব দুর্নীতিগ্রস্ত, অন্তসারশূন্য ও মুখের বুলি ছাড়া এদের দেওয়ার কিছু নেই। জনগণ স্বভাবতই এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পুরো মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সেকুলারিজমের আজ দৈন্যদশা। যেটুকু টিকে আছে তা পশ্চিমের ভরসায়।

বাংলাদেশ হওয়ার পর এখানকার কিছু উৎসাহী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে তখন যত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় তা সব ইসলামের উপর। ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কিত শব্দ কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকলেই হলো, ধর্মান্ধতার দোহাই দিয়ে এগুলোকে মুছে ফেলবার চেষ্টা হলো। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো অমুসলমান কোন প্রতিষ্ঠানের উপর এরকম কোন নিষেধাজ্ঞা জারী হয়নি।

আসল কথা হচ্ছে জনগণের বিশ্বাসের বিপরীতে একটা মতবাদ চাপিয়ে দিয়ে টিকে থাকা যায় না। সেকুলারিজমের নামে সেরকম চেষ্টাই মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে হয়েছে এবং ইসলামের বিপরীত একটা বস্তু অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশেও তাই সেকুলারিজম হালে পানি পায়নি।

তত্ত্বীয়ভাবে সেকুলারিজম যতই চমকপ্রদ হোক না কেন কার্যত এটি একটি ধর্মের বৈশিষ্ট নিয়ে হাজির হয়েছে এবং মতবাদ হিসেবে ইসলামের সাথে সর্বত্রই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। পাশ্চাত্য নিজেকে যতই সেকুলার দাবী করুক কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয় স্পষ্ট নয়। তারা সেকুলারিজম, গণতন্ত্র ততটুকুই সমর্থন করে যতটুকুতে তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকে। আজ কোন মুসলিম রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকভাবে যদি কোন ইসলামী দল ক্ষমতায় চলে আসে তবে তাকে ঠেকানোর জন্য তারা স্বৈরাচারদের সাথেও গলাগলি করতে রাজী। আলজেরিয়ার দৃষ্টান্ত দেখুন। ১১ সেপ্টেম্বরের পর সেকুলার পশ্চিমের স্বরূপ অনেকটাই উন্মোচিত হয়েছে। ইরাক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পিছনে আমেরিকা ও তার মিত্ররা যে কূটকৌশল ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে তা স্রেফ সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিদ্বেষণার নজীর বৈ অন্য কিছু নয়। সভ্যতার সংঘাতের তত্ত্ব পশ্চিমের পণ্ডিতরাই হাজির করেছেন। এ নীতি আর যাই হোক বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহাবস্থানের অনুকূল নয়। সব কিছু দেখে শুনে মনে হচ্ছে পাশ্চাত্য আজ নিজেই নিজের মস্তিষ্কগত সেকুলারিজমের গলা টিপে মারতে উদ্যত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রেস্টিজ

নাসীমুল বারী

দর দর করে ঘাম ঝরে পড়ছে মোসাদ্দেক হেসেনের। রোদের প্রখরতা দর দর করে ঘাম ঝরার মতো না হলেও মনের টেনশনের প্রখরতা খুবই তীব্র-তাই ঘাম ঝরছে এতো।

অস্থিরতা বেশ বেড়ে চলছে-এখনও ঢুকতে পারছে না সেক্রেটারীয়েটে। আজ ফাইলটা ছাড় করতে না পারলে পার্টি নির্ঘাৎ কলার চেপে ধরবে। রস বের করে ছাড়বে।

-উহ্! কী হলো শালার সেক্রেটারীয়েটে? কী এতো দরকার চেকিং ফেকিং-এর?

অস্থিরতা নিয়ে কথাগুলো নিজে নিজেই আওড়াতে থাকে মোসাদ্দেক। তারপর আবার গেটের কাছে এসে জানতে চায় পাশ এলো নাকি। কিন্তু না, আসে নি। মোবাইল করে পি.এ. সাহেবের কাছে-কিন্তু বন্ধ ওটা।

-ধ্যাৎ!

প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে ফুটপাতে ডান পা দিয়ে একটা লাথি মারে। তারপর হাত ঘড়ির দিকে তাকায়—পৌনে একটা।

-পৌনে একটা!

শিহরিয়ে ওঠে মোসাদ্দেক।

হয়ত এক্ষণি উপ-সচিবের পি.এ. লাঞ্চে চলে যাবেন। তখন কী হবে উপায়? লাঞ্চ থেকে ফিরে কি ফাইলটা ধরবে? অন্য কাজের ধান্ধায় কি আমার ফাইলের কথা মনে থাকবে? আর ফাইল ধরলেই বা কী-বস্ যদি মিটিং-এ থাকে? দিনের শেষ ভাগেই সাধারণত মিটিং থাকে।

আবারও পি.এ. সাহেবকে ফোন করতে মোবাইলটা অন করে, অমনি কার যেন হাত পড়ে পিঠে। ঘুরেই দেখে দাঁড়িয়ে আছেন আলী আহম্মদ-টিপ.এ.-টু-জয়েন্ট সেক্রেটারী। তিনি বলেন-কী ব্যাপার! আজ বুঝি ঢুকতে পারেন নি?

-আমি তো আপনার আশায় অন্য কোন ব্যবস্থা করি নি। আপনার অপেক্ষায় আছি পাশ পাঠাবেন বলে।

-বেশ ঝামেলায় ছিলাম। আর ভেতরেও বেশ কড়াকড়ি।

-কেন?

-প্রচুর অবাঞ্ছিত লোক থাকে। সেক্রেটারীয়েটটা যেন হাট আর কি! শুধু তদ্বির, ফাইল নিয়ে ছুটোছুটি। কাজে বসাই যায় না। আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক বিভিন্ন সোর্সের সুপারিশ, অনুরোধে আমাদের ত্রাহি অবস্থা।

-তা আমার কাজ, আমার ফাইল?

-এই দেখেন না আপনাকে পাশ দেই নি ঠিকই-কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে ভেতরে ঢুকে আমার কাছে কতজন গিয়েছে জানেন?

www.pathagar.com

-কতজন?

-সাতজন। ন'টা থেকে একটা-এ চার ঘন্টায় যদি বাইরের সাতজন লোকের সাথেই আনাহুত কথা বলতে হয়, তবে কাজ করি কীভাবে?

-আমি ছাড়াই সাতজনের সাথে কথা হয়ে গেছে আপনার? বুঝলাম!

হতাশার সুরে কথাগুলো বলে মোসাদ্দেক আনমনা হয়ে ফুটপাথের দিকে চেয়ে থাকে। অমনি আহম্মদ সাহেব বলেন-মানে? বুঝলেন মানে?

-বুঝলাম আমার ফাইল আর আলো দেখবে না। আপনি অলরেডি.....

কথা শেষ হবার আগেই আহম্মদ সাহেব ভরাট কণ্ঠে বলেন-আরে কী যে বলেন। আপনার সাথে একান্তে কথা বলতেই তো বাইরে এলাম।

সাথে সাথে মোসাদ্দেকের চেহারাটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাহলে কাজ হবে? ফাইলটা পাশ মানেই লক্ষ লক্ষ টাকার হাতছানি। পি.এ. সাহেবকে তো দিতেই হবে; কতো দেবো? ওখানে তো বস্ আছে; আরো কে আছে কে জানে! সব ম্যানেজ করে হলেও এ বড় দানটা মারতে হবে। এ থেকেই এবার একটা গাড়ি নিতে হবে। গাড়ি না থাকলে সমাজে স্ট্যাটাস বজায় রাখা যায় না।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই মোসাদ্দেক হোসেন পি.এ. সাহেবকে বলেন-তাহলে আপনার সাথে কথাটা সেরেই ফেলি। ভেতরে যাবার দরকার নেই, চলেন এদিকে কোথাও লাঞ্চে বসি।

-না থাক। আমি এসেছি শুধু আপনাকে জানাতে ভেতরে আর কখনও না গেলে কি হয় না?

-মানে! এটাও তো বুঝলাম না।

-আবারও চমকে যান মোসাদ্দেক।

-বুঝেন নি? বলছিলাম ও ফাইল আমি দিতে পারব না স্যারের কাছে?

-কেন? পারসেনটেজ কম হয়ে গেছে? নাকি ভয় পাচ্ছেন? আইন-টাইন নিয়ে ভয় পাবেন না-ওসব আমি ম্যানেজ করব। এর চেয়েও বেআইনী ফাইল আমি ছাড় করেছি। আর পারসেনটেজের ব্যাপারে আমি বড়ই উদার। সবচেয়ে আমার অফারই বেস্ট থাকবে।

-আপনার সাথে কি ওসব নিয়ে কথা হয়েছে কখনও?

-দেখেন আপনার সাথে আমার চমৎকার সম্পর্ক। আমি তাই আপনার উপর ভরসা করে সব দিক ম্যানেজ করে ফেলেছি। এখন ফিরে যাবার কোন উপায় নেই। প্রেস্টিজ বলে কিছু আছে না?

-প্রেস্টিজ তো আমারও আছে। আপনার পারসেনটেজের চিন্তাটাই তো আমার প্রেস্টিজ!

কথাটা বলেই হন্ হন্ করে আলী আহম্মদ গেট দিয়ে ঢুকে যান সেক্রেটারীয়েটে।

www.pathagar.com

মৃত দেহ জীবিত আত্মা

সুফিয়া হাফিজ মুক্তা

মনি কাঞ্চন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোণে মেয়েদের হল। হলের দোতলার একটা রুমে বসে আছে প্রথম বর্ষের দুই বান্ধবী। জানালা দিয়ে কৌতূহলী মন নিয়ে বাইরের বসন্তের বিকেলটা দেখার চেষ্টা করছে তারা। আর তার সাথে সাথে টুকটাক কথাবার্তাও চলছে।

আয়েশা?

বল্‌না! আমি শুনছি।

চেয়ে দেখ কপোত কপোতীর দল বিশ্ববিদ্যালয়টিকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বানিয়ে ফেলেছে।

হাজেরা তুই ঠিক কথা বলেছিস। এযেন রাধাকৃষ্ণের প্রেম কানন। হাজেরা সত্যি করে বলতো, এর আগে এত কাছে থেকে এসব দেখলে উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছাটা উবে যেত না? তুই দক্ষিণ পাশটাতে এক ঝলক তাকিয়ে দ্যাখ আরো কিছু দেখতে পাবি।

ছিঃ! ছিঃ! আয়েশা, আগে এ সব জানতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতাম না। এমন সব বেহায়াপনা দেখতে হবে জানলে বাড়ি বসে জ্ঞান চর্চা করতাম।

তোর আগের কথাগুলো সঠিক ভাবেই মিলে যাচ্ছে হাজেরা। ওদের পাশে আমরা বড্ড বেমানান। পর্দা করে চলি। জন্মের পরপরই বাবা মা নাম রাখলেন অতি সাধারণ, অতি পুরাতন হাজেরা-আয়েশা। অতি পুরাতন বেমানান নামগুলো শুনে অতি আধুনিক বান্ধবীগুলো নাক সিটকে চলে গেলো আর ফিরে এলো না। যাওয়ার আগে বলে গেলো আমরা নাকি 'ব্যাকডেটেড'। হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ–!

চুপ! একদম চুপ! আয়েশা অমন করে হাসবিনা, অভদ্র ভাবে হেসে নিজের কাছে নিজেকে আর ছোট করিসনা। বাবা মা মুরুব্বী। তাঁরা নামের বিশেষ ফযিলত জেনেই কিন্তু আমাদের অতি পুরাতন নাম রেখেছেন। আয়েশা, হাজেরা, খাদিজা- এসব নাম ইসলামের মহিয়সী নারীদের নাম। আমাদের সৌভাগ্য যে এনাম আমরা জন্মগত ভাবে পেয়েছি। এ নামের বরকতে আল্লাহ্ তালা আমাদেরকে সঠিক পথে হেদায়েত করবেন।

হাজেরা তোর কথাই ঠিক। 'আল্লাহ্ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।' নইলে ওই প্রেম কাননে আমাদেরও যোগ দিতে হতো নামের ফযিলতে আল্লাহ তালা রক্ষা করেছেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি জ্ঞান চর্চা করতে, প্রেম করতে নয়। বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সে জন্যই এই প্রতিষ্ঠানটিকে আমাদের সম্মান করা উচিত। অশ্লীলতা অভদ্রতা আমাদের পরিহার করা উচিত। "ইকরা বিসমি রাব্বি কাল্লাযী খালাক"। স্রষ্টার এই বানীটির যথার্থ মূল্যায়ন মনের গভীরে রাখা উচিত। হে আল্লাহ্

www.pathagar.com

আমরা বিদ্যাশিক্ষার জন্য এই বিদ্যাপীঠে এসেছি তুমি আমাদের সঠিক পথে, সম্মানের সাথে জ্ঞান অর্জন করিয়ে নিয়ো। আ.....।

আয়েশা চেয়ে দেখ, ওই যে ঝাউবনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গেছে ওদিক পানে চেয়ে দেখ।

কি ব্যাপার বলতো হাজেরা ? হ্যাঁ, মেয়েরা সারিবদ্ধভাবে ওই রাস্তাটাতে শুয়ে পড়ছে! বড্ড বিস্ময়কর ব্যাপার ঠেকছে। অনশন করছে না তো? ওখানে কি এমন ব্যাপার ঘটলো যে মেয়েরা ওভাবে রাস্তায় শুয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে তুই কিছু জানিস?

তুই যেখানে আমিও সেখানে কি করে জানবো বল। দেখতে থাকি! চিন্তিত মনে দুবান্ধবী অতি আগ্রহে ঝাউবনের দিকে চোখ রাখলো।

দেখছিস দেখছিস হাজেরা, যে মেয়েগুলো রাধাকৃষ্ণ কপোত কপোতীর দল হয়ে প্রেম করছিল তাদের সেই প্রেমিক পুরুষগুলো তাদেরই রাধাকে রাস্তায় শুইয়ে দিচ্ছে। তারপর তারা নিজেরা কোথায় যেন গা ঢাকা দিল!

একে আবার প্রেম বলে! এ যেন প্রেমের নামে অশ্লীলতার কানামাছি খেলা। চেয়ে দেখ আয়েশা রাজনৈতিক মিছিল আসছে! আচ্ছা, এবার বোধগম্য হচ্ছে। রাস্তার উপরে শুয়ে থাকা মেয়েগুলোকে দিয়ে প্রতিপক্ষরা ব্যারিকেড তৈরী করেছে। বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

হাজেরা, যা ভেবেছিলাম তাই হলো। চেয়ে দেখ, দুজন ছেলে রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া মেয়েদের অনুরোধ করছে রাস্তা ছেড়ে দিতে কিন্তু মেয়েরা উঠছেনা। কি অসভ্য মেয়েরে বাবা! এমন বেহায়া নারী কি এ পৃথিবীতে আছে! হাজেরা, যা ভেবেছিলাম তাই হলো। রাধাদের কৃষ্ণের দল এসে ওই দুজন ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আরে! ছেলে দুটো মরে গেলতো।

কিছুক্ষণের মধ্যে দু'দলের তুমুল মারামারি, লাঠালাঠি, বন্দুকের গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলো তা দেখতে দেখতে দুবান্ধবীর দম আটকে আসতে লাগলো। অনেক কষ্টে দম ফেলতে ফেলতে বললো, আল্লাহ্ তালা রক্ষা করুন! আল্লাহ আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠকে রক্ষা করুন!

আমার ভয় করছে হাজেরা!

ভয় পাসনা সাহস রাখ। সাহস না রাখলে এখানে পড়ালেখা করবি কেমন করে ? এখান থেকে না হয় সর্বোচ্চ খারাপ বস্তুগুলো জেনে যাই। পরবর্তী জীবনে চলার পথে যে কোন খারাপ অতি সহজে চিনে নেব, বুঝলি আয়েশা। এটাও একটা শিক্ষা। আমাদের মত মেয়ে যারা তারা উচ্চ শিক্ষা নিতে এসে চরম ভুল করবে।

তুই ঠিক বলেছিস হাজেরা, নারী স্বাধীনতার নামে নারী জাতির এত বড় অপমান। এমন জঘন্য অশ্লীল পরিবেশের কথা এখানে পড়তে না এলে জানতে পারতাম না। উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করতে চেয়ে ভুল করেছি। এখানে থাকতে হলে যে কোন একটা পক্ষ অবলম্বন করতে হবে।

www.pathagar.com

হ্যাঁ আয়েশা, আমরা অবশ্যই সত্য ন্যায়ের পথে থাকবো। সত্যপক্ষ চিরদিনের শক্তি। আসছে! চুপ!

কে?

ওই যে! ও-ই বড় আপা তার দলবল নিয়ে আসছেন।

ও-কুইট আপা! উনিতো এদিক পানেই আসছেন।

হাজেরা, উনি কি মারামারির মধ্যেই ছিলেন?

হবে হয়ত। উনাকে নীল ছবি করার দায়ে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ছাড়া পেলেন কবে? উনার কারণে এক ছাত্রী না আত্মহত্যা করেছিলেন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে হাজেরা। উনারা তো এদিকেই আসছেন। হয়ত মিছিলে যেতে বলবেন। চল্ পালিয়ে যাই! লুকিয়ে পড়ি অন্য কোথাও

আয়েশা! কোথায় যাচ্ছিস? থাম! অত্যন্ত গম্ভীর হাজেরার কণ্ঠ। চুপ করে বস যেমন বসেছিলি ঠিক তেমনি করে। এদের ভয়ে পালিয়ে বেশি দিন থাকা যায় না। যেখানেই থাকিনা এরা খুঁজে বের করবেই। জেনে রাখিস 'পানি সব সময় নিচের দিকে গড়ায়'। এখনি নিজেকে সত্য ন্যায়ের জন্য তৈরী কর। মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়া। দেখবি ওরা পিছু হটবে ভয় পাবে। আল্লাহ তোকে সাহায্য করবেন।

এই মেয়েরা! এখানে কেন? জলদ গম্ভীর কণ্ঠ কুইট আপার।

কোথায় থাকবো আপা? হাজেরা বললো।

মিছিলে যাওনি কেন?

মিছিল! কিন্তু কেন? সহজ ভাবে জানতে চাইল হাজেরা। ও-! তোমার নাম কি?

হাজেরা, আমি বাংলায় প্রথম বর্ষে পড়ি ও হচ্ছে আয়েশা। তাই বলো! যেমন তোমাদের নাম তেমনি তোমরা ব্যাকডেটেড। ও-আই-সি! গ্রাম থেকে এসেছ বুঝি? আমি কুইট আপা। বেশ কিছুদিন ধরে একটি রাজনৈতিক দল অযথা আমাকে হয়রাণী করছে। সেই হয়রানীর প্রতিবাদে মেয়েরা অনশন করেছিল। সেই অনশনে মেয়েদের উপর কিছু ছাত্র লাঠিচার্জ করেছে। এর বিরুদ্ধে তোমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। নারী স্বাধীনতা নারীকেই আদায় করে নিতে হবে। এখনই এর সঠিক সময়, হলের সমস্ত মেয়েদের আহবান করছি মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য। বসে আছ কেন তোমরা ? এগিয়ে চলো!

আমরা এ মিছিলে যেতে পারবো না, ক্ষমা করে দেবেন।

বেয়াদব মেয়ে কোথাকার! তুমি জান আমি কে? আমি! .....

কুইট আপা নিজেকে জাহির করার জন্য যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছিল আর হাজেরার আর সেগুলো শুনা হলো না, তার আগেই তার কণ্ঠ দিয়ে বের হয়ে এলো, থামুন আপনি! এতক্ষণ গ্রামের মেয়ে বলে ব্যাকডেটেড বলে অনেক অপমান করেছেন। সয়েছি! অনেক সয়েছি। এখন আর সইতে পারছিনা। নিজের পরিচয় জানবার এতই ইচ্ছা যখন আপনার তখন শুনে যান নিজ কানে নিজের পরিচয়। এখানকার সবাই জানে, নীল ছবি করার সান্দেহে আপনাকে এ্যারেষ্ট করে পুলিশ

www.pathagar.com

হাজতে রেখেছিল। আপনার অশ্লীল অপকর্মের প্রয়োজনে একটা মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আরো কিছু জানতে চান?

কি বললে? রাগে কাঁপতে থাকেন কুইট আপা।

হ্যাঁ এ সবই সঠিক। আপনার সম্পর্কে সত্যিটা আমার জানা আছে।

এর পরিনাম কি জান? আমাকে অপমান করার প্রতিশোধ আমি কেমন করে নিই জান?

মৃত্যু! হাজেরা যেন গর্জন করে উঠলো। মৃত্যুর চাইতে কঠিন শাস্তি কেউ কাউকে দিতে পারে না। আপনিও পারবেন না। কেননা মানুষ অনেক কিছুই পারে না। আপনারা তো বস্তুবাদে বিশ্বাস করেন। স্রষ্টাকে চিনতে ও মানতে চেষ্টা করেন না। স্রষ্টা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আজ যদি ইসলামের মহিয়সী নারীদেরকে যথার্থ ভাবে মূল্যায়ন করতে জানতেন তাহলে আমাদেরকে বলতে পারতেন না নীল ছবি করো, বেহায়ার মত নির্লজ্জের মত রাস্তার মাঝখানে শুয়ে পড়ো। আজ থেকে পনের শত বছর আগে ইসলামের মহিয়সী নারীগণ যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। পুরুষদের পাশাপাশি গভীর জ্ঞানের চর্চা করতেন এবং ইসলামের প্রয়োজনে যে কোন জটিল কাজে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁদের জীবনী পড়লে জানতে পারবেন।

এই মেয়ে চুপ! তুমি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ?

চুপ কি করে করি বলুন, শুরুটাতো আপনিই করেছেন। আপনারা আজকের যুগের সভ্য নারী। আপনারা কি জানেন আত্মরক্ষা কেমন করে করতে হয়? বিজ্ঞান, শিল্প, কলা চর্চায় কেমন করে আত্মনিয়োগ করতে হয়? জানেন না! জানেন শুধু আল্লাহ্ তালার দেওয়া এই শরীরটার প্রদর্শণী করতে। ইসলামের মহিয়সী নারীগণ শরীর নয় বিদ্যা খাটাতেন। প্রতিটি মানুষকে মানবিক আত্মায় গরীয়ান করে আল্লাহতালা এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সেই আদি আত্মা যদি আপনাদের মত নারীদের থাকতো তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠকে কেউ কলুষিত করতো না। এখানে সত্যিকারের পবিত্রতম জ্ঞান চর্চাই হতো।

ইউ স্টপ! ইউ স্টপ! অনেক হয়েছে। তোমাকে আমি দেখে ছাড়বো কত বড় সতী সাধ্বি মেয়ে তুমি হয়েছ। এই মেয়েরা মিছিলে চল।

হাজেরার বক্তব্য শুনে এ হলের অনেক মেয়ে তার আশপাশে জড়ো হয়েছিল। তারা ইতস্তত করছিল কুইট আপার মিছিলে যেতে। তা দেখে কুইট আপা ধমকে উঠলেন। নারীর স্বাধীনতা নারীকেই আদায় করে নিতে হয়। ওর কথায় তোমরা কান দিয়ো না।

হাজেরা আবার জ্বলে উঠলো। আপনারা অমন বাজে মিছিলে যাবেন না। দয়া করে জ্ঞান চর্চা করুন। রাস্তায় শুয়ে লাঠি চার্জ খাবেন না। মহান স্রষ্টা নারীকে তাঁর সৃষ্টি জগতের সেরা সুন্দরী করে গড়েছেন। তাঁর সেই সেরা দানকে আমরা এমন অশ্লীল ভাবে ব্যর্থ হতে দেবো না। আমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবো, শরীরকে নয়। এই হোক আমাদের আজকের নারীদের শ্লোগান।

www.pathagar.com

কুইট আপা দেখছেন মুগ্ধ হয়ে মেয়েরা হাজেরার বক্তব্য শুনছে। ভাবলেন এ বক্তব্য শোনার সময় মেয়েদেরকে আর দেওয়া হবে না। এরা এমনতর মুগ্ধ হয়ে বক্তব্য শুনলে আমাকে কেউ মানবে না। তাই বলে উঠলেন, আজকের মিছিলে যে সমস্ত মেয়ে যাবে না তাদেরকে পরে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। কথাগুলো বলে তড়িৎ গতিতে সদলবলে চলে গেলেন। সেই গন্তব্য পথের দিকে তাকিয়ে মেয়েরা বলে উঠলো,

শাবাশ! হাজেরা শাবাশ। এমনি করেই অহংকারীদের অহংকার চূর্ণ করে দিতে হয়। প্রথম বর্ষের ছাত্রী মণি এগিয়ে এসে বললো,

আমি এখন কুইট আপাকে একটুও ভয় পাই না! বাব্বাহ্ কী ভয়টা না এতদিন পেয়ে এস্‌ছি। অন্য মেয়েরা এগিয়ে এসে বললো,

আমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকে ওনাকে ভয় পেয়ে এসেছি। এখন আর ভয় পাবো না। ড্যাম কেয়ার হাঃ! হাঃ! ড্যাম কেয়ার।

তোরা হাসি থামা। এখন হাসির সময় না। ওরা আমাদের অশ্লীল ভাবে অপমান করবেই এ জন্য তোরা সকলে সাবধানে থাকিস। সাবধানের মার নেই। সকলে চারপাশে চোখ রেখে চলিস। বাথরুম, চলার রাস্তাটায় আশপাশ পর্যন্ত দেখে চলিস। নির্জন এলাকা এড়িয়ে চলবি। কখনো একা যাবি না।

আয়েশা একটু দূরেই ছিল। হাজেরার অতি কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, তোর চির সুন্দর সত্য কথাগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে হাজেরা। আর তার সাথে সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ। স্মিত হাসি ছড়িয়ে দিয়ে আয়েশা উপস্থিত বান্ধবীদের বলতে থাকলো, তোরা হাজেরাকে দেখ! ওর কাছ থেকে সাহস বঞ্চয় করে নে। এখনই সময় কুইট আপাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। হাজেরা জ্বলন্ত আগুন, আমরা না হয় তার আশপাশের ধোঁওয়া হবো।

মনি বললো, তোরা দেখেছিস কুইট আপার দলের মেয়েদের? কি বিশ্রি ড্রেস পরেছে! ছি! ওর থেকে ভারতের নায়িকারাও সভ্য পোষাক পরে।

আছমা মণির কথার সাথে একমত হয়ে এক চোট হেসে নিল। হাসি থামিয়ে বললো, ভারতের নায়িকারা স্লিম ফিগারের অধিকারিনী তাই মানিয়ে যায়। কিন্তু! বাংলার নায়িকারা? আস্ত খালাম্মা! ইয়া মোটা মোটা।

হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ–হাসির রোল পড়ে গেল বান্ধবীদের মাঝে। তারা প্রাণ খুলে হাসতে লাগলো। হাসির মাঝেই তনিমা ফিস ফিসিয়ে বললো, তোরা কি জানিস?

সবাই একত্রে মাথা জড়ো করে আস্তে ধীরে সবিস্ময়ে জানতে চাইলো কি ? ?

যে মেয়েটা আত্মহত্যা করলো সে মেয়েটাকে কুইট আপা তার বাসায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তার আগেই অবশ্যই সুদর্শন এক স্মার্ট দূর্ধর্ষ প্রেমিক জুটিয়ে দিয়েছিল। তারপর! সমস্বরে মেয়েরা জানতে চাইলো।

তনিমা আবার বললো, কুইট আপা সরবৎ এর মধ্যে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দিয়ে মেয়েটিকে ব্লাকমেল করলো।

www.pathagar.com

তার মানে–ব্লাকমেইল ? প্রেমের নামে অশ্লীলতা ? ছি! এত জঘন্য এরা! বলিস কি?

এখন তো রীতিমত ভয় পাচ্ছি আমরা। কি হয় আমাদের ? সমস্বরে মেয়েরা বললো।

ছাত্রীটি যখন বুঝতে পারলো, তখন তার আর করার কিছু ছিল না। কেননা ততদিনে বিশ্বময় তার দেহের প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাজারদর চলছে।

হাজেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললো, হায়রে অভাগী! কেন যে আত্মহত্যা করতে গেলি। আল্লাহ্তালা এ জন্যতো তওবার দ্বার খোলা রেখেছেন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত কাজ ফুরিয়ে যায়, আমলনামা গুটিয়ে যায়। কুইট আপার নামে কেস করা উচিত ছিল। কি বলো তনিমা?

হাজেরা তুই তাহলে পুরোটা জানিসনা। ছাত্রীটি লিখিত বক্তব্য দিয়ে গিয়েছিল। উনার মৃত্যুর পর উনার রুমে পাওয়া গিয়েছিল তা। কুইট আপা পুলিশের কাছে বলেছেন, তিনি মেয়েটিকে চেনেন না।

আর আমাদের দেশের পুলিশ! 'বেড়ায় ক্ষেত খায়' সে অবস্থা আর কি। হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ। মেয়েরা সমস্বরে হেসে উঠলো।

আয়েশা বললো, আর হাসিস না তোরা! নামাজের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে। চল নামাজ পড়ি। নামাজকে এই পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করি। চল্চল্ সবাই চল্ নামাজ রুমে যাই। নামাজ শেষে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ্ তালার কাছে সাহায্য চাই। আল্লাহ্ তালাকে বলি–

হে আল্লাহ্, অশ্লীল চলার পথটা আমাদের জন্য বন্ধ করে দাও! কুইট আপাদের মত মেয়েদের হাত থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই!

বেশ কিছুদিন পরের কথা। আয়েশা, হাজেরা, মনি, আছমা, তনিমা ওরা ভুলতে বসেছে কুইট আপার সেদিনের কথা কারণ সামনে পরীক্ষা। তারা পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে যে যার মত ব্যস্ত ঠিক সে সময় কুইট আপার দলের একজন ছাত্রী নাম তার ঝলক, সে ঝটিকা সফর শেষ করার মত করে প্রত্যেকটা রুম ঘুরে এসে হাজেরা আর আয়েশার রুমে প্রবেশ করলো এরপর বললো, তোমাদের ডিস্টার্ব করতে এলাম হাজেরা, কিছু মনে করো না। হাজেরা নোট তৈরীতে ব্যস্ত ছিল। তাকে সাহায্য করছিল আয়েশা। হাজেরা মাথাটা সামান্য একটু উপরে তুলে বললো, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না? ঝলক আপা থতমত খেতে খেতে নিজের নাম ভুলে যেয়ে বললো, না মানে! আমি, এই এলাম।

উনি ঝলক আপা ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী। মনি বললো।

আপনাকে চিনতে না পারার জন্য সত্যিই দুঃখিত! কি মনে করে এলেন?

তেমন কিছুনা! সেদিনের ঘটনার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। কোন দিনের ঘটনা?

ওই যে, সেদিন, কুইটের সাথে আমিও ছিলাম। হাজেরা তোমার চির সত্য কথাগুলো আমার মনের গভীরে দাগ কেটেছে। আমরা ভার্সিটি পাশ দিই ঠিকই তবে সত্যিকারের শিক্ষাটা, প্রকৃত জ্ঞানের শিক্ষাটা ফাঁকিই থেকে যায়। তাই হয়ত আমাদের মত মুসলিম

www.pathagar.com

মেয়েরা নাস্তিক রয়ে যায়। নাস্তিক মন নিয়ে যখনই সামনে এগুতে যাই তখনই প্রতিটি পদে পদে স্রষ্টার সৃষ্টির খুঁত ধরতে শুরু করি।

হ্যাঁ আপা! এভাবেই স্রষ্টার ভুল ধরতে যেয়ে নিজেরাই এক সময় ভুলের গভীরে তলিয়ে যাই। কেননা স্রষ্টার সৃষ্টি তো আমরাও।

হাজেরা তোমার কথাগুলো সত্যিই সুন্দর! চির শান্তির পথ তৈরী করতে সাহায্য করে। আমরা নিজেদেরকে এত অধিক দামী ভাবতে শুরু করি যে পুরুষদের সাথে চলতে যেয়ে বৈরী একটা পরিবেশ তৈরী করে ফেলি। তখন থেকে পুরুষকে আমাদের চলার পথের বন্ধু না ভেবে শত্রু ভাবতে থাকি। আমি তোমার কাছে এর সঠিক সমাধান চাই। আমার মনের শান্তি ফিরে পেতে চাই।

ঝলক আপা, আমি তেমনভাবে কিছু জানিনা। আমি এও জানিনা আপনাদের মত অতি জানা মানুষদের কথাগুলোর উত্তর কি ভাবে দেব। ইসলাম সম্পর্কে জানতে যদি ইচ্ছা হয় তবে ইসলামী বইপত্র থেকে সাহায্য নিতে পারেন। আপনার নাস্তিক মনে স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে যে অশ্লীল প্রশ্নগুলো জন্ম নিয়েছে সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাবেন ইসলামী বইপত্র পড়লে। পাঠ্য বই পড়ে কোনভাবে পাশ করা যায় কিন্তু গভীর জ্ঞান অর্জন করা যায়না। জ্ঞান অর্জন করতে হলে মৌলিক কিছু বই আছে তা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে। আমি তেমনি ভাবে পড়ে জেনেছি। স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে যত উদ্ভট প্রশ্ন আমার মনের কোণে ছিল তা এ ভাবেই বের করে দিয়েছি। স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্যকে বর্তমান বিজ্ঞানের সাথে মিলিয়ে পড়েছি। জেনেছি সত্য, সুন্দরকে। আল কুরআনকে জানতে যেয়ে, বুঝতে যেয়ে নারী হিসাবে নিজেকে নিজের কাছে গর্বিত মনে হয়েছে। কেন না আল কুরআন নারীকে যে সুমহান মর্যাদা দিয়েছে তা আর কোন ধর্ম গ্রন্থ বা সভ্য সমাজ দেয়নি। কারো কারো কাছে জীবন বড্ড জটিল। তাদের উচিত ইসলামী জীবন দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি পড়া। ইসলাম এমন একটি জীবন দর্শনের অধিকারী যার মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে গঠন ও পরিচালনা করা যায়।

হাজেরা তুমি যে ভাবে ইসলামের গুনগান করছো তাতে মনে হচ্ছে পুরুষরা না চাইতেই তোমাকে সম অধিকার দিয়ে দিয়েছে।

ঝলক আপা সম অধিকারের কথা বলছেন কেন? আমার বাবা আমার জন্মদাতা উনিই আমাকে পৃথিবী চিনতে সাহায্য করেছেন। তিনিই আমার প্রথম অন্নদাতা, নিরাপত্তা দাতা। তিনিই আমাকে ভালবাসা ও স্নেহের বন্ধনে বেঁধে নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে যে লালন পালন করছেন তার কি কোন তুলনা আছে? আমার মায়ের পেটের ভাই। আমার সবচেয়ে আপন। সে আমার নিজের মত। আমার ভাইয়ের চাইতে বেশি দরদ আমার জন্য আর কার থাকবে বলুন? স্বামী নারীর অলংকার। আমৃত্যু সাথি ইহকাল পরকালে। স্বামী না থাকলে নারীদের চলার পথের ছন্দ হরিয়ে যায়। এবার বলুন কার সাথে আপনি সম অধিকার প্রয়োগ করবেন? আপনার জানার জন্য বলছি। আলকুরআন নারীকে বাবার

www.pathagar.com

সম্পত্তির অংশে, স্বামীর সম্পত্তির অংশে অংশীদারীত্ব দিয়েছে। আলকুরআন নারীকে চার জায়গা থেকে অর্থনৈতিক শক্তির যোগান দিচ্ছে। পিতার অংশ, স্বামীর অংশ, সন্তানের অংশ, ভাইয়ের অংশ। তাছাড়াও নারীর নিজের ইনকাম যদি কোটি টাকা হয় তবুও তা স্বামীর সংসারে খরচ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সে নিশ্চিন্তে বাবা, স্বামী, ভাই সন্তানের উপর ভর করে খেতে পরতে পারবে।

তোমাদের তো পরীক্ষা তাই না?

হ্যাঁ আপা, এককণ্ঠে সবাই বললো।

আজ তাহলে আসি আরেকদিন আসবো। অনেক সময় নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো। হাজেরা তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে। বিশেষ করে বস্তুবাদ আর ভাববাদের পার্থক্য আমাকে বুঝতে হবে। আরেকটি কথা তুমি কি মাদরাসা থেকে পড়ে এসেছ? তোমার জানা দেখে, সত্যি বলার সাহস দেখে, তোমার আপাদমস্তক দেখে যে কেউ বলে দিতে পারবে তুমি অরজিনাল শিক্ষিত মুসলিম ঘরের মেয়ে। যে শিক্ষায় আজ তুমি আলোকিত সে শিক্ষা শিশুকাল থেকে পেয়ে এসেছ। আজ আসি! চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ঝলক আপা হাজেরাদের রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেই গন্তব্য পথে চোখ রাখতে রাখতে হাজেরা বললো, ঝলক আপা আবার আসবেন। আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। আল্লাহ্ হাফেজ।

মনি এগিয়ে এসে বললো, আবহাওয়া সুবিধা বলে মনে হচ্ছে না। আয়েশা বললো, ঝলক আপার এত ভালমানুষী ভাল বলে মনে হচ্ছে না। হাজেরা তা শুনে বললো, বিশ্বাস অবিশ্বাস দুটো বস্তু পৃথিবীকে ঘিরে আছে। আমরা বিশ্বাস রাখবো তবে শত্রুপক্ষের ধূর্তামীর দিকে চেয়ে সাবধানে চলবো। কি বলিস তোরা?

ঠিক! ঠিক! আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করবেন। এককণ্ঠে সবাই বলে উঠলো। আজ ছুটির দিন হল প্রায় ফাঁকা বলা যায়। যাদের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে তারা বাড়ি অভিমুখে যাত্রা করেছে। মনি, আয়েশা, হাজেরা বাড়ি যেতে পারেনি। সকাল থেকে ওরা পরীক্ষার পড়া তৈরী করছে। এর মধ্যে মনির বিস্ময়কর কণ্ঠ ভেসে এলো।

দেখ তোরা! এটা কি?

এতো দেখি ক্যামেরা! কোথায় পেলি এটা? হাজেরা ক্যামেরাটি হাতে নিতে নিতে বললো, দেখে মনে হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির ভিডিও ক্যামেরা! মনি এটা কোথায় পেলিরে?

বাথরুমে ছিল! আমরা যে বাথরুমে গোছল করি সেখানে লটকানো ছিল। এমন জায়গায় ওটা আটকানো ছিল যে সচরাচর ওখানে কারো চোখ যায় না।

বলিস কি? আয়েশা বললো।

আমাদের কি হবে এখন?

কিছুই হবে না আয়শা। আমরা সর্তক দৃষ্টি রাখছিলাম এ জন্যই। আরো সাবধানে পথ চলতে হবে। এটা সম্ভবত একটু আগেই সেট করে গেছে। কেন না সকালে একবার আমি

www.pathagar.com

ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে এসেছি। বুঝলি এই হলো ওদের প্রতিশোধ! এমনি করে কত মেয়ের সর্বনাশ যে ওরা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কত মেয়েকে যে এ বিশ্বাবিদ্যালয় ছাড়তে বাধ্য করেছে অথচ ওরা বহাল তবিয়তেই আছে। যাদেরকে মানুষ শাস্তি দিতে ভয় পায় তাদের জন্য আল্লাহ্ তালা তুলে রেখেছেন কঠিনতম শাস্তি। আমাদের প্রার্থনা আল্লাহ্ তালা শুনেছেন এবং কবুল করেছেন তাইতো তিনি আমাদের ইজ্জত রক্ষা করেছেন।

হ্যাঁ হাজেরা! হ্যাঁ। মানির মান আল্লাহ্ তালা রাখেন। এখন আমরা কি করবো?

আয়েশা, যত তাড়াতাড়ি পারি ভিসিকে জানাতে হবে। প্রোভিসিকে বিশ্বাস নেই। কেননা এ হলে কি হচ্ছে তা তার নলেজে থাকার কথা। দেরী হলে আমাদের লাশ পড়ে যেতে পারে। বলিস কি হাজেরা! মনি, আয়েশা আর আছমা একসাথে হায় হায় করে উঠলো। হাজেরা বাদে সবাই ডুকরে কেঁদে উঠলো আর বলতে থাকলো, এখন কি হবেরে! আল্লাহ্ তুমি রক্ষা করো।

হাজেরা শান্ত সুরে বললো, এখন কান্নার সময় নয়, জেহাদ করার সময়। নারীর জন্য এটাও একটা জেহাদের অংশ। চল্ ভিসি স্যারকে ফোন করি খুঁজে বের করি।

তাই চল! চোখ মুছতে মুছতে তিন বান্ধবী রুমের দরজা ভাল ভাবে বন্ধ করে দিয়ে হাজেরার সাথে সাথে চললো। পথে হাজেরা বান্ধবীদের উদ্দেশ্যে বললো, তোরা মন দিয়ে শোন! একাজটা কে করতে পারে আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করে তবে ভুলেও কারোর নাম বলবি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সব জানেন। দায়িত্ব উনাদের। কাজেই প্রশাসন খুঁজে বের করবেন কারা এ কাজ করে থাকে।

বেশ কিছুদিন ধরে প্রশাসনে তোলপাড়। হাজেরাদের হল তল্লাশী করে ওই ক্যামেরাটি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে ওটা যে ভিডিও ক্যামেরা ছিল তা প্রশাসন নিশ্চিত করেছে। কারা এ ধরনের অশ্লীল জঘন্য কাজ করতে পারে তা প্রমান করতে প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঘোষনা করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ ছুটির পর আবার খুলেছে। ক্লাস শুরু হয়েছে। হাজেরারা চার বান্ধবী আবার একত্র হয়েছে। দীর্ঘদিন পর তারা জমিয়ে বাড়ির গল্প করছে এরই মাঝে পাশের রুমের তনিমা এসে বললো, শুনেছিস তোরা?

না বললে শুনবো কোথা থেকে! এমন ভাবে মুখ ভেংচে আছমা কথাগুলো বললো যে সবাই এক চোট হেসে নিল। হাসি থামিয়ে আয়েশা বললো, এবার বল কি সংবাদ এনেছিস?

আজকের পত্রিকা পড়েছিস?

এখনো হাতে পাইনি। হাজেরা বললো।

এই দেখ্ আজকের প্রত্রিকার প্রধানতম সংবাদ।' মক্ষীরানী কুইট সহ পাঁচজন নিহত। একজন আহত রোড এ্যাকসিডেন্টে।' মনি কাঞ্চন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হচ্ছে লেটেস্ট

www.pathagar.com

সংবাদ। চোখে দেখেও বিশ্বাস হলো না তোদের ? কিরে চুপ কেন ফূর্তি কর! আমাদেরই তো জিত হলো। হাজেরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, না তনিমা না! কারো মৃত্যুতে ফূর্তি করা ঠিক নয়। মৃত্যু সবার জন্য নির্ধারিত, কেউ আগে কেউ পরে। আমি অন্য চিন্তা করছি। মহান স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিতে কত ভাবেইনা বৈচিত্র দিয়েছেন। কুইট আপারা তওবা করার সময় পেলনা। আবু জেহেল, আবু লাহাবদের মত মৃত্যু বরণ করলো। হে মহান স্রষ্টা তাদের সাথি সহযোগী যারা বেঁচে আছে তাদের তুমি সঠিক সত্য পথ দেখাও!

শুনলাম ঝলক আপা বেঁচে আছে। রিমকি বলছিল।

আল্লাহ্ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন পাপ মুক্ত করার জন্য। ঝলক আপা কোন ক্লিনিকে আছে তোরা একটু সংবাদ নিসতো।

হাজেরা, তুই কি দেখতে যাবি?

হ্যাঁ আয়েশা। মানুষের দুঃখের সময় শত্রু মিত্র ভুলে তার পাশে যেয়ে দাঁড়ানো উচিত। এরই নাম মানবতা। স্রষ্টার সৃষ্টির ভাল খারাপের বিচার করার দায়িত্ব আমাদের নয়, একমাত্র আল্লাহ্র। স্রষ্টা কখন যে, কি করে এ পৃথিবীতে দুঃখ কষ্ট ঢেলে দিয়ে তারই মাঝ দিয়ে তাঁর খাস বান্দাকে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে নেন তা শুধু স্রষ্টাই জানেন। তাই আমাদের উচিত তাঁর সৃষ্টির সেবা করা, তাঁর নির্দেশ মেনে চলা।

আয়েশা অতি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললো, হাজেরা তোর আত্মিক কথাগুলো অতি সুন্দর, অতি পরিস্কার, তোর আত্মা সত্য চিনতে কখনো ভুল করে না।

তোরা আমার জন্য দোওয়া করিস! আমার আত্মা আমৃতু যেন স্রষ্টার সৃষ্টির চির সত্যগুলো খুঁজে নিতে পারে।

ঝলক আপা রোড এ্যাকসিডেন্টে হাত পা হারিয়ে চির পঙ্গুত্ব বরণ করে এক ক্লিনিকের ছোট রুমের বেডটিতে শুয়ে আছে। তার জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে একটি মুখ মনে পড়ছে তা হলো হাজেরার মুখ। আজ এ অবস্থায় আপনজনদের কাউকে কাছে পেতে চায়না সে। সে জানে আপনজনদের ব্যস্ত জীবনে তার মত পঙ্গুকে কেউ মেনে নিতে পারবে না। তার নিসঙ্গ জীবনে স্রষ্টা ছাড়া আর কোন সৃষ্টি নেই। তার বাবার অর্থের অভাব নেই। তার মায়ের ব্যস্ততার শেষ নেই। তারা অনেক অর্থ ঢেলে এ সমাজের উঁচু স্তরকে দেখানোর জন্য আমাকে মডেল করে কৃত্রিম হাত পা লাগিয়ে দেবে নয়ত বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলবে।

এমনিতর হাজারো চিন্তায় মন ছেয়ে যাচ্ছে ঝলকার। তার মন বলছে হাত পা লাগিয়ে কি ক্ষান্ত দেবে তারা! আরো কত কি হবে। উঁচু সমাজের মানুষগুলো প্রশংসা করে বলবে বাহ্ সুন্দর হয়েছে। চমৎকার ভাবে মানিয়ে গেছে। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে বাবা মা আমাকে শুধু উঁচু স্তরের একজন আদর্শ মডেল বানিয়ে এসেছেন। অনেক হারিয়েছি আর না! সঙ্গ দোষে হয়ত সব হারিয়ে ফেলেছি। থাকার মধ্যে আছে এ জানটা! এটা আর অসৎ কাজে ব্যয় করতে চাই না। এখন বিধাতার দেয়া এ প্রানটা নিয়ে আরেক মডেল

www.pathagar.com

হয়ে বাবা মার সামনে কাটিয়ে দেব আজীবন। হয়ত আমারই কারণে তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে। স্রষ্টাকে জানার জন্য চেনার জন্য আমার এ পঙ্গু দেহটা যে উৎকৃষ্ট মডেল হিসাবে বাবা মায়ের সামনে থাকবে তাতেও কি বাবা মা সংশোধন হবে না?

দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আজো ঝলক আপা প্রতিদিনের মত ভাবছে। তার দুচোখে কোন অশ্রু নেই। তার পরিবর্তে আছে সীমাহীন এক আনন্দ। কেন না আল্লাহ্ তালা দুচোখ বাঁচিয়ে দিয়েছেন বলেই হয় তো স্রষ্টার সৃষ্টি দেখে এতো তার আনন্দ। তার দুচোখ এখন শেষ বিকেলের সীমাহীন নীলের মাঝে নিবদ্ধ। এ ভাবেই সন্ধ্যা শুরু হবে রাত নামবে আবার ভোর হবে। সন্ধ্যার পরপরই নার্স এসে রুমে আলো জ্বালিয়ে দেবে। আলো জ্বালানোর সাথে সাথে তার ভাবনার জগতটা কোথায় যেন অদৃশ্য হযে যায়। অদৃশ্য জগতটা খুঁজে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তার মন। আজো রুমে আলো জ্বলে উঠলো। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলো ঝলক আপা, কেন বিরক্ত করেন বারবার! কতদিন না বলেছি রুমে আলো জ্বালানোর প্রয়োজন নেই? অন্ধকারের রূপ দেখতে আমার ভাল লাগে।

আসসালামু আলাইকুম।

কে? কে? কে সালাম দেয়?

আমি হাজেরা।

কাছে আসতো দেখি!

এইতো আমি আপা!

হাজেরা তুমি এসেছ? ঝলক আপা উঠতে যেয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করে আবার শুয়ে পড়লো, তা লক্ষ্য করে হাজেরা বললো, আপা উঠতে হবে না শুয়ে থাকুন। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন!

হাজেরা তুমি যখন বলছো তখন নিশ্চয় আল্লাহ্ তালা মঙ্গল করবেন। তবে আর আগের জীবনে ফিরে যেতে বলো না! সব হারিয়েছি তো কি হয়েছে এ জীবন আগের জীবনের চাইতে ভাল। স্রষ্টা আমাকে দয়া করেছেন হাজেরা। এ অধম কত পাপী তুমি জানো? জানো না! আর কিছু বলতে পারলো না শুধু কাঁদতে থাকলো। সে দিকে তাকিয়ে হাজেরা বললো,

অনুশোচনায় কাঁদছেন আপনি। এ কান্না সবার ভাগ্যে জোটেনা। আল্লাহ্ তালা আপনাকে দয়া করেছেন, প্রান ফিরিয়ে দিয়েছেন। ইহকাল হরিয়েছেনতো কি হয়েছে পরকাল আপনার কাছে সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে।

এটা আল্লাহ্ তালার অশেষ মেহেরবানি আর আশার কথা তুমি তো জানোনা হাজেরা! আঃ কত মেয়ের সর্বনাশ আমি করেছি কুইটদের সাথে চলতে যেয়ে। আর কথা বলতে পারলোনা ঝলক আপা। এক অবরুদ্ধ কান্নায় তার দেহমন থর থর করে কেঁপে উঠতে লাগলো।

www.pathagar.com

এ-আপনি কি করছেন? যান রুম ছেড়ে বের হয়ে যান। উনি সুস্থ হলে আসবেন। উনার শরীরে অনেক ক্ষতি হচ্ছে কষ্ট পাচ্ছে।

চুপ করুন নার্স! কাকে কি বলছেন? এ আমার আত্মিক বন্ধু পরকালের সঙ্গী। একে চিনে রাখুন। আমার বাবা মাকে প্রয়োজন নেই, একে প্রয়োজন। এর নাম হাজেরা, ও-ই শুধু আসবে। সবার সাথে আমার শারীরিক সম্পর্ক অর্থাৎ লেনদেনের সর্ম্পক, এর সাথে শুধু আত্মিক সম্পর্ক। নার্স আপনি এখন আসতে পারেন।

আপা আগের সব কথা ভুলে যান, ক্ষমা করে দিন নার্সকে। নার্সের আর দোষ কি! উনার চাকুরীর প্রধানতম কাজ হচ্ছে আপনাকে শারীরিক ভাবে সুস্থ করে তোলা। এটা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। আজ উঠতে হবে আপা!

এখনি যাবে?

হ্যাঁ আপা, তাড়াতাড়ি হলে ফিরতে হবে। এই বইগুলো রাখুন। এটা ইসলামের জীবন দর্শনের উপর লিখা। এ বই থেকে আত্মিক বিশ্লেষণ পাবেন। আর এ বইগুলো শরিয়তের হুকুম আহকামের ওপর লেখা। শরিয়তের হুকুম আহকাম সঠিক ভাবে জানা এবং মানা আল্লাহ্‌র বান্দার প্রধানতম কাজ।

হাজেরা! আমার যে দুটি হাত নেই কি করে বই ধরবো?

বাহুতো আছে! নার্সকে বলবেন একাজে সাহায্য করতে। সব হারিয়ে আল্লাহতালা যে বস্তু আপনাকে দান করেছেন তার তুলনা নেই।

হাজেরার কথা শুনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো ঝলক। কাঁদতে কাঁদতে বললো, আজ তোমাকে বড্ড আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করছে আমার। স্রষ্টার কি ইচ্ছা! যখন হাত পা ছিল তখন আলিঙ্গন করতে ইচ্ছা করেনি, তোমাদের ধ্বংস চেয়েছি। আজ ইচ্ছা করছে।

ঝলক আপা আত্মার মরন নেই, দেহের মরন আছে, তাই দেহকে কষ্ট দিয়ে আত্মাকে জাগিয়ে তুলুন। মরনের পরেই পৃথিবীর সঠিক ব্যাখ্যাটা হাতে পাওয়া যায়। তাই বেঁচে থাকা অবস্থায় আত্মার মূল্যায়ন করতে হয়। আসি আপা! আমার জন্য দোওয়া করবেন।

আবার আসবে তুমি! কবে আসবে হাজেরা?

আল্লাহ্‌তালা যেদিন চান সেদিন নিশ্চয়ই আসবো।

হাজেরা রুমের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও।

তাই হবে। আল্লাহ্‌ হাফেজ।

আল্লাহ্‌ হাফেজ।

www.pathagar.com

একজন রহমত আলী

সালেহ মাহমুদ

এক বিশাল শূন্য প্রান্তরে বসে আছি আমি। অপেক্ষা করছি কোন অলৌকিক ঘটনার। কারণ এ ছাড়া আমার আর কোন উপায়ও নেই। আমার এ করুণ পরিণতির জন্য একমাত্র আমার ভাগ্যই দায়ী। আর কেউ নয়। কিভাবে যে কি হয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। যখন বুঝতে পারলাম তখন দেখি আমার সমানে এক শূন্য প্রান্তর অপেক্ষা করছে।

.....এক মিনিটি প্লিজ। একটা কল এসেছে মোবাইলে।

ওয়ালাইকুম সালাম। আমি.... ও প্রান্ত থেকে যে কি নাম বলল বুঝতে পারলাম না। শুধু বুঝলাম একটা পুরুষ কণ্ঠ কথা বলছে। নামটা পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য আবারো জানতে চাইলাম– কে বলছেন?

আমি রহমত আরী বলছি স্যার, চিনতে পারছেন স্যার।

ও.. চিনেছি। তা কি খবর বল্। আমার কাছে তোর কোন পাওনা আছে নাকি?

না স্যার, কি যে বলেন। আমারে চিনছেন তো স্যার? আমি ক্লিনার রহমত আলী। আপনে যখন সোনার তরীতে ছিলেন, তখন আমি সেখানে ক্লিনার হিসেবে কাজ করতাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিকই চিনেছি। সে জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি, তোর কাছ থেকে আমি কোন ধার-টার নিয়েছিলাম কিনা কখনো?

কি যে কন স্যার। আপনে আমার কাছ থেইকা টাকা ধার নিবেন কেন? বরং আমিই তো স্যার আপনার কাছ থেইকা দুইশ টাকা ধার নিছিলাম। ঐ টাকাটা তো এখনও দেই নাই। স্যার, আপনের সাথে আমার জরুরী দেখা করা দরকার। আপনের বাসায় আসমু, স্যার?

না, বাসায় না। তুই আমার কাছে কোন টাকা না পেলে বাসায় আসার দরকার নেই। বরং আমাদের বাসার পশ্চিম দিকে যে খেলার মাঠটা আছে না, ঐখানে চলে আয়। ঠিক আছে?

ঠিক আছে স্যার।

আসার আগে একটা রিং দিস, হ্যাঁ।

ঠিক আছে স্যার, খোদা হাফেজ।

হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম! ওহ্ হো, ভুলেই গেলাম। যাক, অন্য কথায় আসি। আপনার নিশ্চয়ই এই রহমত আলী সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছে করছে। কিংবা আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আমি কেন ফোন ধরেই পাওনার কথা বললাম? হাহ্ হাহ্ হাহ্....। আপনার মনে প্রশ্ন তোলার জন্যই তো আমি এভাবে কথা বলেছি। সবই বলবো আপনাকে। তবে প্রথমে ক্লিনার রহমত আলীর কথাই বলি।

www.pathagar.com

রহমত আলীর নাম আসলে ছিল রমইত্যা। অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ার পর তার আর পড়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সে খুব সুন্দর বাংলা পড়তে পারে। হাতের লেখাও মন্দ না। এ জন্য সে একটু বড় হয়ে কাজের সন্ধানে ঢাকা এসে নিজেকে এইট পাশ বলে জাহির করে। আমি তখন আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চাকুরী নিয়ে ফার্মগেটে যাতায়াত করি। ভয়ঙ্কর বললাম এ কারণে যে, এখানে চাকুরী করার সময়ই আমি তিরিশ লক্ষ টাকার ফেরে পড়ে যাই। যে টাকা আমার সারা জীবনেও শোধ করতে পারব কিনা কে জানে!

সে যাক, আমি তখন সোনার তরী এন্টারপ্রাইজের চীফ ফাইন্যান্স অফিসার। এম.ডি. স্যার আমাকে খুব বেশি পছন্দ করতেন। তখনই একদিন ঘটনাক্রমে রহমত আমার সামনে পড়ে। ঘটনাটা হলো, আমি বাস থেকে নেমে যখন অফিসে যাচ্ছিলাম তখন এক ছিনতাইকারী হঠাৎ করে ছোঁ মেরে আমার চোখ থেকে চশমা নিয়ে দৌড় দেয়। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি একটি ছেলে সেই ছিনতাইকারীকে জাপটে ধরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, ধরছি ধরছি.....। তারপর তো যা হবার তাই হলো। চশমাটা অক্ষত ফিরে পেলাম, কিন্তু ছিনতাইকারী অক্ষত থাকতে পারলো না। আর সেই ছেলেটা দাঁত কেলিয়ে হেসে আমার কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, স্যার আমনে কি কোন অফিসের বস্ নি?

আমি বললাম, তোমাকে আমার ধন্যবাদ দেয়া দরকার।

বলে আমি বেশ ভনিতা করেই বলি, ধন্যবাদ। তুমি যদি ছিনতাইকারীকে ধরতে না পারতে তাহলে আমাকে আগামী বেতনের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। এখন কি তুমি আমার কাছ থেকে কিছু আশা করছ? তুমি যদি আমার কাছে খুব বেশি কিছু আশা কর, তাহলে তা হয়তো আমি পূরণ করতে পারব না। কিন্তু খুব ক্ষুদ্র হলে আমি চেষ্টা করতে পারি।

আমার কথা শুনে ছেলেটা হেসে ফেলে বলল, আমার নাম স্যার রমইত্যা। আমি এইট পাশ। একটা চাকরী আমার খুব দরকার স্যার। এইল্যেইগাই আমি আমনেরে জিগাইলাম আমনে কোন অফিসের বস্ নি?

বিষয়টা আমার কাছে সিনেমার দৃশ্যের মতোই মনে হলো। একটা চাকরী সন্ধানী ছেলে একজনের ছিনতাইকৃত দ্রব্য উদ্ধার করে মালিকের কাছে তা ফিরিয়ে দিলো আর মালিক তাকে একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দিলেন, বাহ্ চমৎকার, তাই না। আমি হেসে ফেলে বললাম, এই ছেলে, তুমি যা ভাবছ আমি আসলে সে রকম কেউ না। তবে তুমি যে সাহস দেখিয়েছ তাতে তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি কি আমার বাসায় আমার সাথে ডাল-ভাত খেয়ে থাকতে পারবে? কোন বেতন দিতে পারব না কিন্তু।

ছেলেটা কিছু না ভেবেই বলে উঠলো, আমনেরে আল্লায় অনেক বড় করুক, আমি রাজি স্যার।

www.pathagar.com

সেই থেকে রমইত্যা আমার বাসায় থাকতে শুরু করল। এরই মাস তিনেক পরে হঠাৎ করেই একদিন আমার বস আমাকে ডেকে বলল, আমাদের ক্লিনারটাকে বোধ হয় আর রাখা যাবে না, ও চুরি-টুরি শুরু করেছে। আপনি এক কাজ করুন, ক্লিনার হিসেবে কাজ করতে পারে এমন একটি ছেলে খুঁজে বের করুন।

আমি রমইত্যাকে বলতেই সে লাফিয়ে উঠে আমার কদমবুসি করলো।

আমি তাকে বললাম, কিন্তু তোর এই নাম তো পাল্টাতে হবে। তোর বাপ তোর নাম কি রেখেছিল বলতে পারিস? সে মাথা নেড়ে জানালো সে জানে না। আমি ভেবে দেখলাম তার নাম হয়তো রহমত ছিল, সেটারই বিকৃত রূপ রমইত্যা। তাই আমি তার নাম সংশোধন করে রাখলাম রহমত আলী। নাম সংশোধনের সাথে সাথে তার আবাসস্থলেরও পরিবর্তন হলো। সে থাকতে শুরু করলো সোনার তরী এন্টারপ্রাইজ অফিস সংলগ্ন একটি অপরিসর রুমে।

এখানেই রহমত আলী প্রসঙ্গ শেষ হতে পারতো। কিন্তু না, এরপরই শুরু রহমত আলীর উত্থান-পতনের ইতিহাস। সোনার তরীতে চাকুরী সুবাদে তার চেহারায় জৌলুস চলে আসে। আর তার গ্রামের বাড়িতে নিজেকে জাহির করতে শুরু করে সে অনেক বড় চাকুরে হিসেবে। এই পরিচয় তুলেই তার বাবা তার জন্য ইন্টার পাশ এক মেয়ের সাথে তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। যথারীতি বিয়ে হয়ে যায় তার, বড় অংকের যৌতুক নেয় রহমত আলী। দু'বছর যেতে না যেতেই তার ঘর আলো করা এক মেয়ের জন্ম হয়। আর কিভাবে কে জানে রহমত আলীর চরিত্রে ধ্বস নামতে শুরু করে।

ফার্মগেট এলাকায় কিভাবে যেন এক গার্মেন্টিস কর্মীর সাথে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তা প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়। রহমত আলীর কাছে তখন তার স্ত্রী-সন্তান হয়ে পড়ে অনাগ্রহের বস্তু। একদিন গোপনে কাউকে কিছু না জানিয়ে এই মেয়েকে বিয়ে করে এনে তোলে সোনার তরী অফিসের সেই অপরিসর কক্ষে।

পরদিন বিষয়টা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর আমি তাকে প্রচণ্ড ধমক লাগাই। এম.ডি. স্যার তাকে তাৎক্ষণিকভাবে কিকআউট করতে চাইলেও পারলেন না। নতুন একজন ক্লিনার ঠিক করে এক সপ্তাহ পর তাকে বিদায় করে দেয়া হয়। এরপর রহমত আলী চলে যায় পর্দার অন্তরালে। আমি আর তার কোন খোঁজখবর রাখিনি এবং রাখার প্রয়োজনও মনে করিনি।

প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা এসব। আজ আবার কেন সে আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইছে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। দেখা যাক কি বলতে চায় সে। ও ভালো কথা, আমি বলতে ভুলেই গিয়েছি যে, রহমত আলী কিন্তু আর সেই ছাপোষা রহমত আলী নেই। সে এখন রীতিমতো একটা পাজেরো আর কয়েকটা বাড়ির মালিক এই ঢাকা শহরে। চুলোয় যাক তার এতসব টাকা-কড়ি। আমার কি! সে কি আমাকে তার সম্পদ থেকে একটুও ভাগ দেবে? হুহ্, নিশ্চয়ই না। তাহলে আমি তার ঐশ্বর্যের কথা ভাববো কেন? কেনই বা এ কথা ভেবে কষ্ট পাবো যে, একদিন যে আমার বাড়িতে আশ্রিত ছিল এখন সে কোটিপতি আর আমি ভিখারির মতো! না, কোন প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেছে এর মধ্যে। আমি রহমত আলীর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাত আটটায় সে আবার আমার মোবাইলে কল করে। অপরিচিত নাম্বার দেখে আগ্রহ দেখাতে না চাইলেও মোবাইলের চিৎকার থামাতে ওকে গলা টিপে ধরতেই হলে। আর রহমত আলীও ঔৎসুক্য নিয়ে প্রশ্ন করে বসলো, স্যার কি শুইয়া পড়ছিলেন নাকি? ধরতে এত দেরি করলেন যে!

আরে না, তুই আমার ঘুমের অভ্যাস জানছ না? ঐ অভ্যাসটা এখনো বদলায় নাই রে। এমনেই ভাল্লাগতাছিল না। আচ্ছা, এখন বল ফোন করেছিস ক্যান?

স্যার, আমি করিমের হোটেলে বইয়া চা খাইতাছি। আপনে যদি মাঠে আসেন তাইলে দুইটা কথা কইতাম।

কী...., তুই করিমের হোটেলে বইয়া চা খাইতাছছ, আর আমার বাসায় আইতে পারলি না?

আপনেই তো না করলেন আমারে আইতে। এইল্যেইগাই তো আমি আপনের বাসার গেট থেইকা ফেরত আইছি।

দুর হারামজাদা। একবারে থাপ্পর দিমু একটা। কবে কি কইছি না কইছি হেইডাও মনে রাখছস। আয়, আমার বাসায় আয়।

আমার গালি শুনে রহমত আলী খুব মজা করে হেসে ফেলে। বলে, ঠিক আছে স্যার আইতাছি।

করিমের হোটেল আমার বাড়ি থেকে দুইশ/আড়াইশ গজ দূরে। খুব ভালো চা বানায়। সেই ছোটবেলা থেকেই আমি এই হোটেলের চায়ে আসক্ত। রহমত আলী যতদিন আমার বাসায় ছিল ততদিন সে একবারের জন্য হলেও এই হোটেলে যেতো চা আনতে। সেই সুবাদে হোটেলের ম্যানেজার-মালিক এদের সাথেও তার বেশ জানাশোনা হয়ে যায়।

আমি আড়মোড়া ভেঙ্গে শার্টটা গায়ে চড়াতে না চড়াতেই বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ পেলাম। মাথার চুলে চিরুনি চালানো শুরু করতেই কলিং বেল বেজে ওঠে। আমার অপরিসর বাড়ির অপরিসর ড্রয়িং রুমের দরজা আলগোছে খুলতেই আমি দেখতে পেলাম এক সুদর্শন নাদুশ-নুদুশ ভদ্রলোক আমার দরজার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি হোঁচট খাই। এই কি আমাদের রহমত আলী! একেবারে চেনাই যায় না। আমি দোনোমোনো করছি দেখে সে একগাল হেসে সালাম দিয়ে ওঠে, স্লামালাইকুম স্যার, বালা আছেন তো স্যার?

আমি কি বলবো না বলবো করতে করতে বলেই ফেলি, তুই কি রমইত্যা? আমার রহমত আলী!

সে হেসে ফেলে আমাকে কদমবুসি করে। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরি। কেন জানি কে জানে, রহমত আলী আমাকে জড়িয়ে ধরেই কেঁদে ফেলে। আমার ভেতরটা নড়বড়ে হয়ে যায়। বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড! আরে তুই কান্দস ক্যান?

www.pathagar.com

রহমত আলী চোখ মুছতে মুছতে হাসে। এমনেই স্যার, অনেক দিন পরে আপনের দেখে কান্দন আইয়া পড়লো।

আয়, ব তুই। এহেনে ব। আমার পুরনো কাঠের সোফার একদিকে ওকে বসতে বলে মাঝখানে আমি বসে পড়ি। রহমত বসতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, এক মিনিট স্যার।

বলেই সে হুট করে বাইরে চলে যায়। ফিরে আসে সাথে সাথেই। আর তার পিছন পিছন ড্রয়িং রুমে এসে ঢোকে আরো দুজন লোক। তাদের দুজনের হাতেই বিশাল বিশাল দুটো প্যাকেট। আমার চোখে ঘোর লেগে যায়। ঘোর কাটতে না কাটতেই প্যাকেট দুটো টেবিলের ওপর রেখে দ্রুত বের হয়ে যায় লোক দুটো। রহমত হাসতে হাসতে বলে, স্যার আপনার জন্য সামান্য উপহার। দয়া করে ফেরত দেবেন না স্যার।

আমার বিস্ময় আরো বেড়ে যায়। মুখের ভাষাও কি দারুন পাল্টে ফেলেছে রহমত! অথচ আমার সাথে সেই ঘরোয়া ভাষায়ই কথা বলল এক্ষুণি। আমি সত্যি সত্যি খুব বিস্মিত হলাম। কি এমন যাদুর ছোঁয়ায় এমন বদলাতে পারে মানুষ! আরে রহমত, আমি তো এখনও পারলাম না নিজেকে পাল্টাতে। তুই কি করে পাল্টালি!

রহমত হয়তো আমার চিন্তা বুঝতে পারে। লাজুক হেসে বসতে বসতে বলে, আমি অনেক বদলাইয়া গেছি, না স্যার! বদলাইতে তো হইবই। না বদলাইলে কি আর টিকন যাইব এই ঢাকায়। এই যে দেখেন স্যার, আমি আপনের আশ্রয়েই এই ঢাকা শহরে বসবাস করতে শুরু করি। আপনি যদি ঐদিন আমারে জায়গা না দিতেন, তাইলে মনে অয় আমার ঢাকা ছাড়তে অইতো। আর আপনে কিন্তু স্যার যেই রকম ছিলেন ঐ রকমই আছেন। জানি না, হয়তো অবস্থা তার চাইতেও খারাপ আপনের। মাইণ্ড কইরেন না স্যার। আমি কি ঠিক কইছি?

আমি ওর কথায় রাগ করতে পারি না। রাগ করিই বা কি করে! আমি তো আসলেই খুব খারাপ অবস্থায় আছি। কোন কথা বলতে পারি না সহসা। বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আমার। আচ্ছা, আপনি কি অনুভব করতে পারছেন আমার এই দীর্ঘশ্বাস? .....যাহ, কি সব বলছি। আপনি আমার দীর্ঘশ্বাস অনুভব করবেন কিভাবে? আপনি তো আর আমার অবস্থানে নেই। আপনি তো একজন শ্রোতা মাত্র।

যাই হোক, আপনাকে স্পর্শ না করলেও আমার দীর্ঘশ্বাস কিন্তু রহমত আলীকে ঠিকই স্পর্শ করে। সে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, স্যার কি আমার কথায় মনে কষ্ট পাইলেন?

আমি মাথা নাড়ি, নাহ্। তোর কথায় কষ্ট পাবো কেন? তুই তো সত্যি কথাই বলেছিস।.....আচ্ছা বল, তুই আমার সাথে দেখা করার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিস ক্যান?

অনেক কথা স্যার। বলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেও। মাথা চুলকিয়ে কি যেন ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, যে জন্য দেখা করমু ভাবছিলাম সেইটা নিয়া আর কোন কথা কইতে ইচ্ছা করতাছে না স্যার। তার চাইতে ভালো আপনের কথা কন স্যার। ভাবি-বাচ্চারা মনে হয় বাসায় নাই, তাই না স্যার?

www.pathagar.com

না, বাসায় নাই। তোর ভাবি গেছে বাপের বাড়ি। আরো সপ্তাহ খানেক থাকবে।

এতক্ষণ পর আমার খেয়াল হয় যে, আমি রহমতকে এখনো কোন আপ্যায়ন করাইনি। ব্যাপারটা কেমন হয়ে যাচ্ছে না, ভেবে আমি বলি, তুই বস আমি একটু ভিতর থেকে আসি।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই লাফিয়ে ওঠে রহমত। না স্যার ভিতরে যাইবেন না। আমি কিচ্ছু খামু না। আপনে এইখানে বন। দুইডা কথা কই।

বলে সে জোর করে আমাকে সোফায় বসিয়ে দেয়। আমার ভিতরটা খচখচ করতে শুরু করে। কি করব আমি। রহমত আমাকে আর উঠতে দেবে না আমি নিশ্চিত। তারপরও আমি বলি, শোন, তুই এতদিন পর আমার বাসায় এসেছিস, কিছু না খেলে কেমন দেখায় বল।

না স্যার আমি কিছু খামু না। আপনের কথা শুনি। আপনের চাকরী কেমুন চলতাছে স্যার?

ওর কথা শুনে আমার বুকের ভেতর থেকে আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কি বলব আমি! আমি যে একটি হুলিয়া মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছি! চাকরী করছি শুধু নিজেকে বাঁচানোর জন্য। আমি মৃদু হেসে বলি, এই চলছে আর কি।

রহমত আলী স্নিগ্ধ হাসে। আমার কাছে তার হাসির অন্য কোন অর্থ প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু বুঝতে পারি না সে কি বোঝাতে চাচ্ছে। তাহলে কি আমার অফিস সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সে জানে? হয়তো বা। সে বলে, স্যার কিছু মনে করবেন না। আমি কিছুদিন আগে একবার আপনের অফিসে গেছিলাম। তখন শুনলাম আপনি ছুটিতে আছেন। আর ঐ যে ওয়াহেদ সাহেব, উনি আপনের ব্যাপারে অনেক কিছু বললেন আমাকে। আমি জানি আপনের সাথে ঐ ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু কেমনে কি হইল স্যার?

এতক্ষণে আমার কাছে তার বিষয়টা পরিষ্কার হয়। সে আসলে এ বিষয়টা নিয়েই আমার সাথে কথা বলতে এসেছে। কিন্তু কিভাবে কথাটা পাড়বে বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ সুযোগ পেয়ে আর দেরি করেনি তাই। আমি কিছু না বলে শীতল দৃষ্টিতে তাকাই তার দিকে। আমার দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন কিংবা অবজ্ঞা অথবা দুটোই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন মিইয়ে যায় রহমত আলী। হয়তো নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে অথবা দয়া করে মাফ করে দিন কিংবা না না ঠিক আছে ও কিছু না– জাতীয় ভঙ্গি ফুটে ওঠে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে। আমি নিরুপায় ভঙ্গিতে হেসে ফেলি। বলি, আমি অর্থ আত্মসাৎ করেছি এটা তুই বিশ্বাস করতে পারছিস না, নাকি ব্যাপারটা কিভাবে ঘটলো তা জানতে চাচ্ছিস, কোনটা?

দুইটাই স্যার। প্রথমে তো বিশ্বাস না করাটাই উচিত। আর যদি বিশ্বাস করতেই হয় তাইলে এইখানে কিন্তু আছে, সেই কিন্তুটাই জানতে চাই স্যার।

ওর কথা শুনে আমার মেজাজটা খিঁচড়ে ওঠে। কঠিন স্বরে আমি তাকে প্রশ্ন করি, ক্যান, জানতে চাস?

www.pathagar.com

না স্যার আপনেরে খালি খালি জ্বালানের লাইগ্যা আমি আসি নাই। কারণ তো অবশ্যই আছে।

তার কথা শুনে আমার কেমন কেমন লাগে। আমার ঐ দুর্ঘটনার পর এ পর্যন্ত কেউ আর এত আন্তরিকতা নিয়ে আমার সাথে কথা বলেনি। সবাই কেবল ফিস ফাস করে দূরে সরে গেছে। আড়ালে আবডালে ঘৃণা ছড়িয়েছে। একজন আরেকজনকে সতর্ক করেছে যেন আমাকে টাকা ধার না দেয়। কারণ আমার যে অবস্থা! হয়তো আমি আর সে টাকা ফেরতই দিতে পারবো না। অথচ বিশ্বাস করুন, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে আমার কাছে টাকা পয়সা পাবে। আমি কিন্তু অনেকের কাছেই টাকা পাই। যে যখনই আমার কাছে হাত পেতেছে তখনই আমি আমার পকেট খালি করে দিয়ে দিয়েছি। প্রয়োজনে অন্যের কাছ থেকে ধার করেও টাকা দিয়েছি। অনেক সময় সে টাকা ফেরত পেয়েছি, অনেক সময় পাইনি। আর এই না পাওয়া নিয়ে কখনো কারো কাছে অনুযোগও করিনি। আমি জানি আপনি বিশ্বাস করবেন না, তবুও বলি– এমন অনেক বার হয়েছে যে, আমি বেতনের পুরো টাকাটাই ধার দিয়ে ফেলেছি। আর সে টাকা বেশির ভাগ সময়ই ফেরত পাইনি। আমার সংসার খরচ! চালিয়ে নিয়েছি কোন রকম। স্ত্রীর চাহিদা মেটাতে পরিনি, ভালোবাসা দিয়ে পূরণ করেছি সে শূন্যতা। সন্তানের চাহিদা মিটাতে না পারলে ওদের সাথে এমন পাগলের মত খেলতে শুরু করেছি যে, ওরা ভুলেই গেছে কি চেয়েছিল। এই হলাম আমি। বিশ্বাস না হয় তো এই রহমত আলীকেই জিজ্ঞেস করুন না, এই এখুনি। শুনুন তার মুখ থেকেই।

যাক সে সব, নিজের ঢোল নিজে পিটানো একদমই ঠিক না। কথায় কথায় আপনাকে বলে ফেললাম আর কি। কিছু মনে করবেন না। ব্যাপারটা খারাপ লাগলে আমার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিন, আমি কিছুই মনে করবো না, বরং ধন্যবাদ দেবো- হাহ্ হাহ্ হাহ্.....।

কি কাণ্ড দেখুন। আপনার সাথে কথা বলতে গিয়ে আমি বেমালুম ভুলে যাই রহমত আলীর কথা, অট্টহাস্যে ফেটে পড়ি, আর রহমত আলী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। আমার হঠাৎ করেই চোখ যায় সেদিকে, আর আমি একটু ধাতস্থ হই। রহমত আলী খুব ধীরে বলে, স্যার কি কিছু ভাবতাছিলেন?

নাহ্। একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথেই শব্দটা উচ্চারণ করি। বলি, আমার মাথায় তো সারাক্ষণ একটাই চিন্তা, কেমনে পার পামু। আচ্ছা রহমত, তুইই বল, এতবড় শাস্তি পাওয়ার মতো মানুষ কি আমি?

রহমত মাথা নীচু করে ফেলে। বলে, না স্যার, কিন্তু বিষয়টা তো ঐ রকমই প্রমাণ হইল।

প্রমাণ!.... সবার সামনে অস্ত্রের মুখে আমার কাছ থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে গেলো, অথচ প্রমাণিত হলো ওদের সাথে আমার যোগসাজশেই হয়েছে এটা! দুনিয়াটা কি বিচিত্র রে রহমত, কি বিচিত্র! বলেই আমি আমার নিজের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চেষ্টা

www.pathagar.com

করি। আমার কেমন অস্বস্তি লাগতে শুরু করে, কেমন ছটফটানি শুরু হয় আমার ভিতর, বুঝি না। কেন যেন ডাঙ্গার কৈ মাছের মতো অসহায় লাগতে শুরু করে আমার নিজেকে। আমার মনে হচ্ছে, কৈ মাছের মতো মাটি ঘেঁষে নতুন কোন জলাশয়ের সন্ধান করছি আমি। আমি ভুলে যাই স্থান-কাল-পাত্রের কথা, কেঁদে উঠি হু হু করে।

রহমত আমার কাঁধে সান্ত্বনার হাত রাখে। ধরা গলায় বলে, স্যার, অভয় দিলে আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে, বলব স্যার?

বলে সে আমার দিকে তাকায় গভীর আগ্রহে। আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলি না শুধু তাকাই তার দিকে। দেখি, পরম আগ্রহে তাকিয়ে আছে রহমত। মৌন সম্মতি পেয়ে বলতে শুরু করে রহমত, আপনের তিরিশ লাখ টাকাই আমি দিয়ে দিতে চাই স্যার। আপনি কি নিবেন স্যার? যদি কোনদিন পারেন ফেরত দিবেন, আর না পারেন কোন দাবী নাই। ঐ যে স্যার সোনার তরীর চাকরী চইলা যাওনের পর আপনে যে দুইশ টাকা দিছিলেন, মনে আছে স্যার? ঐদিন আপনে আমারে যেই কথা কইছিলেন ঠিক ঐ একই কথা আমারও স্যার। পারলে ফেরত দিবেন, না পারলে কোন দাবী নাই। ...নিবেন স্যার আমার টাকা। এক্‌বারে হালাল টাকা স্যার.....।

আরো কি কি বলতে থাকে রহমত আলী। কিন্তু আমার মাথায় কিছুই ঢোকে না। স্মরণ করতে চেষ্টা করি রহমত আলীর দুইশ টাকার ঘটনাটি। হ্যাঁ মনে পড়েছে। ওর চাকরি চলে যাওয়ার ক'দিন পর সে আমার বাসায় এসে দেখা করে। তার দূরবস্থার ফিরিস্তি দিয়ে আমার কাছে দুশ টাকা ধার চায় পান-সিগারেটের ব্যবসা করবে বলে। আমি তাকে এমনিই দিতাম। কিন্তু একটু শাসন করতে ইচ্ছে হলো বলে টাকা দেয়ার আগে বললাম, টাকাটা কিন্তু এমনি এমনিই দেই নাই, ধার দিলাম। ব্যবসা কইরা লাভের অংশ থেকে ফেরত দিবি। আর যদি মনে করস দিবি না, তাইলে কোন দাবী রাখমু না আমি, যা। সেদিন সে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গিয়েছিল আমার বাসা থেকে। শুধু বলেছিল, স্যার দোয়া কইরেন, য্যান্ আমনের টেকা লাভসহ ফেরত দিতাম পারি।

ঘটনাটি মনে পড়তেই হঠাৎ করে যেন একটা বজ্রপাত হলো আমার মাথায়। এ কী বলছে রহমত! আরে শুনুন, শুনুন, রহমত আমাকে তিরিশ লাখ টাকা অফার করছে, তাও আবার বিনা দাবীতে! এও কি সম্ভব? আমি দিশেহারা হয়ে যাই। এ রকম অসম্ভব প্রস্তাবে তো আমার পাগল হওয়ারই কথা। কি করি আমি এখন! আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, রহমতের কাছ থেকে টাকা নেওয়া কি ঠিক হবে আমার? এই টাকা নিয়ে যদি আমি সোনার তরীর সাথে আমার সমস্ত ঝামেলা মিটিয়ে ফেলি, তাহলে টাকা ছিনতাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক আরো জোরালোভাবে প্রমাণিত হবে! আর ঝামেলা না মিটালে আমাকে সারা জীবন একটা অসহনীয় অভাবের তাড়নায় ছুটতে হবে দিগ্বিদিক। আমার এখন কি করা উচিত? জানি না আমি, জানি না, জানি না.....। আচ্ছা, আপনি কি এ প্রশ্নের কোন সমাধান দিতে পারেন? পারলে তাড়াতাড়ি দিন। ঐ যে দেখুন না রহমত আলী আমার দিকে আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে.....।

www.pathagar.com

সাহিত্য প্রচেষ্টা

ওমর বিশ্বাস

মানব সভ্যতা গঠনের পিছনে যে সব বিষয় জড়িত তার মধ্যে সাহিত্য একটি। সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ও বিস্তৃতি এবং এর সামগ্রিক ভূমিকার আলোকে আমরা বলতে পারি সভ্যতার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করার পিছনে এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী নিয়ামকও। সাহিত্য মানুষের কথা বলে। মানুষের গান গায়। সাহিত্য সৃষ্টিই হয় মানুষকে জানানোর জন্য। এর দ্বারা মানুষ আলোড়িত হয়। প্রভাবিত হয়। অনুপ্রাণিত হয়। এসবই হয়, যদি সাহিত্য হয় সৎ, রুচিশীল, সুন্দর, শ্লীল বা নান্দনিক। ঠিক বিপরীত ক্রমে মানুষ রুচিহীন, অশ্লীল কিংবা সাহিত্য সৃষ্টির আজে বাজে লেখনির মাধ্যমে খারাপভাবেও প্রভাবিত হতে পারে। যদি সেটা হয় শক্তিশালী সাহিত্য বা শক্তিশালী সাহিত্যিকের সৃষ্টি। তবে এই স্তরের ভূমিকা খুব যে বেশি তাও নয়।

সাহিত্য কি? এখন সে প্রশ্ন আসতে পারে। আসতে পারে সাহিত্য কেন, কিসের জন্য বা কাদের জন্য? প্রশ্ন হতে পারে জীবনের জন্য সাহিত্য না শিল্পের জন্য সাহিত্য? জীবনের জন্য বা শিল্পের জন্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবন কি, জীবন বা শিল্প কি, এই প্রশ্ন আসতে পারে। তবে আমরা এখানে জীবন বা শিল্পের এমনকি সাহিত্যেরও কোনো প্রকার সংজ্ঞাতে যাচ্ছি না। কিংবা জীবন না শিল্প এই তর্কেও যাব না। আমরা এখানে শিল্পের জন্য সাহিত্যকে বিবেচ্য না ধরে জীবনের জন্য সাহিত্য এই বিবেচনাকে সামনে রাখব। আমরা জীবন ও মানব সভ্যতা কেন্দ্রিক সাহিত্যকে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক কিছু বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করব।

নদী বা সাগরের উৎস যেমন পাহাড়, সাহিত্যের উৎসকে আমরা মানুষই ধরে নেব। কেননা মানুষ তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই সাহিত্যের উপাদান তৈরি করে। জ্ঞান আসে পাঠ আর অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে। দৃষ্টি, জানা শোনা, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন হতে পারে। এই জ্ঞানের পিছনে মানুষ। আর মানুষই সর্বোপরি সাহিত্য তৈরি করে থাকে। তাও আবার সেটা মানুষের জন্যই। মানুষই মানুষের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করে। মানুষই সে সাহিত্যের পাঠক। মানুষই সৃষ্টির আশরাফুল মখলুকাত। সে পড়তে পারে লিখতে পারে। তার জ্ঞান আছে। বিচার বুদ্ধির ক্ষমতা আছে। মানুষই পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে সামনের দিকে পদক্ষেপ ফেলে। সৃষ্টিকর্তা, মহান প্রভু আল্লাহ মানুষকেই তাঁর সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার অপার্থিব জ্ঞান দিয়েছেন। এসব অন্য কোনো সৃষ্টির ভাগ্যে জোটেনি মানুষ ছাড়া। এই মানুষই স্বাধীন মতামত দিতে জানে। নিতে জানে। সে অন্যের উপর তার মনের আকুতি জানাতেও পারে। তার প্রতি এ জন্য চাপও সৃষ্টি

www.pathagar.com

করতে পারে। এক্ষেত্রে তার জন্য পাশব গুণাবলী আত্মস্থ বা ধারণ করার স্বাধীনতাও রয়েছে। তবে এ ধনাত্মক বিশ্লেষণে না গিয়ে আমরা মানুষের সাহিত্যের দিকে নজর দেব।

আধুনিক সাহিত্য নানা রূপ বৈচিত্র নিয়ে এগিয়ে চলছে। আধুনিকতা সাহিত্যে কতটুকু আছে বা নাই তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সাহিত্যে বর্তমান জীবনের পুরো চিত্রই এই রূপ পরিগ্রহ করে আছে। এখানে জীবনের ক্লান্তি আছে। আশা আছে। নৈরাশ্য আছে। নৈরাশ্যবাদীরা এখানেই তাদের মওকা খুঁজে থাকে। কিন্তু তাদের আশান্বিত হবার কোনো কারণ নেই। কারণ পৃথিবীটা জুড়ে আশাবাদীরাই স্বপ্নের বুননে ভবিষ্যতের জাল বুনে থাকে। আবার আদম (আ.) সৃষ্টির আগে থেকে সৃষ্টিকর্তা মহান প্রভু আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী শেষ ফুৎকার পর্যন্ত টিকে থাকবে এই বিশ্ব। এই আশাবাদের মধ্যে অনস্তিত্ব অনাসৃষ্টি কিংবা বিশৃঙ্খলার প্রয়াস ঠুনকো মাত্র। অবশ্য সেটাও ইতিহাস বিনির্মাণে অংশ নেবে। সাহিত্য দেশ কালের সীমানা ছাড়িয়ে চলে। কালোত্তীর্ণ সাহিত্য কখনোই চাপা থাকে না। মানুষ তার সাময়িক তৃপ্তি-অতৃপ্তি বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ডামাডোল দমিয়ে রাখতে চাপা দিয়ে রাখতে পারে-তবে তা নিতান্তই ক্ষণিকের জন্য। সময় আপনা আপনিই কোনো মহৎ সৃষ্টিকে তুলে ধরে ইতিহাসে। সাহিত্যের ইতিহাসে তার বাকরীতি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্রোতের টানে নদীর পানি সাগরে মেশে। আজকের সাহিত্য চলতে চলতে আগামীতে গিয়ে অতীতের ইতিহাস হয়ে থাকবে। সাহিত্যে টিকে থাকবে সেই সব কালজয়ী সৃষ্টি যা মানুষ তার হৃদয়ে প্রোথিত চেতনার তুলি দিয়ে এঁকে চলে। বাস্তবে জীবন ঘনিষ্ঠ, মহা উদ্দেশ্যপূর্ণ রুচিশীল সৃষ্টিই তার আপন মহিমায় নিজের স্বরূপকে এখনো উন্নতশির করে রাখতে পেরেছে। কই কতই না আজেবাজে সৃষ্টি ক্ষণিক ঝড় তুলে দুনিয়া কাঁপানোর প্রয়াস পেয়েছে ঠিকই-কিন্তু তার স্থায়ীত্বের প্রশ্ন থেকে যায় আমাদের এই কথায়। গালা-গালি, বিদ্বেষ, আক্রোশ আক্রমণের সৃষ্টিগুলোতে নতুন প্রজন্মকে কেউ কি পড়তে বলে। স্যাটানিক ভার্সেসের যে কদর পাশ্চাত্যে দেখা গিয়েছিল আজ শুধু উদাহরণের জন্য তাকে টানা হয় বলে বলা যায়-কাল হয়ত উদাহরণও থাকবে না। তাহলে এই বাকরীতির তুল্যমূল্য কি, কিংবা কতটুকু? এই প্রশ্নও করা যায় মনিকা লিউনেস্কীর সাথে প্রণয়ের স্বীকারোক্তি যদি আত্মজীবনীতে করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে কেউ কি 'মাই লাভ' পড়তে তার প্রজন্মকে উজ্জীবিত বা অনুরোধ করবে? এ প্রসঙ্গে বলা অত্যুক্তি নয় যে ক্লিনটনের ঘটনা নৈতিকতাহীন মানসে, সমাজে ও লেখনিতে সম্ভব। কিন্তু সে বিশ্বাসী হোক, হোক না তার বিশ্বাসের ধরন অন্যের থেকে আলাদা— যে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, যে রুচিশীল তার দ্বারা এ কাজ কখনই কি সম্ভব? সেখানে শব্দালংকারপূর্ণ বাকরীতিতে কৌশলী হওয়া– সে প্রশ্ন না হয় এখানে নাই করা হলো। আসলে এ প্রবণতাকে ঠিক এখনই বন্ধ করা বা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। সমাজব্যবস্থার কাঠামোতে এমন সব উপাদান বর্তমানে যুক্ত হয়ে আছে যেগুলিকে পালিশ করতে হবে।

www.pathagar.com

নানা ভিড়ভাট্টায় যেমন অনেক আজেবাজে জিনিস থাকে তেমনি সেগুলিকে পরিচ্ছন্ন করাও সময়ের ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত সাহিত্যিক, সাহিত্যকর্মী ও সাহিত্য সেবীরা কখনোই বসে নেই।

সাহিত্য জীবনের। সাহিত্য মানুষের। মানুষই সাহিত্য রচনা করে। সাহিত্য রক্ত-মাংসের মানুষ তৈরি করে না। তবে তৈরি করে অমানুষকে মানুষ হিসেবে। ব্যক্তির অনুভূতি সাহিত্যে সঞ্চালিত হয়। কোনো কোনো মানুষ পাঠের পর নিজের রক্তের সাথে তাকে মিশিয়ে ফেলে। ফলে সেখান থেকে মানুষ তাকে নিজের উপযোগী করে গ্রহণ করে। শিখে থাকে। অন্যের জন্য সেখান থেকে খোরাক সরবরাহ করে। তার জন্য অবশ্যই সেই আবেগের শ্বেতকনিকা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাই মানুষ যেহেতু সাহিত্য সৃষ্টি করে সেহেতু তার সাহিত্য অনর্থের কাণ্ডারি না হওয়াটাই শ্রেয়। কেননা আপনি একটি জিনিস তৈরি করবেন। সেটা এর আগে কেউই করেনি। আপনি অবশ্যই চাইবেন আপনার কর্মটি প্রশংসিত হোক। আর ব্যক্তির ভিতর এই গুণটি যদি নাই থাকে তাহলে আপনি এই সুন্দর সমাজকে কেন আরো সুন্দর হতে দেবেন না, সে অধিকার তো আপনাকে দেয়া হয়নি। আপনার সৃষ্টিকর্ম অন্যের ভিতর প্রেরণা যোগাবে, প্রকৃত পক্ষে আপনি তা সৃষ্টি না করলেও অন্তরে তো সেটাই চান। তাহলে ভিতর বাইরের এই বৈপরিত্য আপনার মধ্যে কেন থাকবে, কেন দেখা দেবে? এ বিষয়টিও একজন সাধক একজন উদ্ভাবক, একজন সৃষ্টিশীল কর্মী হিসেবে আপনাকে অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে। কারণ মানুষ আপনি নিজেই, আপনার সাহিত্যও আপনার মতো মানুষকেই পাঠক বানাতে চাইবে। তাই আপনার সাহিত্য সাধনা মানুষ ও মানবতার জন্যই হওয়া উচিত। কিংবা বলা যায় হতে হবে। আর আপনিই করবেন অসৎ চর্চা, চাইবেন সৎ প্রতিদান এটা কখনোই বাস্তবে সম্ভব নয়। ইতিহাস এটা কখনোই গ্রহণ করেনি।

আমরা যখন সাহিত্যকর্ম নিয়ে তার পিছনে ছুটে চলব তখন এর জন্য অযথা বা বেহুদা সময় নষ্ট করার কোনোই মানে হয় না। বেঁচে থাকতে আপনাকে খাদ্যের সন্ধান করতে হয়। আপনি চান বা না চান-এটা আপনিই জোগাড় করবেন। আবার তাও বাসি পচা বা হাবিজাবি নয়, অরুচিশীল কোনো কিছু নয়। সেটাও আপনার বিবেক নিষেধ করে দেয়। ঠিক তেমনি যখন সাহিত্যের পথে পা দিয়েছেন তখন কি আপনার রুচি কোনো পচা, দুর্গন্ধ, ময়লাযুক্ত উচ্ছিষ্ট গ্রহণে সায় দেয়? যদি দিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনার বিবেকেই পচন ধরেছে। আপনার রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত প্রায়। যদি এটা অস্বীকার করেন তাহলে বুঝতে হবে আপনাকে অন্য কেউ পুতুল বানিয়ে মঞ্চে তুলে দিয়েছে।

কাজেই সাহিত্য প্রসঙ্গে আমরা যেহেতু জীবনের জন্য সাহিত্যকে আগেই ধরে নিয়েছি তাই আমাদের অবশ্যই মানুষের জন্যই চিন্তা করতে হবে। চিন্তার দীনতায় ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি যেমন মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে, তেমনিভাবে সাহিত্যেও স্পষ্ট ধরা দেয়। এখানে

www.pathagar.com

জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, জানাশোনাই তো আপনার কলমে উঠে আসবে। এটা তো যে কাউকেই স্বীকার করতে হবে। আর আপনি যা বিশ্বাস করেন না তা লিখবেনই বা কেন? তাই মানুষ ও মানবতার কল্যাণে আপনি যেমন নিয়োজিত আছেন ইচ্ছায় কিংবা জীবনের বাস্তবতায়, সাহিত্যেও তেমনি মানবতার কথা বলা জরুরি। মানবতার মুক্তির ক্রন্দনঅশ্রুই দৃশ্যমান হলে মানুষ বুঝে নেবে আপনার উদ্দেশ্য। ভেজাল থাকলেও ধরা পড়তে বাধ্য। এই সাহিত্যে স্বাভাবিক জীবনবোধ কল্পনা আর আশাবাদ ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু লাগামহীন বাক স্বাধীনতার নামে যে কেউ যে কোনো কিছুকেই তার সাহিত্যে কি সহজেই আনতে পারে? তাই সৌন্দর্যের মতোই যেমন ব্যক্তি সৌন্দর্য কামনা করে তেমনি সাহিত্য প্রাণ ও আশার আলো বিলাতে চায়। এর জন্য সততা, সতর্কতা সাহিত্যসৃষ্টির রুচিতে, বোধে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকা দরকার। কারো অধিকার হরণ করে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠাও অনৈতিক, সেটাও সাহিত্যিকদের মনে রাখতে হবে। মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রচেষ্টা কেউ করতে পারে কিন্তু মানবতাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা একজন ব্যক্তি মানুষের কতটুকু তা দেখতে হবে বিশেষভাবে।

তাই আমরা সাহিত্যের মাধ্যমে নিজের চিন্তার ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করতে পারি। চিন্তার দীনতা যাতে এখানে প্রবল না হয়ে ওঠে সেদিকে আমাদের সব সময় খেয়াল রাখা উচিত। মানুষ পাঠক যখন কোনো সৎ চিন্তার সংস্পর্শে আসে তখন সেই সাহিত্যের রচয়িতা সৎ শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। জাতিকে বা বিশ্বপাঠককে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়া কাম্য নয়। তাহলে চিন্তার সাগরে ডুবে সুন্দরকে, নান্দনিকতাকে আহরণের কত প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করা যেতে পারে। তাই সাহিত্য হয়ে উঠবে মানুষের। মানবতার। তখনই সাহিত্য মানুষকে আকৃষ্ট করবে। মানবতার জয়গানে উন্মুখ হবে।

আমাদের সাহিত্যের সে ইতিহাস তৈরির প্রচেষ্টাই সকল সাহিত্যিকের ব্রত হওয়া উচিত। তাতেই হয়ে উঠবে সাহিত্য জীবনের।

www.pathagar.com

শূন্যতা
সিদ্দিক আবু বকর

একটু আগে ভাগেই অফিস ছেড়েছেন আজ মকবুল সাহেব। আগে বলতে অফিস আওয়ার শেষেরও মিনিট দশেক পর। প্রাইভেট ফার্ম বলে কথা। সারাটা দিন জুড়েই কাজ আর কাজ। কাজের চাপে এক একজন স্টাফের গলধঘর্ম অবস্থা। তাই ইচ্ছে থাকলেও বের হওয়া হয়ে ওঠে না। আর মকবুল সাহেবের মতো কাজ পাগল ব্যক্তির বেলায় এ কথা ভাবাই যায় না। কাজের প্রতি তার এতবেশি সিনসিয়ারিটি অফিসের অনেকেরই চক্ষুশুলের কারণ। আড়ালে-আবডালে মকবুল সাহেবকে নিয়ে প্রায়ই তারা মুখ টিপে হাসাহাসি করে। মকবুল সাহেবের চোখও এড়ায় না এসব। অবশ্য এতে তার এক্টিভিটির কোন পরিবর্তন হয় না বললেই চলে।

রাস্তায় নেমেই কি ভেবে ঝট করে হাতটা ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে নিলেন মকবুল সাহেব। একটা স্বস্তির স্রোত বয়ে যায় তার অনুভূতির নরম গালিচায়। নাহ্! খুব একটা দেরি হবে না হয়তো। নিজে নিজেই আওড়ে যান কথাগুলো। চলার গতি কিঞ্চিত স্লো হয় তার। হাতের আঙ্গুলে কড় গুনে গুনে ভাগ করে নেন সময়টাকে।

জি.পি,ও'র রোড ধরে সোজা হাঁটা দেন পীর ইয়ামেনীর দিকে। জেবিন মানে মকবুল সাহেবের সহধর্মিনী। তাকে একটু চমকে দেবেন আজ। বারবার অপ্রস্তুত হতে হয় জেবিনের কাছে। এসব ভাবতে ভাবতেই ঢুকে পড়েন আরো এক ভাবনার সাগরে। স্মৃতির সেলুলয়েডে ভেসে ওঠে দুঃখ, হতাশা আর আনন্দের মুহূর্তগুলো।

দাম্পত্য জীবনে টানাপোড়েন ছিল বটে, আনন্দেরও ঘাটতি ছিল না এতটুকু। তবুও কোথায় যেন একটা বিশাল শূন্যতা রয়েই গেছে। ধাপে ধাপে সতেরটা বর্ণিল সিঁড়ি ভেঙ্গে এসেছেন এ যুগল। কিন্তু জেবিনের মমতায় ঠাসা কোল জুড়ে আজও আসেনি কোন চাঁদ মুখ রূপালী দ্যুতি ছেড়ে। তাই শ্রাবনের তুমুল বর্ষণেও জেবিনের হৃদয় জুড়ে খরা চৈত্রের দাবদাহ। এ নিয়ে মকবুল সাহেবের তেমন হায় আফসোস্ না থাকলেও মাতৃত্বের তীব্র স্বাদহীনতা জেবিনকে ম্রিয়মান করে রাখে সারাক্ষণ। একটা অপরাধবোধ কুরে কুরে খায় প্রতিনিয়ত।

জেবিনের এ হতাশা মুছে ফেলা তো মকবুল সাহেবের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। নিয়তি তো বিধাতার গড়া। ডাক্তার তো বলেই দিয়েছেন, জেবিন বাঁজা। তিনি চাইলেও মা হতে পারবেন না। জেবিনের হৃদয় নিংড়ানো অকৃত্রিম ভালবাসার কাছে পিতৃত্বের স্বাদ মাটি হয়ে গেছে সেই কবেই। মকবুল সাহেবের কাছে সুখটা বড় বেশি আপেক্ষিক। যাদের সংসার আঙ্গীনা মুখরিত হয় নিষ্পাপ শিশুদের কলকাকলিতে তারাও মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে কিংবা স্ত্রী-স্বামীকে নিয়ে সুখী হয় না। সেই তুলনায় তারা তো আল্লাহর কৃপায় বেশ আছেন। তাই বাবা হবার ইচ্ছাটা মরে গেছে অনেক আগেই।

www.pathagar.com

প্রথম যেদিন এ নির্মম সত্যের মুখোমুখি জেবিন, সেকী কান্না! ওর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে সান্ত্বনা দেবার ভাষা হরিয়ে ফেলেছিলেন মকবুল সাহেব। কেবল একটা কথাই বলেছিলেন, জেবিন সবাই তো স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখতে তো বারণ নেই। লাল, নীল, হলুদ, কত স্বপ্ন। সব স্বপ্নই কি পুরণ হয় মানুষের! নিশ্চয়ই হয় না। তাই বলে কি জীবন কারো থেমে থাকে। আল্লাহ তো আমাদের অনেক স্বপ্নই পুরণ করেছেন। এই দেখই না আমরা দু'জন দু'জনকে কত সহজে বুঝতে পারি। এটা কি কম পাওয়া বল। একটা দুটা স্বপ্ন না হয় অপূর্ণ থাক।

পুরোন সেই কথাগুলো বারবার কানে বাজে মকবুল সাহেবের। এসব চিন্তার ভেতর দিয়েই এক সময় ঢুকে পড়েন পীর ইয়ামেনী মার্কেটে। শাড়ীর দোকানে ঢুকতেই যেন ক্ষুধার্ত কাকের মেলায় এক চিলতে মাংস বনে যান মকবুল সাহেব। বিক্রেতার তুমুল ডাকাডাকিতে বেশ খানিকটা বিব্রত হন মকবুল সাহেব। শেষমেষ সাজিয়ে রাখা একটা মোড়ায় আলতো করে বসে পড়েন তিনি। দোকানী ত্বরিৎ একর পর এক শাড়ী উল্টে-পাল্টে কখনো গায় জড়িয়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় দেখিয়ে যাচ্ছেন। শাড়ীর গুণ-কীর্তনের ঠেলায় ঠোঁটের কোণায় যে ঘৃণা জমে গেছে সেদিকে খেয়ালই নেই বেচারার।

মকবুল সাহেবের ডিজাইন পছন্দ হচ্ছে তো রঙ পছন্দ হচ্ছে না আবার রঙ পছন্দ তো ডিজাইন। দাম নিয়ে অবশ্য চিন্তিত নন তিনি। কেননা প্রস্তুতি বেশ লম্বা দিনের। এই তো গেল বছর জেবিন কি এক অদ্ভুত কথাই না শুনিয়ে দিলেন মকবুল সাহেবকে, বুঝেছি আমার অক্ষমতাই বোধহয় ভুলিয়ে রাখে তোমাকে। তা না হলে ঠিকই মনে রাখতে দিনটিকে। সেদিন দারুণ বিব্রত হয়েছিলেন মকবুল, কিছুটা কষ্টও পেয়েছিলেন। আর ডিসিশানটাও ঐদিন থেকেই। ভেঙ্গে দিতে হবে জেবিনের ভুল। যদিও খেয়ালের বশে অনেক কিছুই ভুলে যান তিনি।

দোকানী ক্রেতার তরফে কোন পজেটিভ সিগন্যাল না পেয়ে অনেকটা বিরক্তি ভরা কণ্ঠেই বলেন, কি ভাই বাজেটে ঘাটতি? তো বলুন ওরকমও আছে...।

কথাটা মকবুল সাহেবের ব্যক্তিত্বে বেশ লাগল। কিছু একটা দোকানীকে বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দেন, নাহ্! আজকের দিনটায় অন্তত কোন ঝগড়া নয়। অনেকটা কষ্টেই উচ্চারণ করেন, না ভাই, আপনার থেকে নেয়া হলো না। আসি।

লাফ দিয়ে উঠে পড়েন রিক্সায়। রিক্সা ছোটে গাউসিয়ার দিকে। সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্ত। নিয়ন আলোর ঝলকানিতে এক ধরনের আলোক নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে অভিজাত বিপনীগুলোতে। মকবুল সাহেবের চিরচেনা দৃশ্য তবুও আজকের দেখাটা একটু অন্যরকম লাগছে।

কয়েকটা বিপনি পেরুতেই আচানক মকবুল সাহেবের চোখ দুটো আটকে যায় কাঁচে ঘেরা ধবধবে সাদা মূর্তিটার দিকে। মূর্তিটার পরনে কচিপাতা টিয়া রঙ শাড়ী। প্রযুক্তির

www.pathagar.com

উৎকর্ষে মূর্তিটা অনেকটা যন্ত্রমানবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিনয়ের সাথে হাত নেড়ে নেড়ে কুর্নিশ করছে মকবুল সাহেবকে। মূর্তিটার জায়গায় তিনি জেবিনকে ভাবতে থাকেন। সবুজ শাড়ীর বাঁধনে দারুণ লাগছে জেবিনকে। আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন তিনি। দুই চোখে সেই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। মকবুল সাহেবের আর তর সয় না। দোকানীকে চটজলদি দাম জিজ্ঞেস করেন, দাম? দোকানী হাসি মুখে বলেন, হাজার পাঁচশ।

তিনটা কচকচে পাঁচশ টাকার নোট গুঁজে দেন দোকানীর হাতে।

ব্যস্ত নগরীর আরো ব্যস্ত মানুষগুলোর মিছিলের ভীড়ের মধ্যেই ছুটে চলে টুং টুং শব্দে মকবুল সাহেবের রিক্সা। শাড়ীর প্যাকেটটির দিকে বারবার তাকান মকবুল সাহেব। আবেগে ফুলেফেঁপে ওঠে তার ভিতরটা। নাকের কাছে এনে শুঁকতে থাকেন নতুন শাড়ীর গন্ধ। গন্ধের সাথে তিনি যেন পুরোন দিনের এক বিশেষ গন্ধের মিল খুঁজে পান। মনে পড়ে তার। প্রথম যেদিন দেখা হয় জেবিনের সাথে সে কী মায়াবীই না লেগেছিল তাকে। খাটের এককোণে জবুথবু হয়ে বসেছিল জেবিন। জেবিনের লাজ ভাঙ্গাতে গিয়ে এমনি এক গন্ধ অনুভব করেছিলেন মকবুল।

চারপাশটা ইতোমধ্যে অন্ধকারের চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে। লোকজনের কোলাহলও কমে এসেছে অনেকটা। ওভার ব্রীজের প্রথম ধাপে পা রাখেন মকবুল সাহেব। অবলিলায় দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছে যায় পরবর্তী পায়। তিনি খানিকটা অবাক হন। এতোটা স্বচ্ছন্দে ইদানিংকালে সিঁড়ি ভেঙ্গেছেন বলে মনে পড়ে না তার। কোথা থেকে যেন বিশেষ ধরনের শক্তি পান তিনি। ঝিরঝির বাতাসে ইউক্যালিপ্টাসের পাতার শন শন শব্দ যেন মকবুল সাহেবের কানে গান হয়ে বাজে। উপরে ওঠার শেষ ধাপে পা রাখতে না রাখতেই তিন তিনটা ছোকরা ঘিরে ধরে মকবুল সাহেবকে। ভড়কে যান মকবুল সাহেব। হৃৎপিন্ডের চাতালে খুদুরে কাঁটার খোঁচা অনুভুত হয়। অন্ধকারের নীরবতা ভেঙ্গে হেংলা ধরনের ছোকরাটা ওর হাতের ধাতব বস্তুটা মকবুল সাহেবের তলপেটে ধরে। ঘটনার আকস্মিকতায় মকবুল সাহেব বলেন, তোমরা আমার কাছে আসলে চাওটা কি বাবারা?

কেন বোঝেন না কি চাই। মুখটা বাঁকিয়ে কথাগুলো বলে যায় সাথের একজন।

বাবারা আমার কাছে তো তেমন কিছু নেই। কি দিয়ে যে তোমাদের খুশি করবো।

কিরে বুইড়া হালায় দেহি আমাগো লগে জোক করে!

না না বাবা জোক না। আছে মাত্র চার'শ এগার টাকা আর সামান্য খুচরা...।

বাদ দেন ঐসব পেচাল। শার্ট খোলেন। জুতা, মোজা, প্যান্ট...সব।

ছোকরার কথা শুনে লজ্জায় সিঁটিয়ে যান মকবুল সাহেব।

ছি! ছি! লাজ-লজ্জা বলে কিছু নেই তোমাদের?

ধমকে ওঠে হ্যাংলা পোলাটা।

বাদ দেন ঐসব লেকচার। অগুলান ইনভারসিটির কেলাশে মাইরেন। যাই কইতাছি ভালায় ভালায় দিয়া ফালান নইলে কিন্তু রক্তারক্তি অইব।

www.pathagar.com

সব খুলে নিলো ছোকরা তিনটা। প্যাকেটটার দিকে যেই হাত বাড়াবে অমনি বুকের সাথে জাপটে ধরে প্যাকেটটা মকবুল সাহেব সন্তানের মমতায়। না। তোমরা আমার অনেক সর্বনাশ করেছো অন্তত আমার শেষ অনুরোধটুকু রাখো, এটা নিতে চেয়ো না। এটা আমার স্বপ্ন। দীর্ঘ একবছরে তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের ফসল এটি। তোমরা হয়তো জাননা এ আমার আঠারতম বিবাহ বার্ষিকির একমুঠো হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা।

কালো ছেলেটা প্যাকেটটা খামচে ধরে মকবুল সাহেবের তলপেট লক্ষ্য করে কশে এক লাথি মারে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান মধ্যবয়সী মকবুল সাহেব লোহার রেলিং-এ।

এখানে এখন লোডশেডিং। সমস্ত অন্ধকার উপেক্ষা করে মকবুল সাহেবের চোখের সামনে জ্বলে ওঠে লাল, নীল, সাদা অসংখ্য নিয়ন বাতি। বাতাসের আদরে দোল খাওয়া শর্ষে ফুলের মতো অসংখ্য হলুদ আলো দাপাদাপি করে মকবুলের চোখের তারায়। এক ঝটকায় ছিনিয়ে নেয় বুকের সাথে জাপটে রাখা প্যাকেটটা। বীরদর্পে হেঁটে যায় ছোকরার দল মকবুল সাহেবের স্বপ্নের কাফন মাড়িয়ে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না মকবুল সাহেবের।

শরীরের সব শক্তি জড়ো করে দাঁড়াতে চাইলেন মকবুল সাহেব। পারলেন না। প্রচণ্ড ব্যথার প্লাবন শরীরের কন্দরে কন্দরে। নির্লিপ্তের মতো তাকালেন আসমানের দিকে। মুঠো মুঠো রূপালী আলো ঠিকরে পড়ছে পৃথিবীর ললাটে। একপাল বেয়াড়া কালো মেঘ যেন ঢেকে দিতে চাইছে রূপালী আলোর প্রপাত চাঁদটাকে। হঠাৎ ভেসে ওঠে চাঁদের বুকে জেবিনের মায়াবী মুখ। মকবুল তা স্পষ্ট দেখতে পান। জেবিনের চোখে-মুখে যেন কেমন চাতুর্যের ছাপ ফুটে ওঠে। রহস্যময় এক হাসির রেখা ঝুলে থাকে ঠোঁটের কোণে। জেবিন কথা বলে ওঠেন, বিধাতার ইচ্ছে বড় বিচিত্র। মকবুল তুমি নিঃসন্তান বটে নিঃস্ব নও। ভাব একবার ঐ ছোকরাদের কথা। ভাবো ওদের জনক-জননীর কথা। দেখ সব পেয়েও যেন কিছুই ওদের নয়!

বিশাল কালো মেঘের দলাটা ঢেকে ফেলে চাঁদের গায়ে ভেসে ওঠা জেবিনের মুখটা।

অন্ধকারের চাদরে ঢেকে যাওয়া প্রকৃতি জ্বলে ওঠে কৃত্রিম আলোয়... তবুও যেন ভীষণ অন্ধকার, মারাত্মক লোড শেডিং মকবুলের হৃদয় কন্দরে।

www.pathagar.com

অন্ত্যমিলে গরমিল

হাসান রাউফুন

শ্রেষ্ঠ শব্দের সমন্বয় যদি কবিতা হয় তাহলে এই সমন্বয়কারীকে কবি বলা যায়। কবি তাঁর কবিতাকে সুর আর ছন্দের বাঁধনে বাঁধতে ব্যবহার করেন অন্ত্যমিল। কবিতার লাইন বা বাক্যের শেষে যে শাব্দিক মিল অর্থাৎ কবিতার চরণ শেষে যে মিল পাওয়া যায় তাকে অন্ত্যমিল বলে। কবি গ্যেটে এ সম্বন্ধে বলেন– 'কবিতা প্রথমত কবিতা হয়ে ওঠে-ছন্দ এবং মিলকে ঘিরে।' ছন্দোবদ্ধ কবিতার ক্ষেত্রে মিলটা বেশি প্রয়োজন।

উত্তরাধুনিক কবিগণ বলেন– 'আধুনিক কবিতার অন্ত্যমিলটা এত দরকার নেই।' কিন্তু অন্ত্যমিল শুধু কবিতার মাধুর্যই বাড়ায় না, কবিতা পঠনের শ্রুতিও বাড়ায়। অন্ত্যমিলের গুরুত্ব সম্পর্কে নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর মন্তব্য–

প্রথমেই যদি আপনি মিল ছাড়া কবিতা লিখতে শুরু করেন, তাহলে অনেকেই সন্দেহ করবে যে, মিলের সুবিধা হয়নি বলেই আপনি অমিলের লাইনে এসেছেন। সেটা খুবই অপমানের ব্যাপার।

মিল জিনিসটাকে প্রথম অবস্থায় বেশ ভাল করে দখল করা চাই। তবেই সেটাকে ছেড়ে দিয়েও ভাল কবিতা লিখা সম্ভব হবে। যেমন বড় বড় লেখকদের মধ্যে অনেকেই অনেক সময় ব্যাকরণের গন্ডির বাইরে পা বাড়িয়েও চমৎকার লেখেন; এও ঠিক তেমনি। ব্যাকরণ বস্তুটাকে প্রথমে বেশ ভাল করে মান্য করা চাই। তবেই পরে সেটা দরকার মত অমান্য করা যায়। ঠিক তেমনি, পরে যাতে মিলের বেড়া ভাঙ্গা সহজ হয়, তারই জন্যে প্রথম দিকে মিলটাকে বেশ আচ্ছা করে রপ্ত করতে হবে।

বোধিব্যক্তিবর্গ বলেন– কবিতার অবক্ষয়ের সময়ে আবার কবিতার ছন্দ, কবিতার অন্ত্যমিল। এখন যারা কবিতা লেখেন তারাই কবিতা পড়েন অর্থাৎ যারা কবি শুধু তারাই কবিতার পাঠক। অনেক পণ্ডিতও বলেন– কবি হবার জন্যে পাঠক কবিতা পড়েন অর্থাৎ যারা কবি হতে চায় শুধু তারাই কবিদের কবিতা পড়ে। আমার সন্দেহ, কবিতা পড়ে কি কবি হওয়া যায়। যদি তাই যেত তাহলে কবি জীবনানন্দ দাশ সকলেই কবি, কেউ কেউ কবি নয়, বলতেন। আমার খটকাটা লাগে ওখানেই, যে জিনিস উপেক্ষিত, অবহেলিত এবং অপ্রিয় সেটি কী করে ১৪০০ বছর ধরে বেঁচে থাকছে! যাক ওসব কথা, আমার আলোচনার বিষয় কবিতার অন্ত্যমিলকে ঘিরে।

এ যাবতকাল বহু কবি বাংলা কবিতাকে জন্ম দিয়েছেন। কবিতা অনেক কবিকে শ্রেষ্ঠ কবি করে তুললেও তাঁরা কিন্তু দুর্বল অন্ত্যমিলকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। অনেক কবি শুধু মিলটাকে ঠিক রেখেছেন। ঠিক রাখেননি অক্ষর (সিলেবল) কিম্বা স্বকারের মিল। আজকাল গানের ক্ষেত্রে দুর্বল অন্ত্যমিল ব্যবহার করা হচ্ছে। নিম্নে জোরালো এবং দুর্বল অন্ত্যমিলকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

www.pathagar.com

এক অক্ষরে গঠিত জোরালো অন্ত্যমিল, মন-বন, মান-বান, জল-মল,

কিন্তু তখনই মিলকে দুর্বল করা হয় যখন ব্যবহার করা হয়– কল-জাল, শন-ভান।

দুই অক্ষরে গঠিত জোরালো অন্ত্যমিল,

আঁখি-রাখি, জেলে-মেলে, কবি-ছবি, এখানে দুটি শব্দের স্বরকার এবং শেষ বর্ণ ঠিক রাখা হয়েছে বলে প্রত্যেকটিই জোরালো অন্ত্যমিল।

দুর্বল অন্ত্যমিল, কবি-সবি, রাতি-সাথি, পবন-শাসন।

এখানে শেষ বর্ণ মহাপ্রাণ-অল্পপ্রাণ ঠিক রাখা হয়নি। কোথায়ও স্বরকার ঠিক রাখা হয়েছে, কোথায়ও রাখা হয়নি এবং কোথায়ও শেষ বর্ণ ঠিক রাখা হয়েছে এর গোলমালের জন্য এগুলি দুর্বল অন্ত্যমিল।

তিন অক্ষরে গঠিত জোরালো অন্ত্যমিল, নাচন-মাতন, কুকুর-মুগুর, আগুন-ফাগুন।

এখানে স্বরকার এবং শেষ বর্ণ ঠিক রাখা হয়েছে বলে এগুলো সার্থক অন্ত্যমিল।

দুর্বল অন্ত্যমিল, লড়িতে-আসিতে, সাগরে-নগরে, চেঙ্গিসে-কুর্নিশে, চঞ্চলে-কোমলে, আনন্দ-বসন্ত।

এখানে শেষ বর্ণ ঠিক রাখা হয়েছে কোথায়ও স্বরকার ঠিক আছে কোথায়ও ঠিক নেই, সেহেতু এগুলি দুর্বল অন্ত্যমিল।

চার অক্ষরে গঠিত সার্থক অন্ত্যমিল, বিকিকিনি-রিনিঝিনি, আনাগোনা-কাঁচাসোনা।

এখানে স্বরকার এবং শেষ বর্ণ ঠিক রাখা হয়েছে তাই এগুলি সার্থক অন্ত্যমিল।

অসম অক্ষরে গঠিত অন্ত্যমিল। এখানে অবশ্য শেষ অক্ষরে মিল আছে বলে মিলের তেমন ব্যাঘাত ঘটায়নি। যেমন– নিশ্চয়-ভয়, দয়াময়-হয়, সদয়-অভয়।

কিন্তু, পথে-জগতে, অসুখে-বুকে, কারণ-নির্জন।

অন্ত্যমিলগুলো দুর্বল।

ক্রিয়া পদ দ্বারা গঠিত অন্ত্যমিল দুর্বল অন্ত্যমিল যেমন, বুঝি-খুঁজি, রাখিয়াছি-বাঁধিয়াছি, কাঁদিয়া-বাধিয়া, কান্না-বান্না, চলব-বলব।

যদিও কোনো কোন কবি ক্রিয়া পদের অন্ত্যমিল দিয়ে কবিতা লেখায় বড়ই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

নাম জাতীয় শব্দ দ্বারা গঠিত অন্ত্যমিল দুর্বল অন্ত্যমিল। আসমা-সালমা, করিম-রহিম।

অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ দ্বারা গঠিত অন্ত্যমিল দুর্বল অন্ত্যমিল হয়। কোনো কোনো সময় মহাপ্রাণ-ধ্বনি হাল্কা উচ্চারিত হয় বলে অন্ত্যমিলের তেমন গরমিল আছে বলে কানে বাঁধে না। যেমন– তারিখ-আশিক। এখানে 'তারিখ' এর খ উচ্চারণ ক দিয়েই করা হয়। আবার বন্ধ-ছন্দ। এখানে ধ এর উপর স্ট্রেস পড়ছে কিন্তু দ এর উপর পড়ছে না। সুতরাং এটি দুর্বল অন্ত্যমিল।

www.pathagar.com

বুক-সুখ, ফাটে-কাঠে, খুঁজি-বুঝি, খাদ-সাধ, পাতা-মাখা, হাত-অবসাদ, লিচু-কিছু, রবে-নভে, কেঁদে-বেঁধে, অশ্রু-শিশু।

পদের শেষে ত, র, যে, যোগ করে অন্ত্যমিল দুর্বল হয়। যেমন– আমাতে-নদীতে, আমার-তার, নামাজে- সে যে।

ও-কার এবং অ-কার এর গরমিলে দুর্বল অন্ত্যমিল হয়। যেমন– কবি(কোবি)-সবি (সবই)।

ঋ-কার এবং ই-কার দিয়ে গঠিত অন্ত্যমিল দুর্বল হয়। যেমন- তৃষ্ণা-দিশা।

য-ফলা যুক্ত অন্ত্যমিল দুর্বল অন্ত্যমিল। যেমন– জান-প্রাণ, মান-ঘ্রাণ। সরল-প্রাণ-ঘ্রাণ।

তিন চার অক্ষরে গঠিত দুর্বল অন্ত্যমিল। যেমন– বকুল-চাঁপাফুল, পারে-আঁধারে, ভাবনা-উত্তেজনা।

সন্ধিযুক্ত অন্ত্যমিল, সার্থক অন্ত্যমিলের তেমন একটা ব্যাঘাত ঘটায় না। যেমন– শতবার-বরষার, অর্জন-বর্জন, নিশ্বাস-বিশ্বাস।

এখানে কবিদের দুর্বল অন্ত্যমিলকে সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি যা ১৪০০ বছর ধরে পঠিত হচ্ছে। আলোচনার সুবিধার্থে– প্রাচীন যুগের কবি, মধ্যযুগের কবি এবং আধুনিক যুগের কবি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হলো।

প্রাচীন যুগের কবি (৬৫০-১৩৫০)– এ সময়ে যথাক্রমে পাওয়া গিয়েছে চর্যাপদ ও নাথগীতি। যা বাংলা ভাষার আদি কবিতা। চর্যাপদ রচনা করেন ২৩ অথবা ২৪ জন বৌদ্ধ কবি মোট ৫০টি বৌদ্ধ গান। যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কবিতা রচনা করেন কবি কাহ্নপা ১৩টি এবং এরপর ভুসুকুপা মোট ৮টি।

নাথগীতি রচনা করেন মীননাথ এবং গোরক্ষনাথ। যে কোন সাহিত্যেরই সূচনাপর্ব দুর্বল হয় এতে অস্বাভাবিকত্বের কিছু নেই। এখানে এঁদের দুর্বল অন্ত্যমিল তুলে ধরা হলো।

কাহ্নপা = রুন্ধেলা-ভইলা, নিবাস-উআস, ভিন্না-পরিচ্ছন্না, গেলা-ভইলা, বট্টই-পইজ্জই।

ভুসুকুপা = ভইলী-নেলী।

মীননাথ ও গোরক্ষনাথ = মালা-উজালা, ভাল-তৎকাল।

মধ্য যুগের কবি (১৩৫০-১৮০০)– চর্যাপদের পরেই বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হলো বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। এছাড়া অন্যান্য মধ্যযুগীয় কবিদের কবিতার দুর্বল অন্ত্যমিল দেখা যাক।

বড়ুচন্দীদাস (আণুন, ১৪০০-১৫০০) = কূলে-গোকুলে, জনা-অপনা, মন-বান্ধন, হরিষে-দোষে, জানী-পনী।

বিদ্যাপতি (আনু, ১৩৮০-১৪৬০)= চিন্দা-নিবদন্ডা, দেহা-সন্দেহা।

শাহ্‌মুহম্মদ সগীর (আনু ১৩০০-১৪৫০) =

www.pathagar.com

ভ্রাতৃগণ-মন, মারিল-মোচরিল, দুর্লভ-লাঘব, জলিখা-লেখা, যৌবন-কাহন, ভক্তি-গতি।

আলাওল (আনু ১৬০৭-১৬৭০)- মহারাজ-রাজ, সৌরভ-পরাভব, বাসি-নিশি, সাজে-মাঝে, বাসি-শাহী।

মধ্যযুগের সার্থক অন্ত্যমিলের কবিগণ হলেন- জয়ন উদ্দিন, কাজী দৌলত ও ভারত চন্দ্র রায়।

আধুনিক যুগের কবি (১৮০১-বর্তমান)-

আধুনিক যুগের প্রথম সার্থক কবি তিনজন। যথা-

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) = চায়-পায়-প্রায়-তার, রূপিনী-কোপিনী, নয়ন-নূতন, যেমন-দরশন।

বিহারী লাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) =

বহিয়ে-রাঁচিয়ে-ধরিতে, দেখে-থেকে, গিয়ে-জড়াইয়ে-চাহিবে, পবন-রন-তাড়ন, কাছে-আছে-বাঁচে, যাই-লুকাই-বেড়াই, নিশায়-বেড়ায়-কোবায়, স্বপ্ন-এখন-যৌবন, হোতায়-বেড়ায়, পাখি-ডাকি, পাতা-গাঁথা, ঢাকা-দেখা।

এ সময়ের সার্থক অন্ত্যমিলের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮২২-১৮৫৯)। এর অন্ত্যমিলের অক্ষর এলোমেলো হলেও অন্ত্যমিল সার্থক হয়েছে।

আধুনিক সার্থক কবি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, জসীম উদ্দীন এবং ফররুখ আহমদ।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮১৪-১৮৭৩)- কহিয়া-চাহিয়া, বিপিনে-পীড়নে, আচরি-পাইহরি, সাধে-কাঁদে-কাঁদে, সাধিতে-তুলিতে, ধবর-পাথর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)- পরান-পাষান, ভুবনে-কাননে, ভাষন-পবন, নড়িয়া-ছিড়িয়া, কেমনে-নয়নে, বধূ-শুধু, বাসনা-কল্পনা, নয়ন-কানন, যেমন-পবন, কুসমচয়ন-মিলন-বাসরশয়ন, আত্মবিস্ময়ন-কুসুমকানন, বিদেশিনী-মধুরহাসিনী, মুখ-বুক, পাখি-ডাকি, বাতি-সাথি, উঠে-টুটে, পথে-জগতে, বাঁকা-শাখা-ঢাকা, আঁখি-থাকি, মাঠ-ঘাট, কাঁদা-বাধা, বোঝে-খোঁজে, কথা-আকুলতা, থাকে-রাখে, মাতা-মাথা, নীচে-পিছে, মাঝিরে-আজিরে, পরমাদ-অপবাদ।

সতেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)- মূর্ছনা-তচ্ছনা-জ্যোৎসনা, চার্বাক-নির্বাক, লিখি-দেখি, তৃষ্ণা-দিশা, সিন্ধু-হিন্দু-বিন্দু, রন্ধ্র-ছন্দ্র-মন্দ, মাঝে-বাজে, কথা-চঞ্চলতা, চোখে-ওকে, মাঠে-ছাটে, চোখে-স্বপ্নলোকে, নদী-অবধি, ছাতা-মাথা।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)- বৈশাখীর-বিধাতৃর, মন যা-পাঞ্জা-ঝঞ্ঝা, চেঙ্গিশ-কুর্নিশ, ওঙ্কার-হুঙ্কার, অনুখন-কানকন, উম্মাদ-বাঁধ, মুখ-বুক, যা-পা, পা-গা, না-পা, মউ-কও, মাঝে-বাজে, লাখি-রাতি, সম্রাট-পাঠ, ঘৃণা-কিনা, তাপস-বিরস, আমার-

www.pathagar.com

বিথার, উঠি-টুটি, অট্টালিকা-লিখা, কিছু-নীচু, ইঙ্গিতে-হাসিতে, বুকে-সুখে, কাঁদিয়া-সানরিয়া, সাথে-হাতে, শিশু-কিছু, রাখি-বাকী, পাখি-বাকী, পাখি-ঢাকি, চোখে-লোকে।

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)– বাকে-মাঝে, পাখি-একাকী, মুখে-বুকে, সভ্যতা-কথা, খুঁজেছি-নিচে, কথা-বিষণ্নতা, শালিখে-বউটিকে, সাগরে-নগরে, নীরবতা-কথা, বুঝি-খুঁজি, ছবি-সবি, একা-দেখা।

জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬)– এই কবির কবিতার প্রায় সব অন্ত্যমিলই দুই অক্ষরে গঠিত হয়েছে। কবি তাঁর কবিতার অন্ত্যমিলে এত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন যা এ যাবতকাল কোন কবিই দেখাতে পারেননি। তাই তাকে মিলের জাদুকর বললে অত্যুক্তি হয় না। অন্ত্যমিলে পাকা হতে চাইলে কবি জসীম উদ্‌দীনের কবিতা পড়া দরকার। তাঁর কিছু দুর্বল অন্ত্যমিল হলো– কাঁখে-বাঁকে, পথে-কোন মতে, মাঝে-না যে, বুকে-মুখে, গাঁ-পা, মা-না, পা-যা, গা-ছা-মা-গা, বুক-মুখ, শোও-কেউ, সাঁস-তাজ, সদা-ব্যথা, আছে-গাছে, জ্বলে-দোলে, হাত-সাথ, কবি-সবি, নদী-নিরবধি, মোড়ে-পড়ে, আঁচল-সজল, মাথা-তা, কাঁকা-খাঁ খাঁ, ঘুরা-তোরা, লাঠি-ফাটি, ডিঙিয়ে-ঠুকিয়ে, শাঁখ-দাঁড়কাক, সুখি-ফাঁকি, কথা-লতা, একা-লেখা, উঠি-ছুটি, বাঁধ-আর্তনাদ, মাঝে-কাছে, জেগে-যেচে, কনা-বোনা, টুকটুক-মুখ, কবিতা-কিছুতা, নখেতে-সুখেতে, হে-যে, ত্যাগ-ডাক, শোভি-ছবি, কণ্ঠ-লতা।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)– মাথা-পাতা, স্রোতে-পথে, ইনসাফ-আজার, তোমার-নেশার, সাধ-সিন্দবাদ, অগ্নিশিখা-কুজঝটিকা, ধ্যান-আহ্বান, মুঠিতে-মাটিতে।

উপরের আলোচিত কবিদের অন্ত্যমিলে আমরা যে সব গরমিল লক্ষ্য করি তা হলো–

স্বরকারের গরমিল। যেমন– ভাষণ-পবন, ধবর-পাথর।

স্বল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির গরমিল। যেমন– সভ্যতা-কথা।

ক্রিয়া পদের গরমিল। যেমন– কহিয়া-চাহিয়া, আঁখি-থাকি।

সর্বনাম পদের গরমিল। যেমন– তোমার-নেশার।

অমিল অক্ষরের গরমিল। যেমন– অগ্নিশিখা-কুজঝটিকা।

পরপদের মিল বেশি। যেমন– পদের শেষে– রে, তে, না।

নী, যা, পা, র, যে, ত, যোগ করে মিল দেখানো হয়েছে। যেমন– মাঝিরে-আজিরে, মুঠিতে-মাটিতে, দেনা-না, বিদেশিনী-মধুরহাসিনী, পা-যা, আমার-তার, নামাজে যে যে, আমাতে-নদীতে ইত্যাদি।কবিতার ছন্দ দেখা যায় না তবে কবিতা আবৃত্তিতে কানে দোলা দেয়। কিন্তু অন্ত্যমিল শুধু দেখাই যায় না কানে দোলাও দেয়। তাই দুর্বল অন্ত্যমিল চট করে ধরা যায়। অন্ত্যমিল সম্বন্ধে শেষ কথাটা হলো– কাঁঠাল পাকে কিলে আর কবিতা পাকে মিলে।

www.pathagar.com

মাফরুহা চৌধুরীর 'সঙ্গ প্রসঙ্গ'
তৌহিদুর রহমান

কারণে অকারণে অনেক খ্যাতিমানদের সাহচর্য পেয়েছেন অনেকেই। কিন্তু ক'জনই বা ক'জনের কথা মনে রেখেছেন। অনেক মশহুর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই জানা আছে। স্মৃতির পাতা উল্টালেই হয়তো বেরিয়ে আসবে অজানা কত কথা। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হোক অথবা ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থেই হোক সেইসব মহৎ ব্যক্তিত্বদের জাতির সামনে তুলে ধরা হচ্ছে না। যাতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নবপ্রজন্ম। তারা জানতে পারছে না উত্তরসূরীদের গৌরবগাথা।

আমরা বলতে চাই ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে জাতীয় স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে। আর জাতীয় স্বার্থের কারণেই নবপ্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে মহামূল্যবান ব্যক্তিত্বদের। যাঁদের স্মরণে জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, উপকৃত হবে আমাদের সমাজ। এ দায়িত্ব কিছুটা হলেও পালন করেছেন বিশিষ্ট লেখিকা কথাশিল্পী মাফরুহা চৌধুরী 'সঙ্গ প্রসঙ্গ' নামের এ মূল্যবান গ্রন্থখানি রচনা করে। বইটি পাঠকের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ'।

বইটি সুখপাঠ্য হবে নি:সন্দেহে। জীবনশিল্পী মাফরুহা চৌধুরী নামজাদা কিছু হীরা, মুক্তা মানিক কুড়িয়ে জড়ো করেছেন এ বইটিতে। সঙ্গ-প্রসঙ্গ নিয়ে অন্তরঙ্গ আলোচনা করেছেন তিনি।

সময়ের বিপাকে আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। ভুলে যাই অনেক কথা, অনেক স্মৃতি, অনেক ব্যথা, ভুলে যাই মানুষের মুখ। কিন্তু অনেককেই ভুলে থাকা যায় না। এমন হাজারো ব্যক্তিত্ব আছেন যাদেরকে যুগ যুগ ধরে লালন করা যায়। তাইতো মাফরুহা চৌধুরী ভুলে থাকতে পারেননি এই সব খ্যাতনামাদের। স্মৃতিচারণ যে এত মধুর হতে পারে তা বইটির পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন।

লেখিকা অত্যন্ত সাধারণভাবে লিখেছেন অনেককে নিয়ে। বেশ কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিকের স্মৃতিচারণ করেছেন অকৃপণভাবে। তিনি বিভিন্ন সময় যাঁদের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছেন এবং সান্নিধ্য লাভ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই খুবই গতিশীল, সাবলীল ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন অনেক স্মৃতি, অনেক কথা ও অনেক তথ্য।

তিনি একে একে তুলে ধরেছেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মাহবুব-উল আলম, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, মোহাম্মদ মোদাব্বের, মাওলানা ভাসানী, কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুখ আহমদ, হাসান হাফিজুর রহমান, কবি হাবিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান, শহীদ সাবের প্রমুখ ব্যক্তিত্বদের। জানা-অজানা অনেক কথাই লিখেছেন তিনি এঁদের সম্বন্ধে।

যেমন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন, 'তাঁর নির্দেশ পেয়েছি স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখবে। স্বাস্থ্য ভাল রাখতে না পারলে জীবনে কোন কিছু করতে পারবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে আর ফ্রি হ্যান্ড কিছু কিছু একসারসাইজ করবে। লেডি ডাক্তারের কাছে যাবে, তারাই বলে দেবে নিয়ম।' [পৃষ্ঠা ১৫] এর থেকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্বন্ধে সুন্দর ধারণা পাওয়া যায়, তিনি কতটা আধুনিক মনের মানুষ ছিলেন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁর অন্তরে একটি উজ্জ্বল শিখা জ্বলতো সব সময়। সে শিখায় উৎকীর্ণ ছিল সত্য এবং ন্যায়ের শপথ। তার সাংবাদিক জীবনে এর অনেক স্বাক্ষর রয়েছে।']পৃষ্ঠা-২৩]

প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান। অসুস্থ তিনি। বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে কেউ কেউ দেখতে যান। একজন জানতে চাইলেন কেমন আছেন তিনি। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে জবাব দিলেন, আজরাইল জানালা দিয়ে উঁকিঝুকি দিচ্ছে, ভেতরে প্রবেশ করছে না এখনও।' লেখিকা এই মহান সাহিত্যিক সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন, 'মৃত্যু শয্যায় শুয়ে তাঁর এ রসিকতাময় কথাগুলো জীবনের প্রতি কি নিস্পৃহতা। অথবা জীবনকে অনেক ভালবেসে অমোঘ মৃত্যুর প্রতি একটি নিবেদিত মনোভাব!' [পৃষ্ঠা-৩৫]

কবি ফররুখ আহমদকে নিয়ে লিখেছেন, 'তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে মুগ্ধ বিস্ময়ে মনে হয়- এত প্রেম, এত মাধুর্য, এত শিল্প-সৌন্দর্য, এত কাব্য, এত রোমান্টিকতা ছিল তাঁর মন জুড়ে। রোমান্টিকতার একটি ভাণ্ডার ছিল তাঁর হৃদয়। তার থেকে উঠে আসতো অপূর্ব চিত্ররূপ, রূপকল্প, উপমামণ্ডিত শব্দ সম্ভার।' এ সবই বইটিকে আলাদা বৈশিষ্ট এনে দিয়েছে।

এছাড়া প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, মাওলানা ভাসানী, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কবি আহসান হাবিব, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গণি হাজারীসহ অনেকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন 'সঙ্গ প্রসঙ্গ' বইটিতে।

ছোট-বড়, ছাত্র-শিক্ষক, লেখক-গবেষক সবারই পড়ার মত বইটি। বইটির ছাপা ঝকঝকে। বাঁধাই উন্নতমানের। আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

www.pathagar.com

কাঙ্ক্ষিত সূর্যোদয়ের প্রার্থনা
ইসমাঈল হোসেন দিনাজী

আর কত ঘুমোবো আমি
দীর্ঘায়িত হচ্ছে অমানিশা কেনো
আর কতকাল কালো চাদরে
আবৃত থাকবে সমগ্র পৃথিবী?

পাখিরা ডানা ঝাপটায় গাছে গাছে
থেমে গেছে ঝিঁঝিঁ পোকার আর্তনাদ
চতুষ্পদ প্রাণীগুলোও অস্থির এখন
সূর্যোদয় হচ্ছে না কেনো?

শিশুরা মাতৃস্তন্য পান করতে করতে ক্লান্ত
কখন ভোর হবে পাখিরা ডাকবে
বামা বধূ বড় অস্থির স্বামী শয্যায়
সূর্যোদয় হচ্ছে না কেনো?

কালো চাদরে আবৃত কেনো পৃথিবী
বিবস্ত্র অসহায় মানুষ দেখে
ইবলিস নেতৃত্বে উল্লাস করে–
এ নিকষ নিশিথের অবসান চাই
পুষ্পিত সবুজময় পৃথিবী চাই
কাঙ্ক্ষিত সূর্যোদয় চাই।

হেরার সাধক
খালীদ শাহাদাৎ হোসেন

মুহম্মদের বয়স বেড়েছে চল্লিশে হাতছানি
তখনো নাজিল হয়নি কুরআন, পাননি অহির বাণী।
নিদ্রিত আর জাগ্রত হালে স্বপ্নে দেখেন সব
ভোরে সুর্য উদয়ের মত সত্য ও বাস্তব।

মানসপটে জেগে থাকে তার স্বপ্নে দেখা ছবি
আল্লাপাকের খাশ রহমত হতে চলেছেন নবী।
ঘর সংসার তুচ্ছ তাহার কি যেন অভাব মনে
শহর নগর-লোকালয় ছেড়ে চলে যান নির্জনে।

www.pathagar.com

মাঠ প্রান্তর-দুর্গমপথ করতে অতিক্রম,
চারদিক হতে গাছ পাথরে শ্রদ্ধা জানায় পরম'
আল্লার হে প্রিয় রসূল আপনার প্রতি সালাম
কিছুতো দেখি না ভয়ে ভয়ে তিনি তাকান ডাইনে বাম,

মক্কা হতে দুক্রোশ দূরে হেরা পাহাড়ের গুহা,
অনেক খুঁজেও, কি মনে বুঝে বেছেও নিলেন উহা,
হেরার গুহায় ধ্যানমগ্ন মুহম্মদ আলামিন
ধ্যানের মধ্যে কেটে যায় তার কত যে-রজনী দিন।

ভৃত্য যায়েদ নিত্য এসে দিয়ে যান যত-খানা
সাদিয়া আম্মা খাদিজা দেখেন খায়নিক একদানা।
খেজুর রুটি মশকের পানি অথবা ছাতু যব
গতকাল যা পাঠানো হয়েছে পড়ে যে রয়েছে সব।

ধ্যান মগ্ন লগ্নে কঠোর আল্লার ইবাদাত
এভাবে সেদিন সাধনার মাঝে এলো কদরের রাত।
চারদিক ছেয়ে কে যেন এসে ছড়ালো দীপ্ত আলো
হারিয়ে গেল গুহায় হেরার আঁধার রাতের কালো।

আগন্তুক দেখে সত্যসাধক ভয়ে হন জড়-সড়
কি যেন লেখা সামনে ধরে বললেন এটা পড়ো।
পড়ো তোমার রবের নামে করেছেন যিনি সৃষ্টি
কেমনে পড়ব- পড়তে জানি না চোখে নাই পাঠ দৃষ্টি!

এসে সে সাধক আগন্তুকে করলেন কোলাকুলি
হেরার কক্ষ সাক্ষ্য-বক্ষের জ্ঞান চোখ গেল খুলি।
আগন্তুকের সংগে এবার মিলিয়ে মুখের স্বর
অতি সহজেই নিলেন পড়ে লিখে নিজ অন্তর।

পাঠ শেষ হলে বলে আগন্তুক আপনি খোদার রসুল
আমি জিবরীল ফেরেস্তা খোদার নয় কিছু এর ভুল।
হেরার সাধক ফিরে এলো ঘরে ভয়ে কম্বল গায়
আবুল কাশেম কি হলো তোমার জিগালেন খাদিজায়।

খাদিজার ভাই ওরাকা ছিলেন পণ্ডিত ইঞ্জিলে
শুনে বলে বোন ঘটনা এমন কেতাবের সাথে মিলে।
ঈসা, মুসা, নবীদের মতো ঘটনা মিলেছে সার
করো নাকো ভয়-জেনো নিশ্চয়-ইনিতো-সত্য নবী।

www.pathagar.com

আমিও হারাবো
মুর্শিদ-উল-আলম

ও চোখের চাহনিতে ইশারার ইলিশেরা খেলে
প্রণয় পদ্মার স্রোত ঠেলে ঢেউ ভেঙে ছুঁতে চায়
মনের মৃত্তিকা মাখা ঘ্রাণ। সতেজ সতৃষ্ণ জেলে
সময়ের দীর্ঘ জাল ফেলে চেয়ে থাকি প্রতীক্ষায়।

ইলিশের রূপে আসক্তির রঙ, রোদ রোদ লোভে
ধীরে ধীরে গলে পড়ে দিনের শরীরে। অসঙ্কোচে
ভিজে গিয়ে মগ্ন ও পরিতৃপ্তির জলাশয়ে শোভে
ইশারার ইলিশেরা গেঁথে যায় আকাঙ্ক্ষার কোঁচে।

ইলিশ! ইলিশ! তীব্র উচ্চারণে জেগে ওঠে রাত
গাঢ় অন্ধকার ফেটে বের হয় ইলিশের রঙ
চতুর্দিকে আঁকা হয় স্নিগ্ধ প্রেম আর পারিজাত
নিজস্ব অস্তিত্বে মেলে ধরে প্রণয় আসক্ত ঢঙ।

যে চোখের চাহনিতে ইশারার ইলিশেরা ডাকে
আমিও হারাবো সে চোখের প্রেমের মোহন বাঁকে।

কাঠিন্যের প্রিজনসেলে
আমিন আল আসাদ

অনেক দিন হলো স্বপ্ন টপ্ন দেখি না
এমনকি দুঃস্বপ্নও
যেমন বালক বেলায় দেখতাম
শুধু দৌড়াচ্ছি, দৌড়াচ্ছি, দৌড়াচ্ছি
অথচ আমার নিজস্ব মাঠ
পুকুর, বাড়ির আঙ্গিনা, খড়ের গাদা
পরিচিত পরিমণ্ডল আমার পিছু ছাড়ছে না
আজকাল আর সে ধরনের কিছু দেখি না
তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে দেখি শুধু রক্তিমাভ কর্কশতা
কাঠিন্যের প্রিজনসেলে কাতরায় কতগুলো দেহ
আত্মাগুলো বিক্রি হয়েছে কিনা সন্দেহ
দেহগুলো ওরা কিনে নিয়েছে নিশ্চিত
কখনো বা গণতন্ত্র, কখনো বা সমাজতন্ত্র বা
অন্য কোন আদর্শ বা দলতন্ত্রের নামে।

www.pathagar.com

সুঘ্রেয় সুন্দর
জানে আলম

আগে প্রেম কিংবা
প্রেমের মতোই অনবদ্য হওয়া চাই
তা না হলে
শুকতারার শরীরে লেপ্টে যাবে কাদামাটি
সতীত্ব হারাবে সুস্মিত সকাল
আদন অন্তরেইতো দীপ্ত হয়
হুরেলা হাসির ছটা
অন্তরে আনতেই হবে আদনের রূপ
তা না হলে মেঘেদের ঘনঘটা থেকে যাবে
সারা দিনভর।

লোডশেডিং সভ্যতাবোধ যারা
নির্মাণ করে বিবস্ত্র সুখে
অমাবশ্যার অসুখে তারাই আক্রান্ত হয়
স্বচ্ছতার বিনির্মাণ চাইলে
নৈপুণ্যকে নববধূর মোহর প্রদানের মতো
পুণ্যতায় করে নিতে হবে অনঘ আপন
গভীরতার সাথে নীরবতার সম্পর্কের মতো
তোমার সাথেও সম্পর্ক স্থাপিত হবে
উচ্চতার
প্রেম কিংবা প্রেমের মতোই
অনল হওয়া চাই
তবেই জীবন হবে
সুখদ, সত্যের মতো সুঘ্রেয় সুন্দর।

আষাঢ়ের পদাবলী-বৃষ্টি
আফসার নিজাম

এবং নদী.....জোয়ার ভুলে গেলে
কাঁকড়ার পায়ে আটকে থাকে
পৃথিবীর ইউরেনিয়াম সুখ
সুখের সমুদ্রে বৃষ্টির ভ্রূণ
প্রথম জন্ম.....উড়ে যায় মেঘ
দ্বিতীয় জন্মের আগেই
পাল্টে নেয় নিজের অবয়ব
এবঙ কারুকাজ খচিত নামের অলঙ্কার।

www.pathagar.com

অলঙ্কারে সাজুগুজু বিমুগ্ধ বউ
প্রাঙ্গণে গীতরত মজমায়, ঢেলে দেয়...
ঝরে পড়ে রহমত; ঝরে পড়ে বৃষ্টি
তখন সোনালী হুদহুদ জামদানী রঙ মেখে
মোনাজাতে উড়ায় ডানার পালক।

অতএব আমাদের দহলিজে
বৃষ্টি
  বৃষ্টি
    বৃষ্টি
জমির জায়নামাজে এখন
আমাদের ফসল বুনার সময়।

অবাঞ্ছিতের দর্শন

ড.মো. রেদওয়ানুর রহমান

ওরা দর্শন, যুক্তি বা ধর্মের বাণী মানে না
ইতিহাসের নির্যাস ওরা বোঝে না
ওরা বলে, এগুলো-ত বস্তাপচা পুরানো কিংবদন্তী
ও সব অবাঞ্ছিতের কাহিনীতে বস্তাবন্দী।

ধর্ম,দর্শন ও বিজ্ঞানের মর্মভেদ ওদের স্পর্শ করে না।
প্রতিবন্ধী যুবকের আর্তচিৎকার ওদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয় না
বিবেক ও মানবতার কফিনে ওরা শেষ পেরেক ঠুকে করছে উল্লাস
শকুনের মত মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি আর তরুণাস্থি চিবানো
ওদের ভোজন বিলাস।

কবি, সাহিত্যিক, গবেষক ও দার্শনিকরা ভীষণ আতংকগ্রস্ত
ওদের বিষাক্ত ছোবলে মদের সর্বাঙ্গে ক্যান্সারের অস্তিত্ব
আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ফেলেছে অক্টোপাস
হায়েনা ও দৈত্যের নখরের আঁচড়ে ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ।

ওরা মদের বলে ভ্রষ্ট
মধ্যযুগীয় বর্বর অপ্রকৃতিস্থ
আমরা বলতে পারি না রাতকে দিন
বলতে পারি না সত্যকে হীন
আমাদের তেল নাই ঘটিতে
তাই দিতে পারি না ওদের চরকাতে।

www.pathagar.com

দুঃসময়ের প্রার্থনা
ফজলুল হক তুহিন

এইসব দিন এইসব রাত কিভাবে গড়ায় আমাদের প্রভু
তুমি তো জানোই-রাতগুলো আর দিনগুলো সব খুন হয়ে যায়!
আমরা তো প্রভু ত্রিকালদর্শী নই– সাধারণ আমরা সবাই
অতীত-আগামী দেখি না, বুঝি না কুটিল পাঁকের বর্তমানও।

বুঝি ইউনুস নবীর মতন আটকা পড়েছি ঘাতক মাছের পেটে
বিষাক্ত দাঁতে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায় এই প্রাণের সীমানা!
হায়, আমাদের বাঁচাবে কে প্রভু? আমরা সবাই তো সরল
কি করে বাতাস নেবো ফুসফুসে? আমাদের চাই আলো মাটি জল।

প্রভু, আমাদের নদীগুলো সব আমাদের মতো মরে যায় দ্রুত
প্রাণের ভূগোল অশুভ ছায়ার ঈগলে ঈগলে ভরে যায় দ্রুত!
আমরা সবাই আজ রুস্তম-আমাদের কাঁধে সোহ্‌রাব লাশ
প্রভু, আমাদের মাথার উপরে ওড়ে ঘোরে তাই ভয়াল শকুন!

গ্রহণের দিন কেটে যাক প্রভু, সূর্যালোকিত দিন চাই আজীবন
আমাদের এই চেতনার নদী জোয়ারে জোয়ারে হোক পূর্ণিমাময়।
জানি প্রভু জানি, পৃথিবীর সব একদিন হবে লয়
তবু যেন প্রভু, ক্রমাগত হতে থাকে ইতিহাসে বোধের বিজয়।

মানুষ নাকি নষ্ট
হাবিবুল্লাহ মারুফ

সব মানুষ কি নষ্ট?
ও' নেগেটিভ রক্তের মতন সেবক বেশ ধরে
সর্বজনদাতা প্রেম মাতৃরূপী মা তোকেই দেব।
আবেদন নিবেদন নষ্ট প্রহর ফুরিয়ে স্বদেশের দ্বারে
কবিতার অনুরোধ ব্যাখ্যা হয়েছিল তবু হুস্ এলোই না
চির সবুজের দেশ রক্তাক্ত দুর্দশাগ্রস্ত হল
তবুও তোমার বোধ ভোঁতা হয়েই চলল
শাশ্বত একই রক্ত টেকনাফের মানুষ
এবং তেতুলিয়ার মানুষের শিরা দিয়ে বহে
বিভাজনের কালচে শুয়ার হটাও তবে-
ওদের কবিত্বপনা কবিতার পাতা হতে খসে পড়বেই
মানুষকে যারা নষ্ট মৌলবাদের দুর্নামী প্রেমে বাঁধতে চায়
এবং বলেই বসে সরল মানুষ নাকি নষ্ট।

www.pathagar.com

অন্য রকম বৃষ্টি
শাহনাজ পারভীন

আষঢ়ের ছোঁয়া পেয়ে ফোটেনি কদম
বৃষ্টিরাও প্রতিবাদে পাল্টায় রং
মেঘভর্তি আকাশেরা মিছিলের ঢং
চাতকের চাওয়াতে ফাটে পৃথিবীর দম।

দিনের মধ্যে ঢোকে রাতের খেলা
যুদ্ধ হত্যা ধর্ষণ আর আহাজারী
তবু নেই কোন মেঘ শুধু বাড়াবাড়ি
বিবেকের পাড় ভাঙে পৃথিবীর মেলা।

দোহাই বৃষ্টি তোমার আষাঢ়ে ঝরো
প্রতিবাদে কখনোই হারিও না রং
দাউ দাউ লেলিহান আগুন আড়ং
সবুজ বৃষ্টি নয় কাঙ্খিত কারো।

বৃষ্টি তুমি হও মায়াবী পরশ
আমরা যতই করি জুলুম তোমার
ওরা তো তোমার গান গায় বেশুমার
পৃথিবীর ধুলিকণা কিংবা আরশ।।

রক্তাক্ত কারবালার সচিত্র রিভিউ
সা'দত ইবনে সিদ্দিক

লজ্জা, শরম, শালীনতাবিষয়ক
সব শব্দের মাথা খেয়ে
ইহুদীরা বিছিয়েছে শ্বেতচাদর
ফালুজা আর গাজায়
যেন রক্তাক্ত কারবালার সচিত্র রিভিউ।
বিশ্বাসী মানুষ এবং তার স্ত্রীরা,
সন্তানেরা নিরবচ্ছিন্ন হত্যা হয়।
গোলাপ রঙা রক্ত ছড়িয়ে,
সাদা চাদরটি ভিজে
লাল আর খুব ভারী হয়ে ওঠে
সুঠাম দেহের কেউ ছিঁড়তে
পারে এ বেদনার বিবর্ণ সিক্ত বসন।
কার হিম্মৎ পৃথিবী জানতে চায়
তার শান্তিকামী মিছিলে।

www.pathagar.com

আয়নার ওপাশে

আবু বকর সিদ্দিকী

সফির ছোট এ ঘরখানা টিনের চৌচালা হলেও সাইডের দুখানা বেড়া বাঁশের বাকল দিয়ে তৈরি আর দু'খানা পাটকাঠির। অযত্নে জীর্ণশীর্ণ পশ্চিমের বেড়াখানার পাটকাঠির ফাঁক গলিয়ে শীতের বিকেলের টুকরো টুকরো মিষ্টি রোদ অন্য দিনের মত আজও ঘরের ভিতরটায় ছড়িয়ে পড়েছে। এর ভিতরের পার্টিশনের সাথে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো একখানা মাঝারি সাইজের আয়না ঝুলানো। বেড়ার ফাঁক গলিয়ে আসা এক টুকরো আলোকরশ্মি সে আয়নায় প্রতিবিম্বিত হওয়ায় ঘরখানা উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে– হঠাৎ কারো দৃষ্টি পড়লে মনে হবে ভিতরটায় আগুন ধরেছে।

মেহেরজান সেই আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টচিত্তে সাজগোজ করছে। সাজের নানা উপকরণ নিয়ে দীর্ঘ কসরত শেষে এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে নিজেকে দেখলো সে। এতক্ষণ পর সাজটা যেন কিছুটা মনে ধরেছে তার। নিজেকে এখন বড় অপরূপা লাগছে। আপ্লুত দৃষ্টিতে আয়নার মানুষটাকে দেখছে সে। একসময় অপরূপ ভঙ্গিমায় জিভ দিয়ে ভেংচি কাটে। তারপর নিঃশব্দ হাসিতে যেন লুটোপুটি খায়। বাইরের আঙিনায় লাউ মাচাটার নিচে বসে বৃদ্ধা শাশুড়ি 'বৌ বৌ' বলে চেঁচাচ্ছে। সান্ধ্য খাবারের আশায় হাঁসগুলো প্যাকপ্যাক রবে উঠোনময় ছুটোছুটি করছে। এখনো রাতের রান্না বসানো হয়নি, বেলা প্রায় গড়িয়ে যাচ্ছে। সেদিকে যেন খেয়াল নেই তার।

একটা সুন্দর গোলাপী সুতী শাড়ি আর সাজগোজে অপরূপ মানিয়েছে তাকে। মেহেরজান আরেকবার নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। একটা অন্যরকম চঞ্চলতা আর ভাললাগার আবেশ যেন তার সারা অঙ্গে ছড়িয়ে আছে। "সেইবার তো ও মাগরিব বেলায় চইলা আইলো, এইবারও যদি.....।"

বৃদ্ধা শাশুড়ি হালীমা খাতুনের ক্ষীণ ডাক এতক্ষণ পর যেন তার কানে গেল। মেহেরজান সচকিত হলো। উৎকণ্ঠিত গলায় বলল– 'আসতাছি আম্মা!' হায় আল্লাহ! এখনো রান্না বসানো হয়নি, ধোয়া-ফালার কাজ পড়ে আছে, হাঁসগুলো ছুটোছুটি করছে; বিকেলের কোন কাজেই হাত দেয়া হয়নি। আগেভাগে আজ সব গুছিয়ে রাখবে ভেবেছিল সে, কিন্তু তা আর হয়ে উঠবে না।

মেহেরজান এটো থালা-বাসন হাতে বাড়ির সাথে লাগোয়া কুয়োটার দিকে এগোয়। পথে মাচাটার নিচে শাশুড়ি শীতের বিকেলের শেষ রোদটুকু উপভোগের আশায় এখনো পিঁড়ি পেতে বসে আছে। আজ সাজগোজ করায় শাশুড়ির মুখোমুখি হতে ভীষণ লজ্জা লাগছে তার। তাছাড়া সাজের হেতু বুঝে নিতে বুড়ির বেশি সময়ও লাগবে না। তখন শুরু করবে হাজারটা প্রশ্ন।

মেহেরজান শাড়ির আঁচলে নিজেকে আড়াল করে বলল– 'ক্যান্ ডাকতাছেন আম্মা?'

'তুমি বৌ কই গেছিলা কওচাই দেহি। সেই কহন থাইকা ডাকতাছি। এহনোতো রান্নাও বহাওনি। আর হাঁসগুলা দেখ্ছ কেমন করতাছে! শাকেরা কই গেল, সেই পোড়াকপালিও আমারে জ্বালাইয়া মারলো। সিধা-সাধা হইলে কি হইবো, এক বিন্দু ঘরে থাকবো না– টো-টো কইরা পাড়া বেড়াইবো। তুমি আমার লাইগ্যা অজুর গরম...।'

www.pathagar.com

হালীমা খাতুন কথা শেষ করতে পারলো না, খুক্ খুক্ করে ভীষণভাবে কাশতে লাগলেন। দীর্ঘদিনের পুরনো হাঁপানিজনিত কাশি। মেহেরজান কিছু না বলে পাশ কেটে কুয়োর দিকে যেতেই তিনি নিজেকে সামলিয়ে আবার বললেন– 'রাঁনবার আগে অযুর পানিটা বহাইয়া দিও, আমি হাঁসগুলারে খাওন দিতাছি।'

মেহেরজান চুলা থেকে গরম পানির হাঁড়ি নামিয়ে মাটির সরায় ঢেকে রাখলো। মাটির চুলার একটিতে ভাত আর অন্যটিতে শাক বসিয়ে দিল। আজ রান্নার উপকরণ ভাল নয়। ডাল, লালশাক আর গুঁড়ো মাছের চচ্চড়ি। মানুষটা আসবে শুনলে শাশুড়ি এতক্ষণে নানা আয়োজনে মেতে উঠতো, কিন্তু সে আজ বলবে না, কিছুতেই না। মেহেরজান বাড়তি চাল ঠিকই বসিয়েছে, ভেবে রেখেছে আসলে না হয় দুটো ডিম ভেজে নিয়ে যাবে।

ও আজ আসবে চিঠিতে সামান্য ইঙ্গিত করেছে মাত্র। তাও আবার কবিতার ঢঙে। ছিঃ পুরুষ মানুষ এত পাজি হয় কি করে! আর সেইবা তার চিঠিতে কি করে এমন একটা ছন্দ লিখতে পারলো! মেহেরজান লাজরাঙা হল। নিজের চিঠি, স্বামীর চিঠি, কবিতা, মন্তব্য এসব মনে হতেই সে শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরলো।

চুলা থেকে শাক নামিয়ে মেহেরজান কেচকি মাছের চচ্চড়ি বসাল। তাতে হলুদ, মরিচ, লবণ দিয়ে কাঠি হাতে নাড়তে লাগলো। শাশুড়ি হালীমা খাতুন সে সময় দরজায় এসে উদাস গলায় বলল– 'ও বৌ, আইজ ইংরাজি মাসের কয় তারিখ গো?'

শাশুড়ির কথা শুনে মেহেরজান যেন অপ্রস্তুত হল। উনার হঠাৎ তারিখের খোঁজ– কিছু কি আঁচ করল! লজ্জায় সংকুচিত হয়ে সে হালকা গলায় বলল– 'সতের।'

হালীমা খাতুন উদাস গলায় বলল– 'ও, সফির বেতন পাইতে তো এহনো অনেক দেরি। বেতন না পাইয়া তো বাড়িত ও আইবো না– না বৌ?'

মেহেরজান কিছু বলল না। চুপ করে বসে রইল। তিনি ঠিকই আঁচ করেছেন, এখন শুধু নিশ্চিত হতে চাইছেন। বৌকে নিরব দেখে হালীমা খাতুন আবার বলল, 'সফি বাড়ি থাইকা গেছে কয়দিন হয় বৌ?'

মেহেরজান শাশুড়ির দিকে তাকাতে পারছে না। সাজগোজ করায় ভীষণ লজ্জা লাগছে। উনি যে সে কারণে ছেলের প্রসংগ তুলেছে তা সে নিশ্চিত। এখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো নিশ্চিত হতে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকবে। মেহেরজান অনেকটা ব্যস্ততার ভঙ্গিতে অন্যদিকে মুখ করে বলল, 'এক মাস তের দিন।'

ঠিক সে সময়ে হাঁসগুলো একযোগে বশত ঘরে ঢুকে গেল। হালীমা খাতুন হাঁস তাড়াতে সেদিকে ছুটে গেলেন। মেহেরজান যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সে আবার রান্নার কাজে মন দিল।

মেহেরজানের খুব অস্বস্তি হচ্ছে। মনটাও খারাপ হল। এত সুন্দর করে সেজেছে সে কিন্তু চুলার ধোঁয়া আর কালির মাখামাখিতে এখন গা ঘিনঘিন করছে। তার সুন্দর মসৃন হাত দু'খানায় কালির প্রলেপ পড়েছে। কোন অসতর্ক মুহূর্তে তা কপাল ও গালে গিয়েও ঠেকেছে। কেন রান্নার আগেই সাজতে গেল সে নিয়ে আক্ষেপ হচ্ছে। কিন্তু মানুষটাতো সেবার...।' আপন মনেই যেন ওর ফর্সা মুখে হাসির রেখা খেলে গেল।

গ্রামীণ জীবনে রান্নাঘরের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটাই রূপসচেতন মেহেরজানকে বেশি পীড়া দেয়। মেহেরজান স্বামী সফি'র সাথে এ নিয়ে অনুযোগ করেছে। ও তাকে শহর জীবনের কার্বনমুক্ত গ্যাসের চুলার স্বপ্ন দেখায়। স্বামীর উচ্ছ্বসিত মুখে এসব শুনলে মেহেরজানের

www.pathagar.com

ভিতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। এটা যে আসলেই দুঃস্বপ্ন তা সফি বোঝে কিনা সে জানে না।

হালীমা খাতুন অনেকটা ছুটে এসে রান্না ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'ও বৌ, চুলায় কি পুড়ছে গো? কিসের পোড়া গন্ধ পাইতাছি?'

শাশুড়ির কথায় মেহেরজানের যেন চেতন ফিরে। সে উদ্বিগ্ন মুখে কাঠের কাঠি হাতে চচ্চড়ি বসানো কড়াইয়ের তলাটা ব্যস্ত হাতে ঘষতে থাকে। কিন্তু ততক্ষণে ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া উড়ছে। মেহেরজানের বুক কেঁপে ওঠে। এখন নির্ঘাত বকা শুনতে হবে। সে দ্রুত কড়াইতে পানি ঢেলে তা সামাল দিতে চেষ্টা করে। হালীমা খাতুন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে রইলেন। যাবার আগে ব্যতিক্রমী গলায় বললেন, 'তোমার আইজ কি হইছে বৌ!'

পাশের বাড়ির আমীর হোসেন ওরফে 'টুনু মেম্বার' সে সময় ভিতর আঙিনায় এসে স্বভাব সুলভ ভংগিতে হাঁক ছেড়ে বলল, 'ও চাচি, তোমরা বৌ-শাশুড়ি কি পাকাইতাছ আইজ? দাওয়াত-টাওয়াত দিবা নাকি চাচি?'

লোকটার আগমনে মেহেরজানের ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি হচ্ছে। বলা নেই, কওয়া নেই হুট করে অপরের আঙিনায় ঢুকে পড়ার অনুচিত বোধটুকু ভদ্রলোকের একেবারেই নেই। শুধু আজই নয়, আরো একাধিক দিন ভিতর বাড়ি ঢুকে এভাবে খোশগল্প জুড়ে দিয়েছে। তাছাড়া তার চোখের দৃষ্টিও খুব একটা ভাল ঠেকে না। দুই বৌ নিয়ে ঘর-সংসার হলেও কেমন যেন ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকে, গায়ে পড়ে কথা বলার চেষ্টা করে। মেহেরজান শাড়ির আঁচলে নিজেকে আড়াল করে রান্নার কাজে ব্যস্ত রইল। শাশুড়ি হালীমা খাতুন মেম্বারের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, 'আরে, মেম্বর যে! গরীবের দুয়ারে দেহি হাতির পা। ও বৌ, মেম্বররে বইতে দেও। আইচ্ছা থাক, তুমি বহ, আমিই দেই।'

হালীমা খাতুন ব্যস্ত পায়ে ঘরের দিকে ছুটে গেল। টুনু মেম্বার বলল– 'চাচি, তুমি ব্যস্ত হইও না। আইলাম তোমাগরে দেখতে, সফি বাড়ি আইব কিনা জানতে।'

হালীমা খাতুন চারপায়া একখানা টুল বাহির আঙিনায় রেখে বলল, 'বহ মেম্বর, এহানে বহ। তোমার বৌ-বাচ্চারা ভালা আছেনি?'

'আছে চাচি, ভালাই আছে। সফি কবে আইবো-টাইবো জানেননি কিছু? সফির সঙ্গে একটা ব্যাপারে আলাপ করুম ভাবছি।'

হালীমা খাতুন বললেন, 'সফির কথাইতো বৌ'র কাছে কইতেছিলাম। বেতন না পাইয়া তো আইবো বইলা মনে হইতাছে না।'

মেম্বার বলল, 'সফি বাড়ি আইলে আমারে খবর দিবা, একটু থেমে রসঘন গলায় বলল, 'আপনে বড় ভাগ্যবান চাচি। আল্লায় আপনেরে একটা ছেলেই দিছে। আরে থুক্কু শুধু ছেলে বলি ক্যান্-বৌও দিছে। যেমন বংশ, তেমন রূপ-গুণ। এমন ভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয় চাচি।'

মেম্বারের কথা শুনে মেহেরজান সংকুচিত হয়ে নিজেকে আরো আড়াল করল। ছেলে, ছেলেবৌয়ের প্রশংসা শুনে আপ্লুত হালীমা খাতুন প্রথমে উদাস, পরে ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'হের লাইগাইতো কতজনের রাইতের ঘুম হয় না, হিংসায় বাঁচে না, আমারে কথায় কথায় খোঁটা দেয় মেম্বর! বলি, আমার ছেলের লাহান একটা ছেলে কি এই পাড়ায় আছে?– আমার পোলা মেট্রিক পাস, বৌ ছয় কেলাস পাস দিছে। পোলা শহরে চাকরি করে। মেম্বর, তুমিই

www.pathagar.com

কও, এই পাড়ায় এমন শিক্ষিত্ পোলা আর একজন খুঁইজা পাইবা? এমন শিক্ষিত্ বৌ কি আর কারো আছে?– তবু আমারে তাচ্ছিল্য করে, ঝগড়া বাধায়, হিংসায় বাঁচে না।'

মেম্বার বলল, 'আপনে ঠিকই কইছেন চাচি। এই পাড়ায় তো আপনের ঘর ছাড়া শিক্ষার আলো ঢুকে নাই। সব মুর্খের দল হইল গিয়া এই পাড়ায়। তার মইধ্যে আপনেরা হইলেন একমাত্র প্রদ্বীপ। আইজ চাচায় বাঁইচা থাকলে বৌ দেইখা কত যে খুশি হইত চাচি। মানুষটার কপালে একমাত্র ছেলে বৌ দেইখা যাওনের ভাগ্য হয় নাই। চাচি, সফি বাড়ি আইলে দেখা করতে কইবা। ওর সংগে আলাপ আছে।'

হালীমা খাতুন কিছু বললেন না। মেম্বারের মুখে স্বামীর প্রসংগ আসায় তার দু'চোখ ভিজে গেল। তিনি দুঃখিত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। মেম্বার আবার বললেন, 'তোমাগো বৌ-শাশুড়ির দাওয়াত চাচি। তুমি বৌ নিয়া বেড়াইতে যাইবা। আমি অহন যাই।'

হালীমা খাতুন নিজেকে স্বাভাবিক করে বললেন, 'অহন যাইও না মেম্বর। রাইতে খাইয়া যাও। আইজ তরকারি ভালা না। তবু শাক-ডাইল দুইটা খাইয়া যাও। বাজার করার লোক নাই, জন নাই– কারে দিয়া কি করি কও?'

-'না চাচি, আইজ না। আরেকদিন খামু। তোমার বৌ'র হাতের রান্না খামু। আইজ বৌ কি পাকাইতাছে সেইটা দেইখ্যা চইলা যামু।'

মেম্বার বসার টুল ছেড়ে চুলার দিকে এগুতে লাগলো। মেহেরজান তা বুঝতে পেরে আরো জড়োসড়ো হয়ে বসলো। মেম্বার কাছে গিয়ে বলল, 'কি পাকাইতাছ? আইজ কিন্তু খামু না, আরেক দিন খামু। তোমার হাতের পাক খামু। এত লজ্জা পাইতাছ ক্যান্, আমরা কি পর কেউ? ও চাচি, তোমার বৌ দেহি লজ্জায় মইরা যাইতাছে। গুঁড়া মাছ পাকাইতাছ, না?'

মেহেরজান ঘোমটার নিচ থেকে মাথা নাড়লো। মেম্বার আবার চেঁচিয়ে বলল, 'চাচি, তুমি কি বৌটারে এইসবই খাওয়াইবা নাকি! একটু ভালা-টালা খাওয়াইতে পার না? বড় ভালা বংশের মাইয়া পাইছ, একটু যত্ন-টত্ন নিও।'

হালিমা খাতুন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় নেমে বলল, 'কি করুম মেম্বর, যা পারি তা'ই খাওয়াই। আমার কে কি করে কও? ফজলুরে দিয়া আড়ং (গাঁয়ের ছোট বাজার) থাইকা দশ টাকার গুঁড়া মাছ আনাইছি, হেগুলা রানতাছে।'

মেম্বার বলল, 'আইচ্ছা ঠিক আছে, তুমি সময় পাইলে আমাগো বাড়ির দিকে একটু আইসো, বৌটারে কয়টা মাছ দিমু। নাহ্, থাক, আমিই কাউরে দিয়া পাঠাইয়া দিমু। বড় পুকুরের জাগটা বেড় দিছি। অনেকগুলা কৈ, শিং, মাগুর পাইছি। গেলাম চাচি।'

হালীমা খাতুন বলল, 'আবার আইসো মেম্বর।' মেম্বার আসবো, বলে আঙিনা ছেড়ে এগিয়ে যেতে লাগলো।

মেহেরজান দ্রুত সবকিছু গুছিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। মাগরিবের আজান পড়ে গেছে, তাকে নামায সারতে হবে। ননদ শাকেরা কোথা থেকে এসে কৌতূহলি মুখে মেহেরজানের দিকে তাকিয়ে আছে। মেহেরজান না দেখার ভান করে আপন কাজে ব্যস্ত রইল। সরলা শাকেরা একসময় স্বভাব-সুলভ ভংগিতে বলল, 'ও ভাবী, আইজ সাইজা-গুইজা চুলার পাড়ে কাগো, মিয়া ভাই আইবো-টাইবোনি? ইস, সাইজলে কি সুন্দর দেহায় তোমারে!'

মেহেরজান কিছু বলল না– তাকালোও না। সে দ্রুত কাজ সেরে উঠতে চাচ্ছে। শাকেরা আবদারের সুরে আবার বলল, 'ও ভাবী, মিয়া ভাইরে কইবা আমার লাইগ্যাও সুন্দর শাড়ি

www.pathagar.com

আনতে। আমিও তোমার লাহান সাজমু, লিবিষ্টিক দিমু, কপালে টিপ দিমু। আমি সাইজলে তোমার থাইকা কম সুন্দর লাগবো না। হায় হায়রে, কেরামতরেতো আল্লার গজবে ধরছে। হে আমারে তালাক দিছে, ভাত কাইড়া নিছে। আমি নাকি পাগল, সিধা। আইচ্ছা ভাবী, তুমি কওতো আমি পাগলনি, সিধানি? কেরামতের লাহান পুরুষরে সাতবার বেচতে পারি, আর আমারে কয়.....।'

স্বামী পরিত্যক্তা সরলা ননদের কথায় মেহেরজানের মুখে হাসি পেলেও তা চেপে রেখে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'এইবার বক্ বক্ বন্ধ করেন। কই আছিলেন সারাক্ষণ? এইরকম পাড়া বেড়াইলে হইব? নামাযের সময় যাইতাছে। হাঁড়ি-পাতিলগুলা ঘরে নেন। আমি অযু কইরা আসি।

শাকেরা বলল, 'ফরিদা বু'গ বাড়ি গেছি। একটা কামে গেছি। তুমি যাও, আমি সব কিছু নিতাছি।'মেহেরজান কিছু বলল না। সে থালা-বাসন হাতে দ্রুত কুয়ার পাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

নামায শেষে বিছানা হাতে মেহেরজান উঠে দাঁড়ালো। উঠানের দিক থেকে শাশুড়ি হালীমা খাতুনের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। জীতু আর জীতুর বৌ চড়া গলায় গালাগাল করছে। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই এ ব্যাপারটা ঘটে। আজ আবার কি নিয়ে কে জানে। এভাবে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধালে কি করে বসবাস সম্ভব মেহেরজান বুঝতে পারছে না। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, একটা নিয়ে যেন লাগা চাই'ই।

হালীমা খাতুন ছুটে এসে ঘরের দাওয়ায় মেহেরজানকে দেখে বলল, ও বৌ, জীতু, জীতুর বৌ কি গালমন্দটা করতাছে হুনছনি। আমাগো হাঁস নাকি তাগো ঘরে ঢুকছে। এর লাইগা এই কাণ্ড। কইলাম, তোরা যে আমাগো ভাগে গরুঘর তুলছত, গরু দিয়া দিন-রাইত অত্যাচার করতাছত, তাওতো আমরা কিছু কই নাই। আর জীতু কয় কিনা এইটা নাকি তাগো জায়গা। আমাগো ভাগে অরা নাকি আরো পাঁচ হাত পায়। সেই জায়গায় ঘর তুলবো, যা ইচ্ছা তা'ই করবো।'

উত্তেজিত হালীমা খাতুন একটু থামলেন। তারপর বেদনাহত কণ্ঠে বললেন, 'এই বাড়িতে থাকতে পারবা না বৌ! তারা গায়ের জোরে সব কিছু করতে চায়। আমাগরে বাড়ি থাইকা তুইলা দিতে চায়। খোকা বাড়ি আসুক, এইবার একটা হেস্তন্যাস্ত কইরাই ছাড়ুম। মেম্বার ডাকুম, মাদবরগরে ডাকুম, তারা কি কয় আমি একটু দেখুম।

মেহেরজান নরম গলায় বলল, 'থাক, আপনে ঘরে আসেন। অরা কইলেই তো হইবো না। আপনের ছেলে আছে, গাঁয়ে মানুষ আছে।'

হালীমা খাতুন আবার বললেন, 'ফজলু আর ফজলুর বাপে ডাক দেয়ায় তাগরে পর্যন্ত গালমন্দ কইল। এক রক্তের মানুষ হইয়া এমন করলে ক্যামনে বাস করবা কও?'

মেহেরজান কিছু বলল না। সে তার শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। হালীমা খাতুন গজ্ গজ্ করতে করতে ঘরের ভিতর পা রাখলেন।

থানা সদর থেকে প্রায় পনের কিলোমিটার দূরে 'বিলাসপুর' একটি অজপাড়া গাঁ। নামে বিলাসপুর হলেও প্রকৃতির শ্যামল স্নিগ্ধ রূপ ব্যতীত কোন বিলাসী উপকরণ বা বিলাসবহুল

www.pathagar.com

জীবন যাপনের সামর্থ এ গ্রামের মানুষদের নেই বললেই চলে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি এ গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষই হত দরিদ্র এবং সকলেই কৃষক ও কৃষি শ্রমজীবী। প্রায় শিক্ষার আলো বঞ্চিত এ গ্রামটি পূর্ব ও পশ্চিম পাড়া নামে দু'ভাগে বিভক্ত। পূর্বপাড়ার মানুষ তুলনামূলক স্বচ্ছল ও শিক্ষা-দীক্ষায় খানিকটা অগ্রসর হলেও পশ্চিম পাড়ার অধিকাংশ মানুষই ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন কৃষক এবং কৃষি শ্রম বিক্রিই তাদের জীবিকার প্রধান উপায়। অবশ্য অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানান পেশাও ইদানিং কেউ কেউ বেছে নিচ্ছে। সেই পশ্চিম পাড়ারই একটি 'ঢালি বাড়ি।' এ বাড়িতে চৌদ্দ-পনের গৃহস্তের বসবাস। সকলেই এক বংশের। তবে জীতু, একাব্বর, মুদাব্বর, নেকবর ও দিদার– এরা পাঁচ ভাই সফিকুর রহমান 'সফির' আপন রক্তের। অর্থাৎ তার একমাত্র চাচা কুতুবউদ্দিন ঢালির পাঁচ ছেলে ওরা। কুতুবউদ্দিন ঢালি বছর পাঁচেক আগে মারা গেছেন। সফির বাবা জমিরউদ্দিন ঢালিও বেঁচে নেই। পিতার একমাত্র ছেলে হওয়ায় সফির বশত ভিটায় ভাগ পড়েনি। বশত ঘর ছাড়াও এক চিলতে উঠান, আঙিনা ও খানিকটা খালি জায়গা উঠানের সাথে জুড়ে রয়েছে, যেখানটায় সফির মা হালীমা খাতুন তরী-তরকারীর আবাদ করে থাকেন। সফির সীমানা ছেড়েই জীতুদের ভিটি ও ঘর। পাঁচ ভাইয়ের পৃথক ঘর তোলার মত জায়গা না থাকায় তারা অনেকটা যৌথ পরিবারের মতই বসবাস করছে। পশ্চিম পাড়ায় সফিই সর্বোচ্চ শিক্ষিত যে কিনা এস.এস.সি. পাস এবং শহরে ছোট হলেও একটি চাকুরি করছে। অন্যদের তুলনায় সফির ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন হওয়ায় জীতুদের পরিবারসহ বাড়ির কেউ কেউ তাকে হিংসার চোখে দেখে। এর থেকেই কারণে-অকারণে, গায়ে পড়ে ঝগড়ার সূত্রপাত। সফির অনুপস্থিতিতে তার মাকে সে সব অনাহূত পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। আজও অতি ক্ষুদ্র একটা বিষয় নিয়ে তাকে কথা কাটাকাটি করতে ও গালাগাল শুনতে হলো।

মেহেরজান এখনো রাতের খাবার খায়নি। এশার নামায পড়ছে সে। শাশুড়ি ও শাকেরা খেয়ে-দেয়ে বিছানা নিয়েছে। তাদের আহবানে নামায সেরে খাবে বলে জানিয়েছে। মেহেরজান দীর্ঘ সময় নিয়ে নামায পড়লো, দীর্ঘ মোনাজাত শেষ করলো। রাত সাড়ে ন'টা বাজে। গ্রামীণ জীবনে সাড়ে ন'টা মানে অনেক রাত। তার কেমন জানি অস্বস্তি হচ্ছে। এত রাততো ও কখনো করেনি, বিকেল বা সন্ধ্যার আগেই বাড়ি এসে পোঁছেছে। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধাও মোচড় দিয়ে উঠেছে। গ্যাসটিকের সমস্যা থাকায় পেটে চিন্ চিন্ ব্যাথা করছে। ও আসলে খাবে বলে ভেবে রেখেছে, কিন্তু...।'

হারিকেনের মৃদু আলোয় মেহেরজান এটা-সেটা করছে। কখনো বা অস্বস্তি নিয়ে বিছানায় বসছে। একসময় মনে হলো সফি কবিতার ঢঙে যে ইংগিত করেছে তা আসলে বাড়ি আসার সংকেত কিনা। মেহেরজান তড়াক করে তাকের উপর রাখা স্যুটকেসটা নামায় যেখানে সফির সদ্য চিঠিসহ সকল চিঠিই অতি সযতনে রাখা। সে চিঠিটা হাতে নিয়ে মেলে ধরে। কবিতার বিশেষ লাইনটা বার বার পড়ে। যদিও সম্ভাবনার কথা, কিন্তু বাড়ি আসারই ইংগিত। চিঠি এবং আগপর ঘটনা মেহেরজানের কাছে তা'ই জানান দিচ্ছে। মেহেরজান পুরো চিঠিটা আবার পড়তে শুরু করে। কবিতার অংশে আসতেই লজ্জায় সংকুচিত হয় সে। মানুষটা জাত কবি হলেও পাজি কবি। আর সেইবা নিজ চিঠিতে কি করে এমন একটা ছন্দ লিখতে পারলো। ছিঃ!-সে কথা মনে হতেই মেহেরজান লজ্জাবতী লতার মত আরো সংকুচিত হল। এ মুহূর্তে নিজেকেও পাজিনি কবি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না সে। সফির আগের চিঠিটার শেষ লাইনের উত্তরে অনেকটা ঘোরের মাথায়, 'শিশিরে কি ভিজে বন বিনা বরষণে,

www.pathagar.com

পত্রে কি জুড়ায় মন বিনা দরশনে" ছন্দটি লিখেছিল। আর তার সে ঘোর ভাঙে চিঠি ডাকে ছেড়ে দেয়ার পর। তখন লজ্জায় দিনের মাঝে শতবার জিভে কামড় দিয়েছে; বার বার মনে হয়েছে প্রাপকের কাছে পৌঁছার আগেই যদি চিঠিটার গতিরোধ করা সম্ভব হতো!'

মেহেরজান সফির চিঠিটা বুকের কাছে আলতো করে চেপে রাখে। কবিতা মানুষের জন্য হলেও চিঠির উত্তরে মানুষটা যে কবিতা লিখেছে তা একান্তই শুধু তার– শুধুই তার। তৃতীয় নয়ন এই পাজি কবির কবিতা কোনদিন দেখবে না, পড়বে না, জানবে না– কিছুতেই না। এর ভাগ সে কাউকে দিবে না।

কিসের শব্দে যেন মেহেরজানের ঘোর ভাঙ্গে। সে অতি ব্যস্ত হাতে চিঠিটা বাক্সের ভিতর রাখে। ব্যস্ত ভংগিতে বিছানা থেকে নামে। আবারও শব্দ হয়েছে মনে হতেই অস্ফুট মুখে 'আসছি' বলে দরজার দিকে ছুটে যায়।

মেহেরজান দরজা খুলে দাঁড়ায়। কিন্তু কাউকে না দেখে যেন হতাশ হয় সে। অতি ব্যস্ত চোখে রাতের আঁধারে এদিক-ওদিক তাকায়। মানুষটা তো মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলে। আজও করছে কিনা কে জানে! কিন্তু না, কোন আড়াল হতে তাকে চমকে দিতে মানুষটা এগিয়ে আসেনি; সেরকম কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। প্রোজ্জ্বল্ মুখখানা ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে তার। দরজা ধরে উদাস দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় অলস হাতে দরজার খিল আটকায় তারপর অলস পায়ে শোবার ঘরের দিকে এগুতে থাকে।

মেহেরজান শোবার ঘরে ঢুকলো। তার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। বাড়িময় একটা নিস্তব্ধ নিরবতা চেয়ে আছে। একটু আগে প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেট চিন্ চিন্ করলেও এখন সে ব্যথা, ক্ষুধা কোনটাই নেই। কিছু খেয়ে নিবে কিনা সে বুঝতে পারছে না। শাশুড়ির খুক খুক কাশি আর হাঁপানির শব্দ পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে। শাকেরার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মেহেরজান কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একসময় ধীর পায়ে পাশের ঘরে রাখা খাবারের দিকে এগিয়ে যায়।

থালা-পাতিলের টুংটাং শব্দ হচ্ছে। সে রাতের খাবার খেয়ে নিচ্ছে। হালীমা খাতুনের কাশি আর হাঁপানির মাত্রা যেন বেড়ে গেছে। কাশতে কাশতে তিনি এক সময় বিষম খেলেন। অতি কষ্টে ডাকলেন– 'বৌ'।

মেহেরজান খাওয়া শেষ করলো। ব্যস্ত পায়ে শাশুড়ির দিকে এগিয়ে গেল। হালীমা খাতুন ক্ষীণ গলায় বললেন– 'মারে, আইজতো ঘুমাইতে পারুম না মা! কি অসহ্য.....।'

হালীমা খাতুন কথা শেষ করতে পারলেন না, আবার প্রচণ্ডভাবে কাশতে লাগলেন। মেহেরজান দ্রুত পায়ে রান্না ঘরের দিকে এগোয়। রসুন বেটে সরিষার তেল মিশিয়ে গরম করে। তারপর শাশুড়ির কাছে ছুটে আসে।

দীর্ঘ সময় নিয়ে দক্ষ হাতে শাশুড়ির বুকে, হাতে-পায়ে গরম মালিশের পর হালীমা খাতুন কিছুটা আরাম বোধ করলেন। আন্তরিক সেবায় মুগ্ধ হয়ে তিনি এক দৃষ্টিতে পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আজকাল এমন মেয়ে হয় না। এমন বৌ মেলা খুবই ভাগ্যের ব্যাপার। এ মেয়েকে তিনি আপন মেয়ের মত স্নেহ করেন। কিন্তু ছেলে, ছেলেবৌ-এর বিচ্ছিন্ন জীবন, বিষণ্ন মুখ তাকে বেশ পীড়া দেয়। তাদের উচ্ছল প্রাণবন্ত জীবনের পথে নিজেদের বড় অন্তরায় মনে হয়। একদিকে ছেলের দূরদেশে চাকুরি, অন্যদিকে স্বামী পরিত্যক্ত সরলা মেয়েটাকে নিয়ে বাড়িতে বিকল্প অবলম্বনশূন্য অবস্থায় এর কি সমাধান তা হালীমা খাতুনের মাথায় আসে না। হালীমা খাতুন একসময় নিজের স্নেহমাখা হাতখানা মেহেরজানের হাতের

www.pathagar.com

উপর রাখলেন। দরদ মাখা গলায় বললেন, 'এত রাইত কইরা খাইতে ছিলা ক্যান্ মা?'

মেহেরজান কিছু বলল না। তার ভিতর থেকে একটা ছোট শ্বাস বেরুল। সে আবার ধীর গতিতে শাশুড়ির বুকে হাত বুলাতে লাগলো। মানুষটার জন্য এখন তার প্রচণ্ড রকমের দুশ্চিন্তা হচ্ছে। আসবে বলে তাদের দু'বছরের বিবাহিত জীবনে এমনটি আর ঘটেনি। সে জন্যই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুত্রবধূকে নিরুত্তর দেখে হালীমা খাতুন প্রসংগ পাল্টিয়ে বললেন, 'খোকায় তো বাড়ি থাইকা গেছে অনেক দিনই হইছে। কবে আইবো-টাইবো লেহেনি কিছু?'

মেহেরজান কি বলবে বুঝতে পারছে না। সে এবারও অনেকটা অস্পষ্ট ভংগিতে মাথা নেড়ে চুপ করে বসে রইল। হালীমা খাতুন নরম গলায় বললেন, 'মারে, কইছিলাম কি খোকারে কও ওহানে একটা বাসা-টাসা দেখতে। আমিও এইবার আইলে অরে কমু। আমার খোকা খানা-দানায় কি কষ্টটাই না পায়। গতবার আইল আর কেমন শুকাইয়া গেছে দেখছ? তুমি কাছে থাকলে আমার খোকা ভালা থাকবো।'

শাশুড়ির কথা শুনে মেহেরজান বিব্রত মুখে তার দিকে তাকালো। হঠাৎ এ প্রসংগ তোলার মত কোন আচরণ কি উনি প্রত্যক্ষ করলেন? মেহেরজান নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করলো। তারপর নরম গলায় বলল, 'তা কি কইরা হয় আম্মা! আপনেগরে রাইখা আমি যামু ক্যামনে ভাবতে পারলেন?'

হালীমা খাতুন বললেন, 'আমাগো কথা ভাইবো না। আমরাও না হয় মাইঝে-মইধ্যে তোমাগো ওহানে গিয়া থাইকা আসুম। বাড়ি-ঘর, জমি-জিরাত লইয়াইতো ভাবনা, নইলে তো....।'

হালীমা খাতুন আবার কাশতে লাগলেন। মেহেরজান শাশুড়ির মাথায় স্নেহের হাত রাখলো। একসময় তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হলেন। মেহেরজান অনেকটা ইতস্তত করে লজ্জিত মুখে বলল, 'আপনের ছেলে আইজ আইবো কইছিল, কিন্তু.....।'

পুত্রবধূর কথা শুনে হালীমা খাতুন চমকে উঠলেন। মেহেরজানের দিকে আতংকিত দৃষ্টি মেলে উৎকণ্ঠিত গলায় বললেন, 'কি কও বৌ! আমার খোকা তাইলে আইছে না ক্যান্? তুমি না কইলেও.....!' 'হায় আল্লাহ! অহন কি অইব! আমার সফি, আমার খোকা.....!'

হালীমা খাতুন বিছানা থেকে দ্রুত নামলেন। পুত্রের মংগল কামনায় ছুটে গিয়ে নামাযের বিছানায় বসলেন। শাকেরা বেসামাল হয়ে শুয়ে আছে। মেহেরজান শাকেরাকে কাঁথায় ঢেকে দিয়ে শোবার ঘরের দিকে এগোল। একসময় বিষণ্ন মুখে সে বিছানায় পিঠ লাগাল।

২

শেষ রাত থেকেই টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। একেতো শীতের মওসুম, তার উপর বৃষ্টির সাথে ঠাণ্ডা হাওয়া গ্রামীণ জনজীবনকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। বেলা যথেষ্ট হলেও কোন ঘরের খিড়কী খুলেছে বলে মনে হচ্ছে না। লেপ-কাঁথার ওমের ভিতর মানুষ নিশ্চিন্তে জীবন কাটাচ্ছে।

সফিদের ঘরেই শুধু ব্যতিক্রম। হালীমা খাতুন ও মেহেরজান একটি নির্ঘুম রাত অতিবাহিত করে ভোরের আলো ফুটতেই বিছানা ছেড়ে নামায সারলো। নামায শেষে দীর্ঘ মোনাজাতে নামাযের বিছানায় অতিবাহিত করল। শাকেরা এখনো কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে

www.pathagar.com

আছে। তার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হালীমা খাতুন ও মেহেরজানের মধ্যে এ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন দৃষ্টি বিনিময় ছাড়া কোন কথা হয়নি। বেলা যথেষ্ট হলেও খাবার আয়োজনে কেউ মেতে ওঠেনি।

ঘরের দরজায় বিষণ্নমুখে হালীমা খাতুন দাঁড়িয়ে আছেন। এখনো টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে। মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। সামনের কড়াই গাছটার ডালে বসে দুটো কাক পাখা ঝাপটাচ্ছে আর থেকে থেকে ডেকে যাচ্ছে। সেদিকে দৃষ্টি যেতেই তার ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। মুহূর্তেই দু'চোখ ছলছল করে অশ্রু গড়াতে লাগলো। তখনই মেহেরজান কোথা থেকে এসে শাশুড়ির পাশ ঘেসে দাঁড়ালো। হাজী বাড়ির আজাদ ঢাকা থেকে গতরাতে বাড়ি এসেছে শাশুড়িকে তা শুনালো। কথাটা শোনামাত্র হালীমা খাতুন বৃষ্টি মাথায় সজল চোখে হাজীবাড়ি অভিমুখে ছুটলেন। মেহেরজান বিষণ্ন মুখে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জীতুদের ঘর থেকে হৈ-চৈ ভেসে আসছে। একাব্বর আর মুদাব্বরের উত্তেজিত গলা শোনা যাচ্ছে। মহিলাদের মুখও সমান তালে চলছে। জীতুর মা আম্বিয়া খাতুন থামাতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না। এবার জীতুর গর্জন শোনা গেল। একাব্বরকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে বলে শাসাতে লাগলো। একাব্বর ও জীতুর মুখে মুখে কথা বলছে। বাপের সম্পদে সেও অংশীদার সে কথা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়ে তাকে বড় ঘরে থাকার ব্যবস্থার কথা বলছে। একাব্বরের কথায় জীতুর গলা আরো চড়ে গেল। তার গর্জনের নিচে সকল কণ্ঠ হারিয়ে যেতে লাগলো।

আম্বিয়া খাতুন বিষণ্ন মুখে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেদের থামাতে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এর কি সমাধান তিনি জানেন না। এক ঘরে পড়ে থেকে যে বিশ্রি পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে; দিন দিন এরা যেভাবে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে তাতে কি করে এ বাড়িতে বসবাস সম্ভব বুঝতে পারছেন না। তিনি শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন। বাইরে টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে। একাব্বর বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে মায়ের কাছে নালিশ দিচ্ছে– ইনিয়ে-বিনিয়ে ভাইদের বে-ঈনসাফির কথা বলে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে আম্বিয়া খাতুনের কোন খেয়াল নেই।

আজকের ঝগড়ার হেতুটাও বেশ লজ্জাকর। মুদাব্বর আর নেকবর বউ-সন্তান নিয়ে বড় ঘরের দু'অংশে থাকে। মা আম্বিয়া খাতুন আর ছোট ছেলে দিদার থাকেন বসার ঘরের চৌকিতে। ভিটি বাড়ির অবশিষ্ট অংশে ছোট একখান দো'চালা ঘর তুলে জীতু পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। ঘর তোলার মত জায়গা বা বড় ঘরে থাকার ব্যবস্থা না হওয়ায় একাব্বর বাধ্য হয়ে বৌ আর ছোট এক ছেলে নিয়ে রাতে রান্নাঘরেই বিছানা পাতেন। অন্যদিনের মত আজও তারা রান্না ঘরে শুয়েছে কিন্তু বৃষ্টি আর শীতের কারণে অনেক বেলায়ও ঘুম থেকে না উঠায় এবং বাইরের চুলা বৃষ্টিতে অকেজো হওয়ায় এ ঝগড়ার সূত্রপাত। মুদাব্বর আর নেকবরের বৌ তাদের রান্না ঘর থেকে ডেকে তুলতে ও চুলায় রান্না বসাতে ব্যর্থ হয়ে এ কথা মুদাব্বরের কানে লাগাতেই মুদাব্বর শুরু করলো গালাগাল। তারপর বিশ্রী সব কাণ্ড।

আম্বিয়া খাতুন একাব্বরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

www.pathagar.com

একটানা বৃষ্টি শেষে বিকেলে এক ঝলক মিষ্টি রোদ দেখে মানুষ বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ছেলে-মেয়েদের দিক-বিদিক ছুটোছুটি আর কর্মব্যস্ত মানুষদের হাঁক-ডাক শুরু হলো। আজাদও গায়ে শাল জড়িয়ে বড় রাস্তাটার দিকে এগুতে লাগলো।

টুনু মেম্বার রাস্তার উপর তার জমি বরাবর দাঁড়িয়ে আছেন। জমিটার দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছেন তিনি। এটাকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন, অনেক পরিকল্পনা; কিন্তু তা বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব কিনা এখনো তিনি নিশ্চিত নন। তার জমির পাশের বড় জমিটাই সফির। সফিকে রাজি করাতে পারলেই সেটা সম্ভব। সফি জমিটা বিক্রি বা বদল করতে রাজি হলে রাস্তার পাশে সুন্দর একটা বাড়ি করা তার স্বপ্ন। এ স্বপ্ন অনেক পুরনো হলেও ইদানিং তা প্রবল হয়ে উঠেছে। এক ঘরে দু'স্ত্রীর ঠোকরা-ঠুকরি তা জরুরি করে তুলেছে। কিন্তু সফিকে কথাটা কিভাবে বলবে মেম্বার বুঝতে পারছে না। যদি নিষেধ করে বসে এ ভয়েও এতদিন বলা হয়নি; কিন্তু এবার না বলে উপায় নেই। বাড়ি এলে যে করেই হোক ওকে রাজি করাতে হবে, প্রয়োজনে দ্বিগুণ দাম দিয়ে হলেও।

টুনু মেম্বারকে জমিটার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে আজাদ সেদিকে এগিয়ে গেল। মেম্বার আজাদকে দেখে হাসি মুখে বলল, 'তুমি কহন আইলা?'

'কাল রাতে।'

'বন্ধ-টন্ধ পড়ছে নাকি?'

না, ইউনিভার্সিটি খোলা। একটা জরুরি কাজে এসেছি। পরশু চলে যাবো।

লঞ্চে আইছ?'

হুঁ'।

আমাগো লাইনের একটা লঞ্চ নাকি ডুইবা গেছে। অনেক মানুষ মারা গেছে। রাস্তা দিয়া যাইতে কয়েকজন বলাবলি করল, হুনছ-টুনছনি কিছু?'

আজাদ বিস্মিত দৃষ্টিতে মেম্বারের দিকে তাকিয়ে আতংকিত গলায় বলল, 'বলেন কি! কখন?'

'গত কাইল বিকালে। ঘাটে ভিড়ার পাঁচ মাইল থাকতে ডুবছে কইল।'

'কিন্তু.....।'

আজাদকে আতংকিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেম্বার বিস্মিত মুখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। একসময় বলল, 'কি হইছে, তুমি এত কি ভাবতাছ?'

আজাদ বিষণ্ন মুখ তুলে চিন্তিত গলায় বলল, 'গতকাল ঢালিবাড়ির সফির বাড়ি আসার কথা ছিল, কিন্তু সে আসেনি। চাচি সকালে এসে কান্না-কাটা শুরু করেছে, আমি সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছি, কিন্তু এখন.....।'

মেম্বার বিস্মিত গলায় বলল, 'কও কি! আমিতো গতকাইল চাচির সঙ্গে কথা কইয়া আইলাম। সফি আইবো কি না জানতে চাইলাম, কিন্তু তেমন কিছু কইল না তো!'

আজাদ বলল, 'সফি আসবে ভাবী জানতো। তাছাড়া আমাকেও সে আসবে বলেছে, কিন্তু এখন তো.....!'

আজাদ ভীষণ চিন্তিত মুখে মাথা নিচু করলো। মেম্বারও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আজাদ একসময় মাথা তুলে আড়ং-এ খলিল ডাক্তার পত্রিকা রাখে কি না জানতে চাইল।

www.pathagar.com

মেম্বার গম্ভীর মুখে মাথা নাড়তেই সে বলল, 'তাহলে আমি দেখে আসি পত্রিকায় কিছু উঠেছে কি না।'

আজাদ আড়ং-এর দিকে হাঁটতে লাগলো। মেম্বার সে ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

৩

দু'দিন ধরে একটানা বৃষ্টির পর আজ প্রকৃতি যেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে। বিলাসপুর গ্রামের শীতে কাবু হওয়া মানুষগুলো তাই খেতে-খামারে নেমে পড়েছে। ছোট এই গ্রামটি হঠাৎ যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। সেই কলরব মুখরিত গাঁয়ের মেঠো পথ ধরে ব্যাগ কাঁধে আজাদ সফিদের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে ঢাকায় যাবে। পথে তার হালীমা চাচিকে সান্ত্বনা দিয়ে যাবে। লঞ্চ ডুবির সংবাদ সেদিন ঢালিবাড়ি পৌঁছতে বেশি সময় লাগেনি। এক কান দু'কান করেই কথাটা সফিদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছলো। একে তো অসুস্থ শরীর তার উপর এ সংবাদে হালীমা খাতুন একেবারেই ভেঙে পড়লেন। তার বুক ফাটা বিলাপ শুনে ঘর ভরে উঠলো। সবাই তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলো; কিন্তু তিনি কোন প্রবোধই মানলেন না। চোখের জলে বুক ভাসালেন। এক সময় জ্ঞান হারালেন। নানা চেষ্টা-তদবীর শেষে গতকাল তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন।

শাশুড়ির আর্তনাদের বিপরীতে মেহেরজান যেন পাথর। তাকে বিধ্বস্ত দেখালেও সে নিশ্চিত মানুষটা মরতে পারে না, তাকে রেখে চলে যেতে পারে না। তার বুকের মানিক ফিরে আসবে, অবশ্যই আসবে– এ আশায় বুকে পাথর চেপে বিছানায় পড়ে রইলে।

আজাদ গতকাল সফিদের বাড়ি গিয়ে তার চাচিকে দেখে এসেছে। এখনো যাচ্ছে। কিছুদুর যেতেই তার ইউনুস চাচার সাথে দেখা। ইউনুস সাহেব মৌলভি মানুষ, গাঁয়ের জুম্মা মসজিদের ইমাম এবং দু'তিন গ্রাম দূরে লতিফপুর দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকও তিনি। মৌলভি সাহেব আজাদকে দেখে বলল, 'তুমি বোধ হয় ঢাকায় যাচ্ছ। সফির খোঁজ নিয়ে তাড়াতাড়ি জানিও। ওর মা তো বিছানা নিয়েছে।'

আজাদ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। তারপর বিদায় নিয়ে এগুতে লাগলো।

সফিদের বাড়ি থেকে নেমে মাঠের আলপথ ধরে আজাদ দ্রুত হাঁটতে লাগলো। গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া রাস্তাটায় উঠতে হবে তাকে। রিস্টওয়াচে সময় দেখল সে। বেলা দশটা। আজাদ উদ্বিগ্ন হল। অনেক লেট হয়ে গেছে। পনের কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে থানা সদরে পৌঁছতেই অনেক সময়ের দরকার। সেখান থেকে লঞ্চ ঘাটে পৌঁছে যথাসময়ে লঞ্চ ধরতে পারবে কিনা ভাবছে সে।

আজাদ দ্রুত পায়ে বড় রাস্তায় উঠে দাঁড়ালো। এটি একটি কাঁচা বন্ধুর রাস্তা। গত বর্ষার পানি উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় থেকে থেকে অসমতল হয়ে আছে যা মেরামতের এ পর্যন্ত ব্যবস্থা হয়নি। রাস্তাটি পায়ে চলারই পথ, তবে ইদানিং দু'চারটি রিকসা টেনে-হেঁচড়ে থানা সদর পর্যন্ত চলাচল করতে দেখা যায়। এটি পাকা করে যানবাহন চলাচলের সু-ব্যবস্থা হলে এলাকার মানুষের দুর্দশা অনেকটা ঘুচে যেত; সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত এ অজপাড়াগাঁ কিছুটা হলেও শ্রী ফিরে পেত, কিন্তু তা কোনকালে হয়ে উঠবে কি না আজাদ জানে না। সদর থানার সাথে যোগাযোগের এ পথটুকু আজাদকে বড় কষ্ট দেয়। এ কষ্টের কারণে শহর ছেড়ে আসতে

www.pathagar.com

যেতে তার ইচ্ছে হয় না। বহুমূল্য দিয়ে রিকসায় চেপে বসলেও বন্ধুর পথের কারণে সময় ও কষ্ট খুব একটা লাঘব হয় না। আজাদ এদিক-ওদিক তাকালো, কোথাও একটা রিকসা দেখা গেল না। এ পথ পাড়ি দিয়ে লঞ্চ ধরতে পারবে কিনা বুঝতে পারছে না। সে দ্রুত পা চালাতে লাগলো।

কিছুদূর এগুতেই আজাদ অবাক হলো। তাদের সড়ক ধরে একটা হোন্ডা ভট্ ভট্ শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে। এ সড়কে পেট্রল চালিত বাহন চলতে সে আজই প্রথম দেখলো। হোন্ডাটা কাছে আসতেই আজাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে সেদিকে তাকিয়ে রইল। হোন্ডা চালাচ্ছে হেলমেট মাথায় স্যালোয়ার-কামিজ পরিহিতা এক যুবতী মেয়ে। মেয়েটা আজাদের বিস্ফারিত দৃষ্টির দিকে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশ কেটে চলে গেল। আজাদ ঘাড় বাঁকিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার সামনে মুখ ঘুরালো।

এমন দৃশ্য শহরে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, কিন্তু তাদের মত অজপাড়াগাঁয়েও দেখা যাবে আজাদ ভাবতে পারেনি। এ মেয়ে নিশ্চয় কোন এনজিও কর্মী। এনজিওগুলোর বদৌলতে আজকাল পাড়াগাঁয়েও এমন দৃশ্যের অবতারণা ঘটছে। তাদের এলাকায়ও এদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল আড়ং-এ গিয়ে দুটো প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের অফিস চোখে পড়েছে। নানা বিষয়ে বাদানুবাদের কথাও কানে এসেছে।

দারিদ্র্য বিমোচনই এনজিওগুলোর একমাত্র লক্ষ্য বলে ঢাক-ঢোল পিটালেও বিপুল সংখ্যক বেকার যুবকদের বাদ দিয়ে শুধু মেয়েদের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তকরণ, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের বিপরীতে উগ্র ও বেপরোয়া কার্যক্রমে উৎসাহিতকরণ এবং পারিবারিক ও সামাজিক অনৈক্য সৃষ্টিই যেন এদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে, যার ফলে মানুষের মনে সৃষ্টি হচ্ছে সন্দেহ ও অবিশ্বাস এবং এর থেকে জন্ম নিচ্ছে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। এছাড়া বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ তথা স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত হাজার হাজার কোটি ডলার খরচ করে কতটুকু দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে তা পরিসংখ্যানের বিষয়। তবে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি মনে হচ্ছে। জবাবদিহিতা ও নিয়ন্ত্রণহীন এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর কথিত এক টাকার সাহায্যের জন্য আঠারো টাকার ব্যয়সর্বস্ব সেবার হিসাব মিলে কর্মকর্তাদের রাজকীয় স্টাইলের জীবন-যাপন দেখে। অর্থ যোগানদাতা ও এনজিওগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনই একমাত্র উদ্দেশ্য হলে এই বিপুল অর্থ গরীব দেশের শিল্পায়ন বা অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় করাই ছিল যুক্তযুক্ত, কিন্তু সেদিকে তাদের কোন আগ্রহ নেই শুধুমাত্র শিল্পায়িত দেশগুলোর ভোক্তা হিসাবে গরীব দেশগুলোকে কোন রকমে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ছাড়া। তার উপর ইদানিং সাবেক মহাজনী স্টাইলে আতংকজনক হারের সুদের কারবারের মাধ্যমে হা-ভাতে মানুষদের কি দারিদ্র্য বিমোচন করছেন তা তারাই ভাল জানেন।

৪

সফিকুর রহমান সফি। অফিসেও নিখোঁজ এ সংবাদ বাড়ি পৌঁছেছে আজ সাত দিন হয়। এ সাত দিনে পাগল প্রায় হালীমা খাতুন চলৎশক্তি হারিয়ে নির্বাক হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। মাঝে মাঝে বড় বড় চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, যেন কিছু একটা খুঁজছেন তিনি। কোন রকম দানা-পানি মুখে নিচ্ছেন না, জোর করেও খাওয়ানো যাচ্ছে না। এভাবে একটা লোক কয়দিন বাঁচে সেটাই এখন ভাবনার বিষয়।

www.pathagar.com

মেহেরজানের অবস্থাও তথৈবচ, বুকে পাথর চেপে অধীর অপেক্ষায় বসে আছে সে। সফির পথ চেয়ে কি সব বিড় বিড় করছে। শেষ পর্যন্ত ব্রেন হ্যামারেজ হয় কিনা সেটাও চিন্তার বিষয় বৈকি!

টুনু মেম্বার আজ আড়ং থেকে নজরুল ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। হালীমা খাতুন ও মেহেরজানকে দেখিয়ে ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করলেন। ডাক্তার বিদায় দিয়ে মেহেরজানের ঘরে এসে বললেন, 'ও মেহের, এতো ভাবনার কি আছে; সফি দেখবা ঠিকই একদিন হুট কইরা চইলা আইবো। ওষুধগুলা খাও, চাচির দিকে লক্ষ্য রাখ, নইলে উনার অবস্থা আরো খারাপ হইবো। আর কথা হইল গিয়া, হাতে নিশ্চয় টাকা-পয়সা নাই; সেইসব নিয়াও ভাবনা-চিন্তা করবা না। আল্লাহ একটা ব্যবস্থা করবই। তাইলে অহন আসি, সফির খোঁজ-খবরের ব্যবস্থা নেই। অর খোঁজ হইবই ইনশাআল্লাহ।

মেম্বার মেহেরজানের ঘর থেকে বেরুতেই শাকেরা কোথা থেকে ছুটে এসে বলল, 'ও মেম্বার, আমারে ওষুধ দিলা না? আমার কইলজাডাও তো ফাইটা যাইতাছে। হায় হায়রে, আমাগো সফি ভাই নাকি দরিয়ার মইধ্যে সাঁতরাইতাছে– শুধু সাঁতরাইতাছে। কেউ কি একটা নাও-কোন্দা লইয়া মিয়া ভাইরে তুইলা আনতে পারে না। আমার ভাইটা কত জানি কষ্ট পাইতাছে গো। ও মেম্বার, তোমাগো নাওটা লইয়া লও না সফি ভাইরে তুইলা আনি।'

মেম্বার তাচ্ছিল্যের ভংগিতে বলল– 'যা, তুই যা। আমাগো নৌকা লইয়া অরে তুইলা নিয়া আয়। আর হুন, একটু পরে গিয়া আমাগো বাড়ি থাইকা চাল লইয়া আইস, বুঝছত।'

শাকেরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। মেম্বার বেরিয়ে যেতেই শাকেরা মেহেরজানের ঘরে ঢুকলো। শোকার্ত মেহেরজান ভিতরের বাঁশের খুঁটিটা এক হাতে জড়িয়ে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। শাকেরা মেহেরজানের বাহুমূলে হাত রেখে বলল, 'ও ভাবী, মানুষে কয় মিয়া ভাই দরিয়াত সাঁতরাইতাছে, অরে তুইলা আনবা না?– লও না মিয়া ভাইরে তুইলা আনি। আমার পরানডা ফাইটা যায় গো ভাবী! ও ভাবী...।'

মেহেরজান ধীর লয়ে পাশ ঘুরে শাকেরার দিকে তাকালো। তার শোকের বাঁধ শতগুণে উপচে ঝরণাধারার ন্যায় প্রবাহিত হলো। কান্নায় ভেংগে পড়ে দু'হাত বাড়িয়ে শাকেরাকে সে বুকে চেপে ধরলো। শাকেরা মেহেরজানের বুকে মুখ লুকিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

হালীমা খাতুনকে ওষুধ খাওয়াবার ব্যর্থ চেষ্টায়রত ফজলুর মা রাবেয়া বেগম কান্নার আওয়াজ শুনে মেহেরজানের ঘরে এসে বলল, 'ও বৌ, ও শাকেরা, তোরা কান্দিস না। আমাগো ফজলু একটু বাদে যাইতাছে। লঞ্চঘাটে, নদীর পাড়ে যাইবো। সেইখানে নাকি সরকারের মানুষেরা লঞ্চের মানুষের খোঁজ করতাছে। নদীতে ভাইসা উঠা লাশ যার যার বাড়ি-ঘরে পাঠাইতাছে। যারা বাঁইচা আছে, সাঁতরাইয়া চরে-টরে গিয়া উঠছে, তাগরেও খোঁজ কইরা ঘাটে আনতাছে। আমাগো সফিরে যদি আল্লায় বাঁচাইয়া রাইখা থাকে তাইলে একটা খবর হইবোই। ফজলু একটু পরে যাইবো। অর বাপে অরে যাইতে কইছে।

রাবেয়া বেগমের কথা শুনে শাকেরা এবার তাকে জড়িয়ে ধরে আরো প্রচণ্ড বিলাপে ভেঙে পড়লো। দরজায় দাঁড়ানো জীতুর মা আম্বিয়া খাতুন বিরক্ত মুখে বলল, 'ও ফজলুর মা। তুমিও পার প্যাচাল পাড়তে। ফজলু যাইলে যাইবো, হেই প্যাচাল এইহানে না পাড়লে কি হইতো! মাইয়া গুলান এমনিতেই শোকের আগুনে জ্বলতাছে, তার মইধ্যে তুমি আবার নুড়া দিতাছ। লাশ-টাশের এইসব কথা না পাড়লে কি হইতো! সফি ঐ লঞ্চে আছিল কিনা হেইডাই তো আমরা জানি না। এত কথা কওনের দরকারটা কি?

www.pathagar.com

শাকেরার বিলাপ শুনে ছুটে আসা কেউ কেউ আম্বিয়া খাতুনের কথায় সায় জানালো। রাবেয়া বেগম আম্বিয়া খাতুনের কথায় প্রচণ্ড রুষ্ট হলেও আপন ভুলটাও ধরতে পেরে নিজেকে সামলে নিল। কে একজন এগিয়ে এসে শাকেরাকে সান্ত্বনা দিতে বাইরে নিয়ে গেল।

৫

এবারের বন্যার ভয়াবহতা কোথায় গিয়ে পৌঁছে সে নিয়ে গাঁয়ের মানুষদের ভাবনার অন্ত নেই। শ্রাবণের শুরুতেই রাস্তা-ঘাট তলিয়ে গেছে। অনেকের বাড়ি-ঘরও ডুবতে বসেছে। প্রবল বৃষ্টি আর জোয়ারের পানি একাকার হয়ে যে প্রচণ্ড রোষে ধেয়ে আসছে তা ভাবনার বিষয় বৈ-কি!

বন্যার কারণে বিলাসপুর গাঁয়ের মানুষদের দুর্দশার অন্ত নেই। যে ছোট রাস্তাখানা গ্রামের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে তা যথেষ্ট পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় নৌকা, তালের কোন্দা, কলাগাছের ভেলা ইত্যাদি বাহন ব্যতীত ঘর বের হওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এ সুযোগও গাঁয়ে হাতে গোনা কয়েকজনেরই রয়েছে। বাকিদের আছে চরম দুর্ভোগ।

আড়ং থেকে ফেরা কয়েকজন মানুষ থানা সদর থেকে আসা বড় রাস্তাটার উপর দাঁড়িয়ে আছে, বাহনের অভাবে ওরা ঘরে ফিরতে পারছে না। কেউ কেউ অবশ্য লুঙ্গি কোচা মেরে ভিজেবুড়ে বাড়ির পথ ধরেছে। বাকিরা অপেক্ষায় আছে কারো নৌকা এদিকটায় আসে কিনা, লিফট নেয়া যায় কিনা– সে আশায়।

টুনু মেম্বারকে একসময় বড় রাস্তাটা ধরে এগিয়ে আসতে দেখে দাঁড়ানো লোকগুলো উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। এবার নিশ্চয় গতি হবে। মেম্বারের নৌকা আছে, সে নৌকায় বাড়ি ফেরা যাবে। তারা মেম্বারকে বিগলিত মুখে অভ্যর্থনা জানালো। মেম্বার কিছুটা বিরক্ত মুখে হারিছের দিকে তাকিয়ে বলল– 'কিরে আমার কাজের পোলাটা নৌকা লইয়া অহনো আহে নাই?' হারিছ না বোধক ধ্বনী তুলতেই মেম্বার পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে রিস্টওয়াচে সময় দেখলো, তারপর মাথা তুলে বলল, 'জয়নাইল্লারে নৌকা লইয়া আইতে কইছি সাড়ে চারটায়। আর অহন বাজে সাড়ে পাঁচটা।

হারিছ বলল, 'একটু অপেক্ষা করেন, অহনই হয়তো আইয়া পড়বো। মেম্বার হাতে ধরা বাজারের চটের ব্যাগটা ফাঁক করে ভিতরটা দেখলো। সে কৈ জালে ধরা বেশ কিছু মরাতাজা নানান জাতের মাছ কিনেছে। বেশি দেরি হলে সেগুলো পঁচে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কিছুটা উদ্বিগ্ন।

মাঝিবাড়ির দিনমজুর হারুন আলাপ জমাবার উদ্দেশ্যে একসময় বলল– 'মেম্বার সাব, পানি যেইভাবে বাড়তাছে এইবার তো বাঁচার লক্ষণ দেখতাছি না। হুনলাম, ভারত নাকি ফারাক্কা বাঁধের সবগুলান গেইটই খুইলা দিছে। হেই পানি আইয়া আমাগরে ডুবাইয়া মারতাছে।'

হারুনের কথায় দাঁড়ানো দু'একজন সায় দিয়ে বলল– 'হ, ঠিকই কইছত। ভারত সবগুলান গেইট খুইলা দিছে। পেপারে উঠছে।

মেম্বার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, 'খুইলা দিলে অহন আর কি করবি, তোরা যাইয়া গেইটের মুখে চিত হইয়া শুইয়া থাক। পানি ঠেকাইয়া রাখ।'

www.pathagar.com

মেম্বারের কথায় দাঁড়ানো দু'একজন হেসে উঠলো। হারুন মেম্বারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এইটা কি কইলেন মেম্বার সাব! ভারত নদীতে বান্ধ দিয়া এক অন্যায় করলো, তার মইধ্যে আবার বর্ষায় পানি ছাইড়া দিয়া আমগরে ডুবাইয়া মারবো; শুকনায় আটকাইয়া রাইখ্যা শুকাইয়া মারবো। আল্লার দুনিয়ায় কি ন্যায় অন্যায় বইলা কিছু নাই!'

মেম্বার হারুনের কথায় কান না দিয়ে হারিছকে ইংগিত করে বলল– 'এই, দেখ তো এইটা কে কচুরিপানা কাটতাছে?'

হারিছ সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'বকুল বাড়ির রোকনের পোলা আক্কাছ।'

বার তের বছরের লিকলিকে পাতলা আক্কাছ ছোট একখানা ডিঙ্গি নৌকার মাথায় বসে গরুর খাবারের জন্য কচুরিপানা কাটছে। জমির আউশ ধান বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় জোয়ারের পানির সাথে ভেসে আসা কচুরিপানা কিছু কিছু জমিতে স্থান করে নিয়েছে। সফির বড় জমিটাতেও তেমন কিছু পানা জমাট বেঁধে আছে। আক্কাছ সেখান থেকে তা সংগ্রহ করছে।

মেম্বার হারিছকে বলল, 'পোলাটারে ডাকতো। আমাগরে একটু পার কইরা দিতে কতো। জয়নাইল্লায়তো এই পর্যন্ত আইলো না। আইজ গিয়া তারে দেহামু মজা।'

গাঁয়ের কথিত আরেক মোড়ল হালীম মির্জা তখন সেখানটায় এসে দাঁড়ালো। মেম্বার তাকে বলল– 'কাজের পোলাটারে কইছি নৌকা লইয়া আইতে, কিন্তু এই পর্যন্ত দেহা নাই। দাঁড়ান, দেহি কি করা যায়। হারিছ, পেলাটারে ডাক।'

হারিছ আক্কাছকে ডেকে তাদের পার করে দিতে বলল। আক্কাছ জবাবে পারবে না বলে জানালো। কারণ গরুর খাবার নিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। তা না হলে বাবা তাকে মারবে। আক্কাছের নেতিবাচক জবাব শুনে এবার মেম্বার নিজেই পার করে দেবার কথা বলল। আক্কাছ এবারও পূর্বের অজুহাত দেখিয়ে আপন কাজে মন দিল। এতগুলো লোকের সামনে আক্কাছের অপারগতা মেম্বারকে ক্ষেপিয়ে তুললো। সে হারিছকে উত্তেজিত চাপা গলায় বলল, 'পোলাটারে যে করেই হোক আমার কাছে আন। তারপর দেহামু মজা; বল, টাকা দিমু। টাকার লোভ দেহা।'

হারিছ আক্কাছকে পার করার বিনিময়ে টাকার কথা বললো। আক্কাছ প্রথমে রাজি না হলেও হারিছের পিড়াপিড়িতে একসময় নৌকা নিয়ে এগিয়ে এলো। নৌকা ঘাটে ভিড়তেই মেম্বার ছুটে গিয়ে আক্কাছের চুল টেনে ধরে বলল– 'কিরে বদমাশ, এতগুলা লোক তোরে ডাকলো। আমারে না হয় চোখে লাগলো না– মোড়ল সাবরেও লাগে নাই? এত সাহস পাইলি কইরে, বলেই মেম্বার ডান গালে কষে চড় বসিয়ে দিল। নৌকা ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠায় আক্কাছ টাল সামলাতে না পেরে পানিতে পড়ে গেল। রাস্তার উপর খেলাধুলারত বাচ্চারা একযোগে হেসে উঠলো। মেম্বারের হাতে অপ্রত্যাশিত চড় খেয়ে আক্কাছ পানিতে দাঁড়িয়েই কাঁদো কাঁদো হতবাক দৃষ্টি মেলে মেম্বারের দিকে তাকিয়ে রইল। মেম্বার বলল, 'উইঠা আয় শয়তান। তোর বাবারে কবি রাইতে আমার সঙ্গে দেখা করতে। কেমন পোলা রোকনে জন্ম দিছে আমি তারে একটু জিজ্ঞামু। মেম্বার এবার সকলকে নৌকায় উঠতে আহবান জানালো। সর্বাঙ্গ সিক্ত আক্কাছ নৌকার মাথায় বসে চোখের পানি ফেলছে। হালীম মির্জাসহ দু'একজন তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। হারিছ লগি হাতে কলকল শব্দে নৌকা ছেড়ে দিল।

www.pathagar.com

ঘরের দাওয়ায় বসে মেহেরজান উদাস দৃষ্টি মেলে বাইরে তাকিয়ে আছে। আকাশ আঁধারে ছেয়ে গিয়ে অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে– ঝম ঝম বৃষ্টি। বাড়ির পাশ ঘেঁসে যাওয়া ছোট রাস্তাটার উপর পানি থৈ থৈ করছে। কয়েকটা হাঁস নতুন পানিতে ছুটোছুটি করছে। বাড়ির ভিতর পানি ঢুকতে আর সামান্যই বাকি। আজকের বৃষ্টিতেই ঢুকে যায় কিনা কে জানে।

মেহেরজান দেখলো তাদের সীমানা ঘেসে রোপা কলাগাছগুলোয় কলা ফলেছে। তা দেখামাত্র ভিতরটা তার হু হু করে উঠলো। মুহূর্তেই দু'চোখ ছলছল করে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সফি শেষবার বাড়ি এসে যাবার আগে দুটো গাছ লাগিয়ে গেছে। সেগুলো ফুলে ফেঁপে অনেকগুলোতে রূপ নিয়ে আজ আবার কলাও ধরেছে। অথচ...'। বেদনায় নীল হওয়া মেহেরজান আঁচলে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে উঠলো। এই যেন সেদিন চোখের উপর মানুষটা ছুটোছুটি করছে, কোথা থেকে চারা এনে খুন্তি হাতে গর্ত খুঁড়ছে। গাছ লাগিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, 'মেহের, তোমার জন্য এ দুটো লাগালাম; দেখবে এতে ভাল জাতের ফলন হবে। আমার ভাগ ঢাকায় পাঠিয়ে দিবে, কেমন!'... এখনো মানুষটার সেই হাসিমাখা মুখ চোখের উপর ভাসছে, অথচ নিখোঁজ রয়েছে আজ ছ'মাস হয়ে গেল। এরই মধ্যে নদীতে অনেক পানি গড়ালো। পুত্র শোকে হালীমা খাতুন দেহ-মনে নিঃশেষ হতে হতে তিন মাসের মাথায় ইহধাম ত্যাগ করলেন। সরলা ননদ শাকেরাকে নিয়ে মেহেরজান স্বামীর ভিটে কামড়ে পড়ে আছেন। তার বিশ্বাস একদিন এসে মানুষটা তাকে চমকে দেবে– 'মেহের', 'মেহের' বলে ডেকে উঠবে। সেদিন যদি ঘরে না পায়! যদি মানুষটার মনে কষ্ট হয়! সে জন্য মেহেরজান ঘর ছেড়ে কোথাও যায় না। মানুষের সাথে খুব একটা মেশেও না। টুকটাক কাজের অবসরে কুরআন পড়ে, আল্লার দরবারে মোনাজাত করে, সুর করে কাঁদে। কখনো জানালার ফাঁক গলিয়ে বেদনাময় দৃষ্টি মেলে পথপানে তাকিয়ে থাকে।

মা-বাবার অবর্তমানে মেহেরজানের গরীব ভাইয়েরা তাকে নিয়ে যেতে যেমন ব্যর্থ হলো, তেমনি তার অনড় সিদ্ধান্তের কারণে অন্যত্র বিয়ে দেয়ার পরিকল্পনাও বাতিল করলো। গত ছ'মাসে মেহেরজান একবার মাত্র বাপের বাড়ি গিয়ে তিন দিনের মাথায় ফিরে আসায় তারা আর বোনকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলো না। মেহেরজান স্বামীর অপেক্ষায় স্বামীর ঘরে পড়ে রইলো।

আজাদ সফির অফিসে ছুটোছুটি করে তার স্বল্পকালীন চাকুরি জীবনের সামান্য কিছু পাওনা তুলতে সক্ষম হলো। মাস দুয়েক আগে সে তা মেহেরজানের হাতে তুলে দিল, যা দিয়ে শাকেরাকে নিয়ে এখনো কোন রকম কেটে যাচ্ছে। অবশ্য টুনু মেম্বার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যথেষ্ট করেছেন, এখনো তিনি করে যাচ্ছেন। অফিসের টাকা পাওয়ার পর মেহেরজান হিসেব কষে তার পাওনা নেয়ার কথা বলেছিলেন, কিন্তু মেম্বার উদার ভংগিতে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মেহেরজানকে মোলায়েম গলায় তিরস্কার করলেন। লোকটা কেন গায়ে পড়ে এতো করছে তা শুরুতে বুঝতে না পারলেও ইদানিং মেহেরজান আঁচ করতে শুরু করেছে। মাস খানেক আগে একদিন বলল, 'মেহের, সফির সাথে আমার একটা বিষয়ে কথা হইছিল, অবশ্য তোমাগরে সফি কইছে কিনা জানি না। কথাটা হইল গিয়া...।'

মেম্বার কি মনে করে থেমে গেলেন। রহস্যময় ভংগি করে বললেন– 'না, থাক, এহন থাক, তোমারে আমি পরে কমু, নিরিবিলি কমু। কথাটা আমাগো মধ্যে গোপন থাকন দরকার।'

www.pathagar.com

মেহেরজান কিছু বলল না, সন্দিগ্ধ চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকলো। নিখোঁজ স্বামীর নাম ভাংগিয়ে সে কি বলতে চায় বুঝতে চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুই মাথায় ঢুকলো না।

সপ্তাহ খানেক আগে একদিন রাতে এশার নামায শেষে মেহেরজান শুতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শাকেরা তার ঘরে ঘুমুচ্ছে। সে সময়ে দরজায় খট্‌খট্ শব্দ শুনে মেহেরজান দরজা খুললো। টুনু মেম্বার বাইরে দাঁড়িয়েই বলল, 'মেহের, তোমার সাথে আলাপ আছে কইছিলাম, কিন্তু এই পর্যন্ত সময় পাই নাই। তাছাড়া কথাগুলা নিরিবিলিই কওয়া দরকার, অন্য কানে যাক তা চাই না। আমি তোমারে কয়টা কথা কইয়াই চইলা যামু, তুমি একটু বস।'

মেহেরজান শংকিত দৃষ্টি মেলে ইতস্তত করে বলল, 'অহনই কইবেন! দিনে আইলেই তো হইতো; আপনে সকালে আহেন, তহন শুনুম।'

মেহেরজানের কথা শুনে মেম্বার তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো। বিরক্ত গলায় বলল, 'তুমি তো দেহি কেমন কেমন কথা কও মেহের। আমি কি পর কেউ! আমার লাইগা সকাল আর বিকাল কি? কথাটা নিরিবিলি কওন দরকার দেইখাই তো অহন আইলাম। যাও, বস। কয়টা কথা কইয়াই চইলা যামু।'

মেম্বার ঘরে ঢুকতে উদ্যত হলেন। মেহেরজান ইতস্তত করতে করতে দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। তার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। ভিতরটা থির থির করে কাঁপছে। লোকটা এই রাতে কি বলতে এসেছে কে জানে! দুঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছে বলে কেমন অধিকারের সুরে কথা বলছে।

মেম্বার মেহেরজানের ঘরে ঢুকে চৌকির উপর বসলো। মেহেরজান পিছু পিছু গিয়ে ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়ালো। মেম্বার নরম গলায় বলল, 'বস মেহের, বস। এইখানটায় বস। তোমারে কয়টা কথা কমু, ভালর লাইগ্যাই কমু।'

মেহেরজান বলল, 'আপনে কন, আমি বসুম না; আমি হুনতাছি।'

মেম্বার বলল, 'আইচ্ছা, ঠিক আছে। কথা হইল গিয়া সফিরে আল্লায় ফিরাইয়া আনুক, এই ঘরে হাসি ফুটুকু এইটা আমরা হগলেই চাই। বুঝলা মেহের, সফি আছিল আমার জানের জান। আমার লাইগা হে ছিল একেবারে পাগল। আমারে না জানাইয়া কোন দিন কোন কাজ সফি করতো না। এই যে তোমাগো বিয়া– আমারে একদিন রাইতে বাড়িত গিয়া কইল– ভাই, নন্দন গাঁ বেপারী বাড়ি থাইকা একটা প্রস্তাব আইছে, করিম বেপারীর মাইয়া। আমিত কিছু চিনি না, জানি না; অহন আপনে কি কন। দুই-একদিনের মধ্যে অগরে জানাইতে হইব।' আমি তারে কইলাম, তোমার চিন্তা-ভাবনার কাম নাই। অগরে আমি চিনি, গোষ্ঠী শুদ্ধ চিনি। তাগো মত ভালা মানুষ খুব কমই আছে। তুমি কথা দিয়া দেও। আমার কথার পর দেহাদেহি শেষে তোমাগো বিয়ার তারিখ হয়। এই যে আমি মেম্বার হইলাম, আহহারে, সফি কি খাটনাটাইনা খাটলো। দিন নাই, রাইত নাই মানুষের বাড়ি বাড়ি পইড়া রইল। আমি তারে এত বিশ্বাস করতাম যে ইলেকশনের সব খরচের ভার সফির হাতে দিয়া দিলাম। তারে কইলাম, নির্বাচনে খাড়াইছি আমি, আর ফাইট দিবা তুমি। ঠিকই সফি ফাইট দিয়া আমারে বহু ভোটে পাস করাইয়া লইয়া আইল।

মেম্বার বেদনাময় কণ্ঠে কথাগুলো বলে একটু থামলো। মেহেরজান মাথা নিচু রেখে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সফির প্রসংগে কথা হওয়ায় তার দু'চোখ ভিজে উঠেছে। সে নিজেকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। মেম্বার আবার মাথা তুলে মেহেরজানের দিকে তাকিয়ে বেদনার্ত গলায় বলল, 'মেহের, আল্লাপাকের ইচ্ছা তা নাও তো হইতে পারে; আমাগো সফি ফিরা নাও

www.pathagar.com

তো...। আহারে, সফির সঙ্গে কত সিরিতি (স্মৃতি) আমার! হেইসব মনে অইলে কইলজাটা পাইটা যায়।'

মেম্বার থামলেন। আপ্লুত হয়ে মাথা নিচু করলেন। তারপর হাতের পিঠে চোখ মুছে মাথা তুলে বললেন, 'মেহের, যেই কথাটা কইতে আইছি সেইটা হইল, তোমার একটা মাত্র ননদ; এই ছাড়া আপন বলতে কেউ নাই। সফির অবর্তমানে রক্তের সম্পর্কের মধ্যে আর আছে সফির চাচাত ভাইরা– অর্থাৎ জীতুরা পাঁচ ভাই, যাদেরে তুমি হাড়ে হাড়ে চিন। সফির সহায়-সম্পদ যা আছে তাও জান– বশত ভিটা আর রাস্তার পাশের জমিটা। তবুও যা আছে এইটাই বা কম কি।'

মেম্বার এ পর্যায়ে আবার থামলেন। সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর খাটো গলায় বললেন, 'একটু ভাবলেই বুঝবা সফির অবর্তমানে উত্তরাধিকার আইনে তোমাগো সাথে জীতুরাও সফির সম্পত্তির ভাগিদার হয়।'

মেম্বারের কথা শুনে মেহেরজান মাথা তুলে তীক্ষ্ণ চোখে মেম্বারের দিকে তাকালো। তারপর আবার মাথা নিচু করলো। মেম্বার আবার বলল, 'আর একটা কথা হইল গিয়া তুমি তো চিনবা না, রাস্তার পাশে তোমাগো জমির সঙ্গে আমারও একখান জমি আছে। হেই জমিতে সুন্দর একটা বাড়ি করার অনেক দিনের সখ, কিন্তু শুধু আমার অংশেই তা সম্ভব না। হেই জন্য সফিরে তার জমিটা বিক্রি বা বদল করার প্রস্তাব দিছিলাম, সফি আমারে তহন কথা দিছিল। যেই ফিরে বাড়ি আইতে নিখোঁজ হইল, হেই ফিরেই তা চূড়ান্ত হওয়ার কথা আছিল; কিন্তু আল্লায়ত অরে কি করছে জানি না। আহ্হারে অর লাইগা পরাণটা কাঁন্দে। অর ছবি হগল সময় মনের মধ্যে ভাইসা উঠে– ভুলতে পারি না।'

কথাগুলো বলে মেম্বার বেদনার্ত মুখে মাথা নিচু করলো। মেহেরজান সন্দিহান চোখে মেম্বারের দিকে তাকিয়ে রইল। মেম্বার একসময় মেহেরজানকে সন্দেহের দোলায় দুলতে দেখে নরম গলায় বলল, 'বুঝলা মেহের, সফির মত সত্যবাদি ছেলে আমি আর দেহি নাই। সফি কথায় কথায় কইতো– ভাই, দুনিয়াটা কয় দিনের। এই কয় দিনের লাইগা দাগাবাজি, জুয়াচুরি কইরা খোদার কাছে গিয়া...।'

মেম্বার কথা শেষ না করতেই মেহেরজানের অন্ধকার মুখ থেকে অস্ফুটে একটা শব্দ বেরিয়ে এলো– 'কিন্তু...।'

মেহেরজান কথা শেষ করলো না, ইতস্তত করে থেমে গেল। মেম্বার বলল, 'কও মেহের, কও। তোমার কোন কথা থাকলে আমারে কও। মনের মধ্যে চাইপা রাখার দরকার নাই।'

মেহেরজান বলল, 'আপনের ভাই তো হগল কথাই আমগরে কইতো, আমাগো পরামর্শ চাইতো; কিন্তু এত বড় একটা কথা তো কোনদিনই কয় নাই, আইজই হুনলাম।'

মেম্বার বিরক্ত চোখে মেহেরজানের দিকে তাকিয়ে আবার নিজেকে সামলে নিল। তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কয় নাই, না? হয়ত পরে কইবো ভাবছে, কিন্তু আল্লায়ত অর হায়াত রাহে নাই। আহ্হারে, সফির ছবি চোখ্যে ভাসে।'

মেহেরজানকে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেম্বার আবার বলল, 'বুঝলা মেহের, হগলকিছুই খোদার ইচ্ছায় মানুষের মংগলে হয়। সফির অবর্তমানে দুষমনরা ভাগ বহাইব, লুইটা-পুইটা খাইব– হেইদিক থাইকা এইটা খোদা তালার'ই সিদ্ধান্ত। আমি বাঁইচা থাকতে তোমাগো গায়ে ফুলের আঁচড় দেয়, এমন সাহস এই গেরামে কারো নাই। একটু থেমে কেশে নিয়ে বলল, সফির ওয়াদামত জাগাটা যদি আমারে দেও এর উপযুক্ত দাম দিমু। হেই টাকা

www.pathagar.com

ব্যাংকে রাইখা দিলে তোমাগো সুন্দর চইলা যাইব। তাছাড়া ইয়ে...কইছিলাম কি, ইয়ে...তুমি চাইলে যেইকোন সিদ্ধান্ত নিতা পার, আমি তোমারে সাহায্য করুম। তুমি অহনো একটা বাইচ্ছা মাইয়া, সারাটা জীবন পইড়া রইছে। তোমার নিজেরে নিয়া ভাবা উচিত, অবশ্যই তোমারে ভাবতে হইব। বুঝলা মেহের, এমন একটা বাড়ি করার ইচ্ছা আমার– দেখলে তোমার পরাণ জুড়াইব। আমারে কেবল দোয়া কর, একটু দোয়া কর।'

মেম্বার কথাগুলো বলে প্রশান্ত মনে মেহেরজানের দিকে তাকিয়ে রইলো। মেহেরজান মাথা তুলে ভীত দৃষ্টিতে তাকালো। তার শরীর কাঁপছে, জিভ শুকিয়ে আসছে। লোকটা বলে কি। কিসের ইংগিত দিচ্ছে লোকটা! এই ছিল তার মনে! সে জন্যই সে...।

মেহেরজানের ভীত মুখ দেখে মেম্বার হাসি হাসি মুখে বলল, 'তুমি ভাবতাছ কেন্ মেহের! আমি আছি না! আমি থাকতে ভাবনা কি!'

মেহেরজান উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'আপনে এইসব কি বলতাছেন। আমি অগ জমি কি কইরা দিমু! আমার হাত দিয়া অগ কোন ক্ষতি হয়, তা আমি পারুম না। উনি ফিরা আইলে যেইভাবে ইচ্ছা নিয়া নিয়েন; আমি বাধা দিমু না।'

মেম্বার তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ, মেহের! সফি ফিরা আইবো অহনও তুমি...। তোমারে তো বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে বইলাই জানতাম। কিন্তু...' বিপদে পড়বা মেহের, বড় বিপদে পড়বা; জীতুরা তোমাগরে গিলা খাইব। তার চাইতে জমিটার একটা গতি হইলে অরা সুযোগ পাইব না। সফি কথা দিয়া গেছে, আমি কিনছি হুনলে টু শব্দও করব না– টাকাটা কামে লাগবো।'

মেহেরজান বিরক্ত চোখে মেম্বারের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটাকে তার অসহ্য লাগছে, খুবই অসহ্য। যে সবের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, যা ভাবনার বিষয় নয়, লোকটা সেসব নিয়ে বিরক্ত করতে এসেছে; বাজে চিন্তা মাথায় ঢুকাচ্ছে। এ সবের শেষ কোথায় মেহেরজান বুঝতে পারছে না।

মেহেরজানকে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেম্বার চৌকি থেকে নামতে গিয়ে বলল, 'আমি থাকতে এত ভাবনার কি আছে কও? কোন কিছুই তুমি ভাইব না। এইসব নিয়া আমরা পরে কথা কমু। আমি অহন আসি।' বলে মেম্বার সেদিন রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফজলুর ডাকে ঘরের দাওয়ায় বসা মেহেরজানের চমক ভাংগে। অশ্রুসজল মেহেরজান টুপটাপ বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় এগিয়ে আসা ফজলুর দিকে তাকায়। ফজলু মেহেরজানের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা যেন ভড়কে যায়। তারপর নিজেকে সামলে হাতের চটের ব্যাগটা দরজায় রেখে বলল, 'আইজ আড়ং-এ মাছ নাই। মেঘে মাছ উধাও হইয়া গেছে। একসের বাইগুন আর খেসারির ডাইল আনছি।'

মেহেরজান কিছু বলল না। ফজলুর বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে কেরোসিনের বোতলটা হাতে নিল। তারপর নরম গলায় বলল, 'এই মেঘে-বাদলে কষ্ট দিলাম ভাই! অনেকটাই তো ভিজা গেছেন। ঘরে গিয়া কাপড় বদলাইয়া নেন।'

ফজলু মেহেরজানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কষ্ট কিসের ভাবী! তোমার কষ্ট দেইখা বেশি কষ্ট পাই। অহনও দাওয়ায় বইসা কাঁদছিলা। এমন কইরা ক্যামনে বাঁইচা থাকবা বুঝতে পাত্তাছি না।'

মেহেরজান কিছু বলল না। ফজলু ছাতা হাতে দাঁড়িয়ে রইল। একসময় আবার বলল, 'তুমি কি কিছু খেয়াল করছো ভাবী। জীতু ভাইরা যে তোমাগো পুকুর পাড়ের ভাগে বেড়া

www.pathagar.com

দিয়া কড়াই গাছ লাগাইয়া দিছে? আব্বা দেইখা আমারে কইল, তাগরে তো কওয়া দরকার কেন তারা এইটা করলো।'

মেহেরজান উদাস দৃষ্টি মেলে বাইরে তাকিয়ে আছে। ফজলুর অভিযোগে তার কোন ভাবান্তর হলো না। ফজলু আবার কি বলতে যেতেই সে বিষণ্ন মুখে নরম গলায় বলল, 'যাও ভাই, বাইরে দাঁড়াইয়া ভিজতাছ। ঘরে গিয়া কাপড় বদলাও। আমি এইসব দেখার কে, এইগুলা নিয়া মাথা ঘামাইতে চাই না। শুধু এইটা ক্যান্, অরা সবই দখল কইরা নিবো।'

ফজলু কিছু বলল না। চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে ঘরের দিকে এগুতে লাগলো। মেহেরজান ব্যথিত মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে বাড়ির ভিতর থেকে হৈ-চৈ আর কান্নার রোল ভেসে আসছে, কিন্তু কোথায় কি ঘটছে ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো। মেহেরজান বাজারের ব্যাগটা হাতে নিল। তাকে রাতের রান্না বসাতে হবে। শাকেরা বৃষ্টি মাথায় সেই যে বেরিয়েছে এ পর্যন্ত দেখা নেই।

মেহেরজান রান্না ঘরে যাবে, তখনই দেখলো টুনু মেম্বার পোটলার মত কি একটা হাতে ছাতা মাথায় এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। মেম্বার এগিয়ে এসে হাসি হাসি মুখে বলল, 'ও মেহের, কি করতাছ তোমরা? দেখলা তো কেমন বৃষ্টি! একটু যে খোঁজ-খবর নিমু সেই সুযোগ নাই। অহন হাজি বাড়ি যাওয়া লাগে, ভাবলাম তোমাগরেও একটু দেইখা যাই।'

মেহেরজান কিছু বলল না। সে মাথায় শাড়ির আঁচল টেনে বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মেম্বার আরো কাছে এসে বলল, 'শুন, অহন আর বসুম না, সন্ধ্যা হইয়া যাইতাছে। হাতের পলিথিনে মোড়ানো পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ধরো, এইটা রাহ; আমি ইউনুস মৌলভি'র সঙ্গে কথা কইয়া আহি।'

মেহেরজান ইতস্তত বিব্রত গলায় বলল, 'কি এইটায়?'

মেম্বার রসঘন গলায় বলল, 'আগে ধরো না, তারপর কইতাছি।'

মেহেরজান ইতস্তত হাত বাড়িয়ে পুঁটলিটা ধরলো। মেম্বার স্বাভাবিক গলায় বলল, 'বন্যা তো এইবারও ধাইয়া আইতাছে। অনেক বাড়িঘর ডুইবা গেছে। আমাগো ইউনিয়নও সরকারি সামান্য রিলিফ পাইছে। গেরামের কারে কারে দেওয়া যায় সেইটার আলাপ করতে মৌলভি সাবের কাছে যাইতাছি। তোমার সঙ্গে পরে কথা কমু, অহন যাই।'

মেহেরজান গম্ভীর গলায় বলল, 'এইটাতে কি, কইলেন না তো?'

মেম্বার হাসি দিয়ে বলল, 'খুললেই তো দেখতে পাইবা। আইচ্ছা, আমার মুখে হুনতে চাইতাছ যহন– হেইদিন দেখলাম তোমার পিন্দনের শাড়িটা ছেঁড়া। এইটা কি কইরা সহ্য হয় কও? হের লাইগা একটা শাড়ি আনলাম, আর সামান্য কিছু খাবার দাবার।'

মেম্বারের কথা শুনে মেহেরজানের গা যেন জ্বলে উঠলো। রাগে, ঘৃণায় তার শরীর কাঁপতে লাগলো। অন্যের স্ত্রীকে শাড়ি কিনে দেয়ার লোকটার দুঃসাহস আর আপন ভাগ্য দোষে অর্জিত অপমান ও বেদনায় বাকরুদ্ধ মেহেরজানের গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সফির নিখোঁজের পর থেকে লোকটা অনেক কিছুই এ সংসারে দিয়েছে, গায়ে পড়ে অনেক উপকার সে করেছে; কিন্তু সে সবের সাথে আজকের এ দানকে

www.pathagar.com

মেহেরজান কিছুতেই এক করে মিলাতে পারছে না। পাহাড় সম ব্যবধান আর অপমানের কাঁটায় বিদ্ধ মেহেরজান একসময় অনেক কষ্টে রুক্ষ অথচ বেদনাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'আপনে এইগুলা নিয়া যান, আমার শাড়ি লাগবো না। নিয়া যান কইতাছি!'

চলে যেতে উদ্যত মেম্বার ঘাড় ঘুরিয়ে দরদ মাখা ব্যথিত গলায় বলল, 'আমারে তোমরা এতো পর ভাব ক্যান মেহের। আমি যতই তোমাগো আপন হইতে চাই, ততই দূরে ঠেইলা দেও। শাড়িটা বড় সখ কইরা আনছি মেহের!' –বলেই মেম্বার অভিমানি পা ফেলে চলে যেতে লাগলো। মেহেরজান কিছু বলতে গিয়েও পারলো না। 'থ' হয়ে বোবা দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকা মেহেরজানের কাঁপা হাত থেকে পুঁটুলিটা একসময় ধুপ করে পড়ে গেল। ভাবলেশহীন অশ্রু সিক্ত মেহেরজান শূন্য দৃষ্টি মেলে সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ঢিমে তালে পড়া বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে শাড়ির আঁচল মাথার উপর দু'হাতে মেলে ধরে উঠান দিয়ে ছুটে আসা শাকেরা ঘরের দরজায় এসে চিৎকার করে বলল, 'ও ভাবী! ভাবীগো! সব্বনাশ হইয়া গেছে গো ভাবী! একাব্বরে বৌডারে তালাক দিয়া পালাইছে। এক্কেবারে তিন তালাক। আইন তালাক, বাইন তালাক।'

এ ঘর ও ঘর খুঁজেও মেহেরজানকে না পেয়ে শাকেরা রান্না ঘরে গিয়ে দেখলো সে বেগুন কাটছে। শাকেরা উদ্বিগ্ন গলায় আবার বলল, 'হুনছনি ভাবী! মাইঝা ভাবীরে তালাক দিয়া দিছে। তাইনেরে আমার মতন কপাল পোড়াইয়া দিছে। হায়হায়রে, কি পিটনটাই না পিটলো। তারপর দিল তালাক। আর হারামজাদীও কম না। এত মানুষে কইল, তবুও খিস্তি বন্ধ করল না; একাব্বরে ফিরা মাইর শুরু করল। অহন তিন তালাক খাইয়া যেই পায়ে জড়াইয়া ধরল, একাব্বরে উষ্টাইয়া উষ্টাইয়া চইল্লা গেল।'

শাকেরা একটানে কথাগুলো বলে থামলো। মেহেরজান কিছু বলল না, সে শাকেরার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর মুখে মাথা নিচু করলো। শাকেরা আবার বলল, 'জীতু বড় হইয়া একাব্বররে কিচ্ছু কইল না, আরো উসকাইয়া দিল। কইল, এমন দজ্জাল বৌ রাহনের কি দরকার, পিট্টা বাড়ি থাইকা বাইর কর। জীতুর কথায় একাব্বর আরো ক্ষেইপা সব্বনাশ কইরা দিল।'

মেহেরজান বসা থেকে দাঁড়িয়ে বিমর্ষ গলায় বলল, 'এইসব শুইনা আর কি হইব। আপনে ভাতটা বহাইয়া দেন। নামাযের সময় যাইতাছে।'

শাকেরা চালের জন্য ও ঘরে গেল। দরজার মুখে পোটলাটা দেখে চেঁচিয়ে বলল, 'ও ভাবী! এইটা কিগো, এহানে পইড়া রইছে?'

মেহেরজান কিছু বলল না। মেম্বারের আনা পোটলাটা সেভাবেই ঘরের দরজায় পড়ে আছে। শাকেরা সেটি নিয়ে রান্না ঘরের মুখে এসে বলল, 'এই দেহ, এইটা কি?'

মেহেরজান তাকালো না। সে কি বলবে বুঝতে পারছে না। রাগে, ঘৃণায় তার মুখ আবার অন্ধকার হয়ে গেল। ভাবীর দিক থেকে সাড়া না পেয়ে দরজার মুখে বসে শাকেরা পোটলাটি খুলতে লাগলো। শাড়ির প্যাকেটটি খুলেই সে বিস্মিত গলায় বলল, 'ওমা, কি সুন্দর শাড়ি! ও ভাবী, এইটা কার গো ভাবী, আমারে দিবানি?'

মেহেরজান তবুও কিছু বলল না। সে নিজের কাজে ব্যস্ত রইল। বেদনায়, ঘৃণায় তার দু'চোখ সিক্ত হয়ে উঠলো। শাকেরা সাড়া না পেয়ে অন্য প্যাকেটটিও খুলল। ভিতরে মিষ্টি জাতীয় খাবার দেখে তার আনন্দ দেখে কে। সে আর একটি কথাও না বলে একের পর এক গলাদ্ধঃকরণ করতে লাগলো। তার মুখের চপচপ শব্দ নিরব পরিবেশকে সরব করে রাখলো।

www.pathagar.com

একসময় শাকেরা উঠে গিয়ে মেহেরজানের পিঠে হাত রেখে লজ্জিত মুখে বলল, 'ভাবী, কতদিন হয় এমন ভালা খাওন চোখ্যে দেহি নাই। অনেকগুলান খাইয়া পালাইছি। তোমার লাইগা অল্প কয়টা রাখছি।'

মেহেরজান শাকেরার দিকে না তাকিয়ে আস্তে করে বলল, 'সবগুলাই আপনের। আপনে খান। আমি খামু না।'

শাকেরা বিস্মিত চোখে মেহেরজানের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'এই শাড়িটাও?'

মেহেরজান মাথা নাড়লো। শাকেরা আনন্দে মেহেরজানকে জড়িয়ে ধরলো; উৎফুল্ল গলায় বলল, 'কও কি ভাবী! এত সুন্দর শাড়ি আমার! কেডা দিছে গো ভাবী, কেডা আমারে এই সুন্দর শাড়িটা দিছে?'

মেহেরজান বিরক্ত গলায় বলল, 'নিতে কইছি নেন; এত জানাজানির দরকার কি। উঠেন, এগুলা নিয়া ঘরে যান। আমি নামায পড়তে গেলাম।'

শাকেরা খুশিতে ঝলমল করতে করতে শাড়ি হাতে ও ঘরে গেল। মেহেরজান বিধ্বস্ত মুখে কুয়ার পাড়ের দিকে এগুলো।

৬

গত কয়েকদিন ধরে নয়া শাড়ি পরে শাকেরা মনের আনন্দে এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরছে। আজও সেটি পরে মেম্বারদের পুকুর পাড় ধরে এগিয়ে আসতেই সে টুনু মেম্বারের চোখে পড়লো। মেম্বার বিস্ময় দৃষ্টি মেলে তীক্ষ্ণ চোখে শাকেরার দিকে তাকিয়ে রইল। শাকেরা কাছে এসে লাজরাঙা হয়ে বলল, 'ও মেম্বার, কি দেহ এমন কইরা? আমারে কি খুব সুন্দর লাগতাছে? আমার ভাবীর লাহান ত্রিভুবনে আর কেউ নাই। দেখছ, কি সুন্দর শাড়ি আমারে কিন্না দিছে!'

মেম্বার কিছু বলল না। রাগে তার দু'চোখ যেন জ্বলে উঠলো। সে বিক্ষিপ্ত পা ফেলে অন্যদিকে হাঁটতে শুরু করলো।

শেষ বিকেলে মেহেরজান উঠানে শুকাতে দেয়া কাপড়-চোপড় হাতে ঘরের ভিতর ঢুকলো। কাপড় রেখে আঙিনার দিকে যেতেই সে থমকে দাঁড়ালো। বাইরে রান্না ঘরের কোণে টুনু মেম্বার দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে এগিয়ে এসে থমথমে গলায় বলল, 'কামটা তুমি ঠিক কর নাই মেহের। আমি মানুষটা ভালা, আবার...। যাক, যা তোমার মনে চাইছে, করছ; তয় মনে বড় দুখ্ পাইছি।'

মেহেরজান বুঝলো মেম্বার কি বলছে। সে ইতস্তত বিব্রত গলায় বলল, 'আমার তো শাড়ি আছে, অর মোটেই নাই, হেইজন্যই...।'

মেম্বার মেহেরজানকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'কি জন্য সেইটা তুমিই জান, আমার জানার দরকার নাই। তুমি আমারে পর ভাবলেও ভাবতা পার, কিন্তু আমি পারি না। আমি তোমারে আপন বইলাই জানি।'

মেম্বার একটু থামলো। মেহেরজান মাথা নিচু রেখে মূর্তিবত দাঁড়িয়ে রইল। মেম্বার আবার বলল, 'তোমার সঙ্গে কয়টা কথা আছে, জরুরি কথা। অহন হাতে সময় নাই, পরে একবার আসুম। সে সময়ে শাকেরা কোথা থেকে এসে মেম্বারের মুখোমুখি দাঁড়ালো। মেম্বার মেহেরজানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওহ, আইচ্ছা মেহের, তুমি কি হুনছ একাব্বর অর বৌরে

www.pathagar.com

কয় তালাক দিছে? তিন তালাক দিলে তো মহা ঝামেলার ব্যাপার! আমার হইছে বিপদ, তারা হুট কইরা একটা করবো আর আমারে সামাল দিতে হইব।'

মেহেরজান মাথা নেড়ে না সূচক জবাব দিল। শাকেরা বলল, 'আমি হুনছি। আমার সামনে দিছে। আইন তালাক, বাইন তালাক, তিন তালাক দিছে।'

মেম্বার শাকেরার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর বলল, 'বুঝলা মেহের, একাব্বরসহ সবাই কয় তিন তালাক দিছে, আর একাব্বরের মা কয় এক তালাক। অহন যে তালাক দিছে তার কথা বিশ্বাস করুম– না তার মা'র কথা? তালাক দেওনের আগে হারামজাদাগো খেয়াল থাকে না; অহন খেয়াল হইছে। অহন ইউনুছ মৌলভি আর আমার পায়ে একবার পড়ে একাব্বর, আর একবার তার বৌ। তিন তালাক দিয়া থাকলে এইটার কি মীমাংসা করুম কও?'

মেহেরজান ও শাকেরা কেউ কিছু বলল না। তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মেম্বারও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বলল, 'আইচ্ছা ঠিক আছে, অহন তাইলে যাই। পরে কথা কমু।'

৭

রাত যথেষ্ট হলেও ঘুম আসছে না। মেহেরজান বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে। তার দু'চোখের কোণ বেয়ে নিরবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে একসময় শাড়ির আঁচলে মুখ মুছলো।

গত রাতে মেহেরজান একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে, যা তার এত দিনের প্রজ্জ্বলিত তুষের আগুনকে আরো দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে– উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর আশা-নিরাশার দাবদাহে সে যেন জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হচ্ছে। মেহেরজান দেখল, 'শাকেরা কোথা থেকে ছুটে এসে উৎকণ্ঠিত গলায়– 'ভাবী! আমাগো সফি ভাই আইতাছে, ব্যাগ কাঁধে আইতাছে; দেইখ্যা যাও।' বলেই সে আবার ছুটে চলে গেল। মেহেরজান অভিমানে ফুলে উঠে মাথায় আঁচল টেনে শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে রইল। দীর্ঘ অপেক্ষার পরও লোকটা আসছে না দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

এ স্বপ্ন দেখার পর মেহেরজান খোয়াবনামা বইখানা বার কয়েক উল্টিয়েছে। স্বপ্নটা মাঝ রাতে, ডান কাতে হয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে চাইছে। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি নতুন করে উসকে উঠা বেদনাময় স্মৃতির সাগরে মেহেরজান যেন হাবুডুবু খাচ্ছে।

রাত অনেক হলেও কতটা হয়েছে বুঝা যাচ্ছে না। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিরবতা। পাটকাঠির তৈরি বেড়ার ফাঁক আর আলো-বাতাসের লক্ষ্যে কাটা ছোট ছোট ফাঁক গলিয়ে ঘরের ভিতর সোনালি চাঁদের আলো স্থানে স্থানে আলোকিত করে রেখেছে। আজ সম্ভবত পূর্ণিমা। নির্মেঘ নীল আকাশে জ্যোস্নার দাপাদাপি আর মৃদুমন্দ বাতাসের দোলায় দোলায়িত সবুজ গাছ-গাছালির রূপালি রূপ যেন তাই জানান দিচ্ছে। মেহেরজান পাশ ফিরলো। পূর্ব দিকের ফুঁটো গলিয়ে দু'টুকরো বিস্কিট সাইজের রূপালি আলো তার কপাল ও গালে পড়েছে। সে আলোয় অজপাড়াগাঁয়ের এই রূপবতী বিরহী বধূর বেদনাবিধুর মুখখানা আরো অপরূপ রূপ ধারণ করে সফি নামক নিরুদ্দেশ লোকটাকে যেন ধিক্কার জানাচ্ছে।

মেহেরজান হঠাৎ চমকে কান পেতে রইল। কোথা থেকে যেন পায়ে চলার ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে। কেউ যেন নিঃশব্দে পায়চারি করছে– তার শ্রবণেন্দ্রিয়ে সে বার্তা বয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

গত রাতের স্বপ্ন আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে মেহেরজান থির থির করে কাঁপছে। সে উৎকণ্ঠিত হয়ে বেড়ার ফাঁক গলিয়ে এদিক-ওদিক তাকালো। এক জায়গায় দৃষ্টি স্থির হতেই মেহেরজান আরো চমকালো। মানুষের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে, কে যেন ছোট ছোট পা ফেলে বাইরে হাঁটছে। মেহেরজান ছায়াটার উপর দৃষ্টি রেখে বালিশে মাথা রাখলো। মুহূর্তেই তাকে হতাশায় গ্রাস করলো। মানুষটা হলে তো দরজায় কড়া নাড়তো। জীতুদের কেউ হয়তো জ্যোস্নালোকে বাইরে হাঁটছে।

মেহেরজান সেভাবেই কাত হয়ে বালিশে মাথা রেখে তাকিয়ে রইল। ছায়াটা একসময় এগিয়ে এসে ঘরের কোল ঘেসে দাঁড়ালো। আলো-বাতাসের জন্য কাটা বেড়ার ছিদ্রপথে মুখ রেখে একসময় তার দিকে তাকাতেই সে প্রচণ্ড ভয়ে যেন আৎকে উঠলো; আপাদ মস্তক তার থর থর করে কাঁপতে লাগলো। মেহেরজান আর তাকাতে পারছে না। চোখ মুদে পড়ে আছে সে। কে এই কুলাংগার রাতের আঁধারে তাকে দেখছে? মেহেরজান যেন ঘামে নেয়ে উঠেছে। একসময় কোমল গলায় 'মেহের' ডাক শুনতেই সে চমকে বালিশ থেকে মাথা তুললো, ব্যাকুল গলায় বলল, 'কে? কে?'

'মেহের, আমি। আমি মেহের!'

গলার স্বর আর চেহারার আদলটা স্পষ্ট হতেই হতাশা আর ঘৃণায় একাকার মেহেরজান একেবারে ভেংগে পড়লো। উপরে তুলে ধরা মাথাখানা তার এক সময় বালিশে নেতিয়ে পড়লো। দু'চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে বালিশখানা ভিজতে লাগলো। এই রাতে লোকটার দুঃসাহস আর নির্লজ্জতা দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। লোকটা যেভাবে মুখোশ খুলছে, দিনে দিনে বেপরোয়া হচ্ছে– এর থেকে বাঁচার পথ মেহেরজান বুঝতে পারছে না। বাইর থেকে সুধা মেশানো কণ্ঠ একের পর এক ভেসে আসছে। জরুরি কথা বলেই চলে যাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। দরজা খোলার কাকুতি-মিনতি ঝরে ঝরে পড়ছে। বিরক্তিতে অতিষ্ঠ মেহেরজান একসময় চাপা অথচ ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'কি কথা এতো রাইতে? আপনের লজ্জা নাই! চইলা যান কইতাছি, নইলে মানুষ ডাকুম।'

মেম্বারের কণ্ঠ আরো কোমল, আরো সুধাসিক্ত হয়ে ভেসে আসছে। নানারকম প্রলোভন আর প্রতিশ্রুতি একের পর এক শুনিয়ে যাচ্ছে। মেহেরজান কাঁপছে। তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে। লোকটা এই রাতে ঘরে ঢুকতে চায়, যদি কোনভাবে ঢুকে পড়ে? শাকেরাকে কেন কাছে শোয়ায়নি সে জন্য আক্ষেপ হচ্ছে। ওকে ডাকবে কিনা ভাবছে সে। কিন্তু তার মুখ থেকে কোন কথা ফুটছে না। দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে স্তব্ধ হয়ে বিছানায় বসে রইল।

মেহেরজানের সাড়া না পেয়ে মেম্বার আরো আকুতি ঝরানো কণ্ঠে তাকে সুখে রাখার, নতুন বাড়ি ও বাড়ির জায়গাটা লিখে দেয়ার প্রতিশ্রুতি শুনালো। প্রয়োজনে কালই রেজিষ্ট্রি হবে জানালো। লোকটার মুখে এসব শুনে রাগে, অপমানে মেহেরজান একসময় ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'ছিঃ আপনে এত নীচ! এত অসভ্য! দুই'দুইটা বৌ, পোলা-মাইয়া থাইকাও...। এইহান থাইকা যান কইতাছি!'

মেম্বার ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'আমি তো কইছি তোমার সুখের লাইগা সব করমু, সংসারের রানী বানামু, যদি কওতো ঐগুলারে তাড়াইয়া দিমু, তবুও...।'

মেম্বারকে মেহেরজান কথা শেষ করতে দিল না। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উচ্চ গলায় বলল, 'এইহান থাইকা যান কইতাছি, নয়তো...। শাকেরা! এই শাকেরা...!'

www.pathagar.com

মেম্বারের আর কোন শব্দ শোনা গেল না; কিন্তু মেহেরজানের কণ্ঠ রাতের গভীর নিরবতাকে ভেদ করে ইথারে ইথারে অনেক দূর ভেসে বেড়ালো। সে ডাকে পাশের ঘরে শোয়া শাকেরার ঘুম ব্যাহত না হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফজলুর বাবা কলিমউদ্দিন ছুটে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'বৌ! ও বৌ! কি হইছেগো? শাকেরারে ডাকতাছ ক্যান্, কি হইছে বৌ?'

মেহেরজান তখনো হাঁপাচ্ছে; উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে। চাচা শ্বশুরের ডাকে বিব্রত হয়ে এখন নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে। জীতুদের ঘরেরও কেউ জেগে উঠেছে। দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে। সম্ভবত জীতুর মা উঠেছে। মেহেরজান কি বলবে বুঝতে পারছে না। এর কি জবাব সে জানে না। একসময় লজ্জিত গলায় আস্তে করে বলল, 'কিছু হয় নাই চাচাজী, আপনে যান।'

কলিমউদ্দিন বলল, 'ফজলুর মারে কি পাঠাইয়া দিমু? আমি বাইরে আইছিলাম। তোমার গলা হুইনা ছুইটা আইলাম।'

মেহেরজান বলল, 'না, লাগবো না। আপনে ঘুমাইতে যান।'

কলিমউদ্দিন আবার বলল, 'ঠিক আছে, আমি তাইলে গেলাম। সমস্যা হইলে ডাইকো।'

জীতুর মা কোন কথা বলেননি। ও ঘর থেকে দরজা আঁটার শব্দ ভেসে আসছে। মেহেরজান সেভাবেই স্তব্ধ হয়ে বিছানায় বসে রইল।

৮

গাঁয়ের পাঁচ মোড়ল বলে পরিচিত জব্বার সর্দার, এয়াকুব গাজী, টুনু মেম্বার, হালীম মির্জা ও লেয়াকত হাজী গ্রামের ভিতরের ছোট রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। তারা খোশগল্পে মেতে আছে। আজাদ সে রাস্তা দিয়ে উল্টো দিক থেকে যাচ্ছে। লোকগুলোকে দেখামাত্র তার মুখ বিকৃত হলো। সে ছোট ছোট পা ফেলে এগুতে লাগলো।

মোড়লদের মুখোমুখি হয়ে আজাদ কুশল বিনিময় সারলো। তারপর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, 'পাঁচ তারকা' এ অবেলায় জোট বাঁধলেন কি করে, আর যাচ্ছেনই বা কোথায়?'

আজাদের কথায় সকলে হাসলো। জব্বার সর্দার বলল, 'জোট না বাঁইধা কি উপায় আছেরে বাবু। তোমরা তো গাঁ-গেরামে থাকো না। কোন কিছুর খোঁজও রাখো না। সবকিছু আমাগরে দেখতে হয়– সামাল দিতে হয়। এই যে অহন একটা বিচার সাইরা আইলাম। মাঝি বাড়ির গফুরের সব নারিকেল চুরি হইয়া গেছে। চোর তারা দেখছে, আজিবর চুরি করেছে; কিন্তু কিছুতেই সে স্বীকার যাইবো না। যেই বেত দিয়া পাছা লাল কইরা দিছি, অমনি বাপ-বাপ কইয়া স্বীকার গেল। অর্ধেক নারিকেল বাইর করলো; বাকিগুলা বেইছা দিছে। বিচারের রায়ে এক হাজার টাকা জরিমানা। পাঁচশ নগদ উশোল; বাকিটা পরে।'

আজাদ জব্বার সর্দারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। অন্যরাও নিজেদের কৃতকর্মের দক্ষতায় উৎফুল্ল। আজাদ একসময় জিজ্ঞাসু গলায় বলল, 'উশোলের টাকা কি গফুর চাচাকে দিয়ে দিলেন?'

আজাদের প্রশ্নে জব্বার সর্দারকে বিব্রত হতে দেখে টুনু মেম্বার বলল, 'অহন দিমু কিরে! বাকি টাকা উশোল কইরা লই, তারপর।'

এয়াকুব গাজী প্রসংগ ঘুরিয়ে বলল, 'আজিবর'রে এমন একটা পিটন দিছি না, জীবনে আর চুরির নাম লইব না।' গাজীর কথায় অন্যরা মাথা নেড়ে সায় দিল।

www.pathagar.com

আজাদ মনে মনে বলল, 'রোজগার তো মন্দ না, পারহেড একশ টাকা। আরো পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারপর রয়েছে আয়েশী খানা-পিনা আর ছড়ি ঘুরাবার অবাধ স্বাধীনতা। এমন পেশা ওরা ছাড়বে কি করে!'

জব্বার সর্দার আজাদকে বলল, 'তোমার হাতে কি, কৈ যাইতাছ।'

আজাদ বলল, 'সফির অফিস থেকে আরো কিছু টাকা তুলেছি। ম্যানেজার লোকটা খুব ভাল। তিনি মালিককে বলে কয়ে ব্যবস্থা করেছেন। আর অফিসের লোকেরা শাকেরা ও ভাবীকে কিছু কাপড়-চোপড় দিয়েছেন। সেগুলো দিয়ে আসবো।'

জব্বার সর্দার বলল, 'ভালা, ভালা; খুব ভালা। মাইয়াগুলা কষ্টে আছে, অগ বড় উপকার হইবো। একটু থেমে সকলের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'এই মাইয়াটা, মানে সফির বউটা খুব ভালা মাইয়া। সফিটারে খুব ভাল বাইত। অরে যে আল্লায় লইয়া গেছে এইটা তো নিশ্চিত, কিন্তু এতদিনেও মাইয়াটা সফিরে ভুলতে পারে নাই, পথ চাইয়া বইসা আছে।'

সর্দারের কথায় আর সকলে মাথা নাড়লো, কিন্তু টুনু মেম্বার অন্ধকার মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। সর্দার আবার বলল, 'কিন্তু জোয়ান মাইয়া, এইভাবে কয়দিন যাইব। এর কি বাপ-ভাই কেউ নাই? তাদের তো এরে নিয়া নতুন কইরা ভাবা দরকার।'

হালামী মির্জা বলল, 'অর ভাইরা অনেক বার নিতে আইছে, নিয়া বিয়া দিতে চাইছে, কিন্তু কিছুতেই সে যাইব না। তাছাড়া সরল-সিধা শাকেরা আর যে সামান্য জমি-জিরাত, ঘর-দুয়ার আছে– সেইগুলারই বা কি হইব বুঝতে পারতাছি না।'

টুনু মেম্বার এ পর্যায়ে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। আজাদ বলল, 'ঠিক আছে, আপনারা কথা বলেন, আমি আসি।'

আজাদ সফিদের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো।

৯

বেলা প্রায় যাচ্ছে। মেহেরজান থালা-বাসন হাতে কুয়োর পাড় থেকে এগিয়ে আসছে। কিছুদূর এসেই সে অন্ধকার মুখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর আঁচলে ঘোমটা টেনে বিব্রত মুখে এগুতে লাগলো।

লোকটার নির্লজ্জতা মেহেরজানকে হতবাক করে দিয়েছে। এমন মানুষ সে জীবনে দেখেনি। সেদিন রাতের ঘটনার পরও এতটা অবলীলায় লোকটা মুখোমুখি হবে ভাবতে পারেনি; কিন্তু একদিন যেতেই যেন কিছু হয়নি এমনিভাবে এসে ডাকাডাকি শুরু করলো। মেহেরজান লজ্জায়, ঘৃণায় মুখোমুখি হয়নি। গত পরশু আবার শাকেরাকে দিয়ে জরুরী খবর পাঠালো। মেহেরজান তখন জোহর নামাজ শেষে কুরআন পড়ছিল; সে কথা শাকেরাকে দিয়ে জানিয়ে দিল, কিন্তু আজও লোকটা বারান্দায় নির্লজ্জের মত দাঁড়িয়ে। মেহেরজান কি করবে বুঝতে পারছে না। সংকুচিত হয়ে পাশ কেটে এগিয়ে যেতেই মেম্বার পিছন থেকে বলল, 'তোমারে দুইটা কথা কইয়াই চইলা যামু, আমার কথাটা একটু শোন।'

মেহেরজান কিছু বললো না। সে হাতের থালা-বাসন ঘরের ভিতর তাকের উপর রেখে দরজার দিকে এগুতেই মেম্বার রুক্ষ গলায় বলল, 'তোমাগো জমিতে দেহি ফজলুর বাপে হাল দিতাছে; ব্যাপার-স্যাপার কি। তারে কি হাল দিতে কইছ?'

www.pathagar.com

মেহেরজান অন্ধকার মুখে দরজায় দাঁড়িয়ে। সে হালকা গলায় বলল, 'উনারে বর্গা চাষ করতে কইছি।'

মেম্বার রুক্ষ স্বরে বলল, 'কাজটা তুমি ভালা কর নাই। আমার একটা কথাও তোমার কানে ঢুকে নাই। ব্যাপারগুলা আমারে ভাবাইয়া তুলছে। তোমাগো এত বড় শত্রু কহন হইলাম বুঝতে পারতাছি না। জমিটা দিছ অথচ একটু জানানোরও দরকার মনে কর নাই।'

মেহেরজান কিছু বলল না। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মেম্বার তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে আবার বলল, 'শোন, জমিটা আমি চাষ করুম। বিক্রি যখন করবা না, বর্গাই চাষ করুম। তুমি ফজলুর বাপেরে কইয়া দিবা যেন জমির কাছে না যায়।'

মেহেরজান মাথা তুলে মেম্বারের দিকে তাকালো। তারপর আস্তে করে বলল, 'তা কি কইরা হয়! উনি জমি চইষা ফালাইছেন, অহন কি কইরা...।'

মেম্বার মেহেরজানকে শেষ করতে না দিয়ে বলল, 'সব কিছুই হয়, ইচ্ছা থাকলে হয়– না থাকলে কোনটাই হয় না। একটু থেমে ক্রোধ মিশ্রিত গলায় বলল, 'তুমি তো দিনরাইত সফির লাইগা ধ্যান করো, পারলে মরা মানুষরে জ্যান্ত কর; কিন্তু অর কথা বিশ্বাস হয় না? আমি যে কইলাম সফি জমিটা আমারে দিতে কইছে– অর মুখের কথার দাম নাই?'

লোকটার কথা শুনে মেহেরজান অন্ধকার মুখ তুলে তাকালো। রেগে কিছু একটা বলতে গিয়েও সে নিজেকে সামলালো। তারপর আবার মাথা নিচু করে বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

মেহেরজানকে নিরব থাকতে দেখে মেম্বার এবার নরম গলায় বলল, 'তোমরা কি কইরা এতো নিষ্ঠুর হইলা মেহের! তোমাগো লাইগা এত করলাম, এত আপন তোমাগরে জানলাম আর তোমরা কি না আমারে...। জমিটা খুব দরকার মেহের! বাড়ির জন্যই দরকার। তোমারে তো সব খুইলা কইছি; বিক্রি, এজবদল যা ইচ্ছা– আর ...ইয়ে...তুমি...ইয়ে...।'

মেম্বার লাজনম্র ভংগিতে শেষের কথাটুকু বলতে গিয়েও পারলো না। তখনই শাকেরা কোথা থেকে এসে বলল, 'ও মেম্বার, বাইরে দাঁড়াইয়া ভাবীর সঙ্গে কি কথা, ঘরে বইসা কইতে পার না! ও ভাবী, মেম্বাররে বইতে...।'

শাকেরার কথা শেষ না হতেই মেম্বার উদাস গলায় বলল, 'তোগ ঘরে বহনের কপাল কি আমার আছেরে। একটু থেমে শাকেরার দিকে তাকিয়ে বলল, এত সুন্দর শাড়িটা দিছে কেডারে শাকেরা? তোরে তো খুব সুন্দর লাগতাছে।'

শাকেরা খুশিতে ডগমগ হয়ে লাজুক গলায় বলল, 'হুন নাই! আমাগো সফি ভাইয়ের অফিসের সাবেরা দিছে। আমারে দিছে, ভাবীরে দিছে; আবার দশ হাজার টাকাও দিছে।'

'তাই! তা হইলে তো খুব ভালাই হইল রে। তোগ থাইকা যহন টাকা-পয়সা পাই, তহন এইখান থাইকা কিছু শোধও করবার পারবি– কি কস?'

শাকেরা মেম্বারের দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় বলল, 'আমি কি জানি। ভাবী জানে। ভাবীরে কন।'

মেহেরজান আস্তে করে বলল, 'আপনে কত টাকা পান হিসাব কইরা শাকেরার কাছে পাঠাইয়া দিয়েন, তারপর আমি...।'

মেম্বার বিস্মিত গলায় বলল, 'তুমিও কি পাগল হইছ মেহের! অর সঙ্গে মশকরা করলাম, আর তুমি কিনা...। এইসব নিয়া তোমাগো ভাবতে হইবো না। আগে খাইয়া-পইরা বাঁচ; দরকার হইলে আমিই কমু।'

www.pathagar.com

মেহেরজান ও শাকেরা কিছু বলল না। তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। মেম্বার একসময় বলল, 'সন্ধ্যা হইয়া আইল, নামাযটা পড়তে হইবো; আমি তাইলে যাই।'

মেম্বার আঙিনার পথ ধরে এগুতে লাগলো। মেহেরজান পিছন থেকে বলল, 'হিসাবের কাগজটা পাঠাইয়া দিয়েন।'

কথাটা শুনে মেম্বার থামতে গিয়েও আর দাঁড়ালো না। সামনের দিকে পা বাড়ালো।

১০

রাত যথেষ্ট হলেও অন্য দিনের নিস্তব্ধতা আজ নেই। কেথাও যেন কিছু একটা হচ্ছে; মানুষের হৈ-চৈ আর হাসির রোল কানে ভেসে আসছে।

মেহেরজান দিনের কাজ গুছিয়ে শুতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শাকেরা আজও পাশের ঘরে শুয়েছে দেখে তার মেজাজ বিগড়ে গেল। সে হারিকেন হাতে বিরক্ত মুখে শাকেরার দিকে তাকিয়ে রইল। ঘুম থেকে ওকে জাগাবে কিনা ভাবছে সে।

মেহেরজান বার কয়েক চেষ্টা করেও শাকেরাকে জাগাতে ব্যর্থ হলো। এক সময় বিরক্ত হয়ে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সেদিন রাতের ঘটনার পর শাকেরাকে তার কাছে শুতে বলেছে। লোকটার সেদিনের আচরণ তাকে প্রচণ্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছে। শাকেরা দিন কয়েক নিয়মিত শুলেও ইদানিং আসতে চাচ্ছে না। আজও সে তাই করেছে।

মেহেরজান মাত্র শুয়েছে তখনই ফজলুর মা রাবেয়া বেগম বাইরে দাঁড়িয়ে বেড়ার ফুটোয় মুখ রেখে কৌতূহলী গলায় বলল, 'ও বৌ! বৌ! হুইয়া পড়ছ? এইদিকে কি হইতাছে হুনছ?'

মেহেরজান ছোট গলায় বলল, 'কি?'

ফজলুর মা উৎফুল্ল ভংগিতে বলল, 'একাব্বরের বউয়ের হিল্যা বিয়া হইতাছে; কাইল সকালেই আবার তালাক, তারপর একাব্বরের সঙ্গে বিয়া দিব। হুনতাছ না পোলাপাইনে হাসাহাসি করতাছে।'

মেহেরজান কিছু বলল না। ফজলুর মা একটু থেমে আবার বলল, 'মাইঝের বাড়ির রইশ্যারে (রশীদ) দুলা হাজাইয়া লইয়া আইছে। ইনুছ মৌলভি বিয়া পড়াইতাছে। মাদবর-মৌলভিগ খানা-দানারও ব্যবস্থা হইছে। পোলাপাইনে রইশ্যারে উঠানে নামাইয়া কি হাসাহাসিটাই না করল।'

সে হাসির রেশ ধরে ফজলুর মাও হাসলো, কিন্তু মেহেরজান তবুও কিছু বলল না। সে চুপ করে শুয়ে আছে। তার ভিতর একটা দুঃখবোধ খেলে যাচ্ছে। পবিত্র ধর্মে এমন কুৎসিত নিয়ম কিছুতেই থাকতে পারে না, এটা ধর্মের অপব্যাখ্যা। একবার তার এক মাওলানা মামার কাছে সে শুনেছে মানুষ ধর্মের অপব্যাখ্যা করে এই কুৎসিত নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে– যা চরম পাপের কাজ। তাছাড়া অজ্ঞতার বশে নিয়ম লংঘন করে একসাথে তিন তালাক প্রদানের ক্ষেত্রে মতভেদ থাকলেও এক তালাক হিসাবে গণ্য করাই নাকি অধিক সংগত বলে সে মামা জানিয়েছেন। অথচ কেউ কেউ তা না মানায় আজ এই কুৎসিত পথে ধর্মের নামে চরম অধর্ম হচ্ছে; নারীর অপমানকে শতগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে; পরিবার ভাংছে, সন্তানরা তছনছ হচ্ছে অহরহ। মানবতার অধিক ক্ষতি, অধিক অকল্যাণ হয়– কোন বিধানের এমন ব্যাখ্যা প্রকৃত ব্যাখ্যা হতে পারে না। দয়াময়, ক্ষমাশীল, মহান রাব্বুল আলামীনেরও তা অপছন্দ বলে

www.pathagar.com

মেহেরজানের বিশ্বাস। কিন্তু.....।' মেহেরজান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর আস্তে করে বলল, 'আপনে কি ঘরে আইবেন চাচীজী?'

রাবেরা বেগম বলল, 'না, ঘরে যাইমু না। তোমারে দুইডা কথা কইতে আইছি, তুমি একটু হুন।'

রাবেয়া বেগম এরপর এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি ফেলে ফিশফিশে গলায় যা বলল, তার সার কথা হলো– 'জীতুরা মেহেরজানদের বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে নিয়েছে, ছাড়াবাড়ির অংশে গাছ লাগিয়ে জায়গা দখল করেছে; জীতু আর জীতুর মা কোথায় কোথায় কি বলেছে এবং টুনু মেম্বারকে গোপনে জীতুর সাথে পরামর্শ করতে সে দেখেছে– ইত্যাদি ইত্যাদি।'

মেহেরজান এসব শুনেও কিছু বলল না। আর কিইবা বলবে, কিইবা বলার আছে তার। মেম্বারের সাথে জমির আলে ফজলুর বাপের কথা কাটাকাটি হয়েছে– এসব তার কানে এসেছে। জমি বর্গার রেশ ধরে জীতুরাও ইদানিং বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এ জমিতে তাদের অংশ আছে– এ কথা মানুষের কাছে বলে বেড়াচ্ছে। জীতুর মা গতকাল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় অনেক কথাই বলেছে, যার অর্থও একই। মেম্বার ফজলুর বাপের সাথে কথা কাটাকাটির পর আর বেশি দূর এগোয়নি, এ পর্যন্ত মেহেরজানকেও কিছু বলতে আসেনি– জমিতে ফজলুর বাপই ফসল বুনেছে। সুতরাং তলে তলে নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। মানুষের কপাল পুড়লে যা হয় তা হচ্ছে এবং অনিবার্যভাবেই তা ঘটবে– এমন একটা নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি মেহেরজানের বেদনাসিক্ত মুখাবয়বে যেন লেপ্টে আছে।

মেহেরজানের কোন মৌখিক প্রতিক্রিয়া না পেয়ে ফজলুর মা রাবেয়া বেগম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তবে এ মেয়ের অন্তরের বেদনা বুঝতে না পারার মত অজ্ঞ তিনি নন। মেহেরজানকে নানারকম অভয়বাণী এবং খোদাতালার হক বিচারের কথা শুনিয়ে তিনি একসময় সেখান থেকে চলে গেলেন।

রাত অনেক এবং বাড়ির সকল কোলাহল থেমে গেলেও মেহেরজানের ঘুম আসছে না। নানা রকম দুর্ভাবনায় সে এপাশ ওপাশ করছে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এ পর্যন্ত মানুষটার আগমন বা কোন রকম খোঁজ না হওয়ায় মেহেরজানের অন্তরে লালিত প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ইদানিং যেন ফিকে হতে শুরু করেছে। বিশ্বাস যতই দুর্বল হচ্ছে ভিতরের উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও যেন ততই তার বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া বাড়ির লোকগুলো যেভাবে বৈরি হতে শুরু করেছে, স্বার্থের দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছে– এই পরিবেশে কি করে বসবাস সম্ভব সে বুঝে উঠতে পারছে না। গত সপ্তাহে তার বড় ভাই কাদের মিয়া এসে তাকে তিরস্কার করেছে; নির্বুদ্ধিতার কারণে যে ভাল ভাল বিয়ের প্রস্তাব হাতছাড়া হচ্ছে, সেসবও শুনিয়েছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেহেরজানের বেদনাসিক্ত মুখের অনড় অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে তিনি চলে যেতে বাধ্য হলেন।

মেহেরজানের কাছে এখন নিজের চেয়েও বেশি দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে শাকেরা। এই এতিম, সরলা, স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েটি– যে মেহেরজানকে অবলম্বন করে এখনো দাঁড়িয়ে আছে; যে যারপরনাই তাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখে, আর মেহেরজানও যাকে ছোট বোনের ন্যায় স্নেহ করে। তাছাড়া আপন হাতে গড়া জীবনের প্রথম সংসার, যা ঝড়ের প্রবল ঝাপটায় পড়ে এখনো টিম টিম করে জ্বলছে– তাকে নিজ হাতে দপ করে নিভিয়ে দেয়া বা সমূলে উপড়ে ফেলা– ভাবতেই যেন মেহেরজানের গা শিউরে ওঠে। কিন্তু এই পরিবেশ; অনিশ্চিত,

www.pathagar.com

অবলম্বনহীন জীবন; কুয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যত ইত্যাদি ভাবনায় আচ্ছন্ন মেহেরজান গত কয়েকদিন ধরেই নির্ঘুম রাত অতিবাহিত করছে। আজও এর ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হচ্ছে না। রাত গভীর হলেও চোখের কোণে ঘুমের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বেদনা আর হতাশায় আচ্ছন্ন মেহেরজান একসময় পাশ ফিরলো। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদ মাঝ আকাশে অবস্থান নেয়ায় আঁধার কেটে ঘরের ভিতর হালকা আলো ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হলো ঘরের উত্তর কোণে বিজলীর মত টর্চের আলো জ্বলেই আবার নিভে গেছে। মেহেরজানের দৃষ্টি সেখানটায় স্থির হলো। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে সেদিকটায় সে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর একই কায়দায় আবারও আলো জ্বলতেই মেহেরজানের বুক কেঁপে উঠলো। একটা ভয় শিরশিরে অনুভূতি যেন তার পা পর্যন্ত খেলে গেল। আবারও কোন অঘটন পরিকল্পনা হচ্ছে নাতো? মেহেরজান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকটায় তাকিয়ে রইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই মনে হলো কিছু একটা কাটার শব্দ হচ্ছে– যেন বেড়ার বাঁধ কেউ কাটছে। তা মনে হতেই মেহেরজান আতংকে বিদ্যুৎ গতিতে শোয়া থেকে উঠে বসলো। তার শরীর কাঁপছে। ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে। অন্যদিন শাকেরা কাছে শুয়েছে। মাছ কাটার বটিটাও সে সাথে রেখেছে; কিন্তু আজ তাও নেই। মেহেরজান কি করবে বুঝতে পারছে না। শাকেরাকে ডাকবে কিনা ভাবছে সে; কিন্তু ততক্ষণে কোণের বেড়া সরিয়ে একটা ভয়ংকর কালো মানব মূর্তি ভিতরে ঢুকতেই আতংকগ্রস্ত মেহেরজান যেন মূর্ছা গেল। ভয়ংকর পাণ্ডুর মুখে নিথর মূর্তির মত সে বিছানায় বসে রইল। তার মুখে কথা ফুটছে না। শাকেরাকে ডাকতে চেয়েও পারলো না। একসময় মুখ থেকে অস্ফুট গোঙ্গানির মত কি একটা শব্দ হতেই আগন্তুক সন্ত্রস্ত গলায় বলল, ভয় পাইয়ো না মেহের। আমি....আমি টুনু মেম্বার। তোমারে দুইটা কথা.... ইয়ে..., ভয় পাইয়ো না। এই যে আমি, দেহ।'

মেম্বার প্রতিপক্ষকে ভয়মুক্ত করতে টর্চলাইটের আলো আপন মুখের উপর ধরলো; তারপর আবার বলল, এইভাবে ঢুকায় ক্ষমা চাই মেহের। তুমি তো আমার কথা হুনছ না। অথচ কিছু জরুরি কথা তোমারে কওন দরকার। ভয় পাইয়ো না। আমি দুইটা কথা কইয়াই...। মেহের, তোমারে আমি..., আমি তোমারে ভালবাসি মেহের, জীবন দিয়া ভালবাসি। তোমার জন্য..., বিশ্বাস করো, আমি তোমারে...।'

মেম্বার এতোক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে এবার পায়ে পায়ে মেহেরজানের দিকে এগুতেই যেন তার চেতন ফেরে। সে আতংকিত হয়ে ছুটে গিয়ে চৌকির পিছনের বেড়ার সাথে পিঠ রেখে দাঁড়ায়। ভয়ংকর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মেম্বারের দিকে তাকায়। তার দু'চোখে যেন আগুন ঝরছে। সারা অংগ থর থর করে কাঁপছে। লোকটা টর্চ লাইটের আলো ফেলে হেসে হেসে বলল, 'তুমি এমন করতাছ ক্যান মেহের? এইখানটায় একটু বস, শান্ত হইয়া বস। আমি দুইটা কথা কইয়াই...।'

মেম্বার আবারও পায়ে পায়ে এগুতেই মেহেরজান বাঘিনির মত ক্ষেপে উঠে ভয়ংকর অথচ চাপা গলায় বলল, 'বাইর হন কইতাছি! বাইর হন!'

মেম্বার মেহেরজানের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের ভংগিতে হাসলো; তারপর ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'তুমি বাড়াবাড়ি করতাছ মেহের, বড় বাড়াবাড়ি করতাছ। আমি বাইর হওয়ার লাইগা ঢুকি নাই, কয়টা কথা কইয়াই যামু। তুমি শান্ত হইয়া বস।'

লোকটা চৌকির দিকে এগুতে থাকে। মেহেরজান যেন আঁতকে ওঠে। এই নিশি রাতে জানোয়ারটার হাত থেকে বাঁচার উপায় বুঝতে পারছে না। চিৎকার দেবে কিনা ভাবছে সে।

www.pathagar.com

হঠাৎ চোখ যায় বেড়ার খুঁটির সাথে লোহার বড় সাবলটা দাঁড় করে রাখা। বাইরের জ্যোস্নার আলো বেড়ার ফাঁক গলিয়ে ভিতরে আসায় সাবলটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সফি সেবার কলাগাছ লাগিয়ে সেই যে এখানটায় রেখেছে, এখনো সেভাবেই পড়ে আছে। তার কলিজায় যেন পানি আসে। লোকটা চৌকির কাছাকাছি চলে এসেছে। মেহেরজান এবার ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'আর এক পা আগাইবেন না কইতাছি– খবরদার আগাইবেন না।'

মেম্বার উত্তেজিত চাপা গলায় বলল, 'আগাইলে কি হইব, কি করবা তুমি?'

মেম্বার ক্রুদ্ধ ভংগিতে দু'পা এগিয়ে চৌকির কাছে আসতেই মেহেরজান উম্মাদিনীর মত ছোঁ মেরে সাবলটা দু'হাতে নেয়। তারপর ভয়ংকর মূর্তিতে মেম্বারের প্রতি আক্রমণোদ্যত হতেই মেম্বার একলাফে কয়েক হাত পিছিয়ে তাড়া খাওয়া বিড়ালের মত ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মেহেরজান সেভাবেই আক্রমণোদ্যত হয়ে সেখানটায় দাঁড়িয়ে রইল।

প্রাথমিক ধকল সামলিয়ে মেম্বার কাঁপা কাঁপা ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'এতো সাহস তোমার! আমার খাইয়া, আমার পইরা আমারি উপর...! ঠিক আছে, মনে রাইখ, এইটার প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় আমি...। আমারে তুমি চিন না। আমার রূপ তুমি অহনো...।'

মেম্বার যে পথে ঢুকেছে বেড়া সরিয়ে ক্রুদ্ধ ভংগিতে সে পথেই আবার বেরিয়ে গেল।

১১

চৈত্রের খরতাপে গা পুড়ছে। গরমে অতিষ্ঠ মানুষ মাঠ ছেড়ে নীড়ে ফিরছে। ফজলুর বাবা কলিমউদ্দিন লাংগল কাঁধে খালপাড় ধরে এগিয়ে আসছেন। কিছুদূর এসে ছোট রাস্তাটায় উঠতেই দেখলেন বট গাছের নিচে জীতু আর টুনু মেম্বার একান্তে কথা বলছে। লোক দুটোকে এভাবে দেখে কলিমউদ্দিনের ভ্রু কুঞ্চিত হলো। এদের এতোটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ইতিপূর্বে কখনো ছিল না– বলা যায় একে অপরের ছায়াও মাড়াতো না; কিন্তু ইদানিং ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে তিনি ভিতরে ভিতরে শংকাবোধ করছেন। এরা কোন্ পরিকল্পনায় এগুচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছে না; তবে সফির সংসার, সম্পদ নিয়েই যে এ অন্তরঙ্গতা সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত।

কলিমউদ্দিন ধীর গতিতে হাঁটছেন। দু'টি অসহায় মানুষকে নিয়ে এদের আচরণে তিনি খুবই বিচলিত। যেখানে এই বিপদে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়ার কথা, সেখানে তারা নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তিনি শুনেছেন মেম্বার যে কোন উপায়ে সফির রাস্তার পাশের জমি দখলে নিতে চায়, আর জীতুরা চায় উত্তরাধিকারের দাবি অনুযায়ী সবকিছুই গ্রাস করতে। সে কারণে মানুষ দুটোর টুকটাক প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানোয় তারা তার পরিবারকে বাঁকা চোখে দেখছে। সেদিন সফির ভাগের একটা কদমগাছ কেটে নিচ্ছে দেখে তিনি এগিয়ে গিয়ে 'এটা সফিদের' মন্তব্য করতেই জীতুরা পাঁচ ভাই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে। তাকে এসব নিয়ে নাক গলাতে নিষেধ করে দিয়েছে। তাদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে কলিমউদ্দিন ঘরে ফিরে আসেন।

জীতু চিন্তিত মুখে তার মায়ের ঘরে ঢুকলো। আম্বিয়া খাতুন ছেলেকে দেখে এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টি ফেললো। তারপর বসতে দিয়ে ফিসফিসে গলায় বলল, 'কিরে, মেম্বার ডাইকা নিয়া কি কইল?'

www.pathagar.com

জীতু কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে মাথা নিচু করে বসে রইল। একসময় মায়ের দিকে তাকিয়ে ছোট গলায় বলল, 'আইনের নিয়মে আমরা নাকি সামান্য অংশ পাই; কিন্তু যদি শাকেরারে...।'

জীতু কথা শেষ না করে থেমে গেল। মায়ের দিকে ইতস্তত ভংগিতে তাকিয়ে থাকলো। বার দুয়েক ছোট গলায় কাশলো। তারপর বিব্রত গলায় বলল, 'যদি তুমি রাজি হও, দিদারের লগে যদি শাকেরার বিয়া...। ইয়ে...। দিদাররে যদি রাজি করাইতে পারো, তাইলে সবকিছুই আমরা দখলে নিতে পারুম। জায়গা-জমি, ঘর-দুয়ার সব।'

আম্বিয়া খাতুন চিন্তিত মুখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একসময় ধীরলয়ে মাথা ঝাঁকালেন। তারপর বললেন, 'দিদার রাজি হইলে বুদ্ধিটা মন্দ না। আর হইব না ক্যান্, সারাজীবন সিধা বউ লইয়া ঘর করন লাগবো– কথা আছে? দরকার মনে হইলে অয় আরেকটা...।'

মায়ের কথা শেষ না হতেই জীতু উৎফুল্ল ভংগিতে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। আম্বিয়া খাতুনের মুখেও হাসির রেখা খেলে গেল। জীতু চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে বলল, 'তয় আমাগরেও বুদ্ধি কইরা আগাইতে হইব। শাকেরারে আস্তে আস্তে হাত করণ লাগবো। দিদাররেও তুমি কইয়া দিবা।'

আম্বিয়া খাতুন মাথা নেড়ে সায় দিলেন। জীতু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলো। একসময় ভার মুখে মায়ের দিকে তাকালো। তারপর সন্দিগ্ধ গলায় বলল, 'মেম্বার হালায়ও মিছা কথা কইতাছে। হে নাকি সফির সংসারে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করছে। এত টাকা খরচ হইব ক্যামনে?'

জীতু জিজ্ঞাসু মুখে মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার বলল, 'মেম্বার কইতাছে রাস্তার পাশের সফির জমি তারে দেওন লাগব। জমির যা দাম হইব এই টাকা বাদ দিয়া বাকি টাকা হে আমাগরে দিয়া দিব।'

জীতুর কথা শুনে আম্বিয়া খাতুন কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে রইলেন। একসময় মুখ তুলে বললেন, 'তারেও তো হাতে রাহন লাগবো, নইলে তো পারব না। জমির অনেক দাম হইব। বাকি টাকা আমাগরে দিয়া দিলেই হয়।'

জীতু মাথা নাড়লো। আম্বিয়া বেগম উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে পড়ার মত গলায় বলল, 'কিন্তু সফির বউ! তাইনে তো...।'

জীতু মাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ঐ নিয়া তুমি ভাইবো না। অরে এহানে থাকতে দিলেই তো? দেহ না কি করি।'

জীতু বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো। আম্বিয়া খাতুন সেভাবেই বসে রইল।

১২

দিদার গাঁয়ের ছোট রাস্তা ধরে এগুচ্ছে। সে দোকানে যাবে। বড় রাস্তার পাশের চায়ের দোকানগুলো তার প্রতিদিনের আড্ডার কেন্দ্র।

টুনু মেম্বার বাড়ির সম্মুখ দিয়ে দিদারকে যেতে দেখে রসঘন গলায় হেঁকে বলল, 'এই পান্ডা! –এই! – নয়া লুঙ্গি, নয়া জামা পইরা গায়ে বাতাস লাগাইয়া হাঁটতাছ– না?'

www.pathagar.com

মেম্বারের দিকে তাকিয়ে দিদার বিব্রত ভংগিতে হাসলো। মেম্বার কাছে এসে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে বলল, 'কিরে, হুনলাম রাজি হইতাছত না। তোরে কি সারা জীবনের বিয়া অহনই করতে কইতাছি নাকি, বুদ্ধিশুদ্ধি নাই? দরকার হইলে একটা ক্যান্, তোরে দেইখ্যা-শুইন্যা চাইট্টা করামু। সিধা মাইয়া লইয়া সারাজীবন থাকতে কয় কে তোরে?'

মেম্বারের কথা শুনে দিদার ভারাক্রান্ত মুখে হাসলো। মেম্বার আবার বলল, 'আরে গাধা, ভাই হইছত পাঁচটা, আর ঘর আছে দুইখান। বাড়িতে জমি নাই এক টুকরা। বাকি ঘর তুলবি কই, থাকবি কই? আগে বাড়ি-ঘর দখলের একটা পথ কর, তারপর যা করার করিছ- বুঝছত?'

দিদার কিছু না বলে বিষণ্ন মুখে হাসলো। মেম্বার আবার বলল, 'শোন, বুদ্ধি কইরা কাজ করতে হইব। শাকেরারে আগে হাত করণ লাগবো। নইলে পারবি না। হাসি চেপে চাপা গলায় বলল, 'সবকিছু তোরে কি খুইলা কইতে হইবো! স্কুলের মাইয়াগো পিছে আর মাঝি বাড়ির সামনে আড্ডা দেওনের কথা তো কইয়া দিতে হয় না।'

দিদার এবার মুখে হাত চেপে হাসলো। মেম্বার দিদারের বাহুমূলে হাত রেখে বলল, 'কি, পারবি তো? আর আপত্তি নাই তো?'

দিদার আশ্বস্ততার ভংগিতে হেসে মাথা নাড়লো। মেম্বার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একশ টাকার একটা নোট দিদারের হাতে দিয়ে হাসিহাসি মুখে বলল, 'ধর, নিজেও খাবি আর শাকেরারেও এটা-সেটা কিন্যা খাওয়াবি, বুঝলি! আমি তাইলে গেলাম। জরুরি কাজ আছে।'

দিদার টাকা হাতে দাঁড়িয়ে রইল। মেম্বার উল্টো দিকে হাঁটতে লাগলো।

১৩

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে। মেহেরজান তার ঘরে শুয়ে আছে। ফজলু 'ভাবী' বলে ডাকতে ডাকতে মেহেরজানের ঘরে ঢুকলো। মেহেরজান ফজলুকে দেখে বিছানায় উঠে বসলো।

ফজলু বলল, 'ঘুমাইছিলা নাকি? মা কইল খবর দিছ; হেইজন্য আইলাম।'

মেহেরজান আস্তে করে বলল, 'আড়ং-এ গেলে আমাগো কিছু সদায় লাগবো, তাই আইতে কইছি।'

ফজলু বলল, 'অহনই তো যাইতাছি। কি লাগবো কও।'

মেহেরজান বিছানা থেকে নামলো। ঘরের এক কোণে রাখা কাঠের বাক্সটার তালা খুললো। সেখান থেকে টাকা নিয়ে ফজলুর হাতে দিয়ে কি কি আনতে হবে তাকে জানালো।

মেহেরজান পা ঝুলিয়ে চৌকির উপর বসলো। ফজলু টাকা হাতে দাঁড়িয়ে রইল। ফজলু যাচ্ছে না দেখে মেহেরজান একসময় মুখ তুলে তাকালো। তাকে কিছু একটা বলবে মনে হচ্ছে : মেহেরজান মাথা নিচু করলো।

ফজলু একসময় বলল, 'আইচ্ছা ভাবী, বাড়িতে এত কিছু হইতাছে, কিন্তু তুমি কিছুই কইতাছ না; সারাজীবন কি মুখ বুইঝাই থাকবা? সেদিন আব্বারে জীতুরা গালাগাল করলো, জমি বর্গা নিয়া কত কিছু হইল; আর অহন চলতাছে নানা ষড়যন্ত্র। তুমি কিছু না কইলে আমরা কি করুম কও? এইভাবে মুখ বুইঝা থাকলে তো...।'

মেহেরজান বিষণ্ন মুখ তুলে ফজলুর দিকে তাকালো। তারপর আবার মাথা নামিয়ে বলল, 'আমি কি কমু কন; আমার কি কওয়ার আছে। তাগো সাথে তো আমি...।'

www.pathagar.com

মেহেরজান কথা শেষ করলো না। বিষণ্ন মুখে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে রইল। ফজলু আবার বলল, 'শাকেরারে খেয়াল করছ? কয়দিন থাইকা দেখতাছি জীতুগো ঘরে আনাগোনা করতাছে। আম্বিয়া জেঠির সঙ্গে পুশপাশ, কাম-কাইজ করে। এইটা আবার কোন চাল বুঝতে তো পারতাছি না। তুমি ঐ ঘরে যাইতে নিষেধ করতে পার না?'

ফজলুর কথা শুনে মেহেরজান তার দিকে তাকালো। ব্যাপারটা তারো নজরে পড়েছে, কিন্তু ভিন্ন কোন চিন্তা মাথায় ঢোকেনি। এখন ফজলু বলায় ওর কাছেও কেমন কেমন যেন মনে হচ্ছে। সে ফজলুকে কিছু না বলে চিন্তিত মুখে মাথা নিচু করলো। সে সময়ে শাকেরা অনেকটা উৎফুল্ল মুখে 'ভাবী, ভাবী, বলে মেহেরজানের ঘরে ঢুকলো। ফজলুকে ভিতরে দাঁড়ানো দেখে তার মুখের সপ্রতিভ ভাবটা যেন নিভে গেল। কেমন একটা বক্র দৃষ্টিতে ফজলুর দিকে তাকিয়ে খেদ মিশ্রিত গলায় বলল, 'তুই এহানে কি করছ রে ফজলু? ভাবীর সঙ্গে এত কি কথা তোর? মানুষে খারাপ কয়; তুই অহন যা।'

কথাটা বলেই শাকেরা কেন ছুটে এসেছে তা না বলে পাশের ঘরে চলে গেল। তার কথায় স্তম্ভিত মেহেরজান ও ফজলু বিস্মিত দৃষ্টি মেলে শাকেরার গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইল। সরলা শাকেরার মুখে ইংগিতময় জঘন্য আপত্তিকর কথা শুনে দু'জনই হতবাক, কারো মুখে বোবা দৃষ্টি বিনিময় ছাড়া কোন কথা ফুটছে না।

ফজলু একসময় ক্লান্ত গলায় বলল, 'দেখলেন তো ভাবী, এইবার বুঝলেন তো কারা অর মাথায় কি ঢুকাইতাছে– কিসের লাইগা খাতির জমাইছে।'

মেহেরজান কিছু বলল না। ফজলুও আর দাঁড়ালো না। সে হনহন করে থমথমে মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেহেরজান সেভাবেই শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে রইল।

ফজলু বেরিয়ে যেতেই শাকেরা মেহেরজানের ঘরে ঢুকলো। তারপর আঁচলের নিচে লুকানো কাগজে মোড়ানো কি একটা বের করে গদগদ গলায় বলল, 'ভাবী, মাইঝা চাচী মজার মজার পিঠা বানাইছে। আমারে কয়টা খাইতে দিছে। আমি লুকাইয়া তোমার লাইগা দুইটা আনছি। নেও, খাইয়া দেহ।'

মেহেরজান তীক্ষ্ণ চোখে পিঠার দিকে তাকালো। তারপর থমথমে গলায় বলল, 'আপনেরে দিছে আপনে খান; আমি খামু না।'

শাকেরা দ্বিরুক্তি না করে স্বাভাবিক ভংগিতে হাতের পিঠা খেতে লাগলো। মেহেরজান অন্ধকার মুখে বলল, 'একটু আগে যে কইলেন ফজলু আসায় মানুষে খারাপ কয়– কোন মানুষে কয়?'

শাকেরা পিঠা খেতে খেতে স্বভাব-সুলভ ভংগিতে বলল, 'মাইঝা চাচী কইল, একাব্বরে কইল।'

মেহেরজান বলল, 'ফজলু তো আমাগো দরকারে আহে। দরকার ছাড়া কোন দিনই আহে নাই। বাজার সদায়, এটা-সেটা তাইলে কে করতো?'

শাকেরা কিছু বলল না। পিঠার শেষ টুকরোটা সে মুখে পুরলো। মেহেরজান বলল, 'আপনে ঐ ঘরে যান ক্যান? আপনে জানেন না অরা...।'

মেহেরজান কথা শেষ না করে থেমে গেল। ঐ ঘরে গিয়ে আবার কি বলতে কি বলে আসে তার তো কোন ঠিক নেই। শাকেরা বলল, 'আম্বিয়া চাচী আমারে আদর করে, কত কিছু খাইতে দেয়; হেইজন্য চাচীর একটু কাম-কাইজ কইরা দেই।'

www.pathagar.com

মেহেরজান শাকেরার দিকে হতবাক মুখে তাকিয়ে রইল। একসময় ব্যথিত মনে বিছানায় শুয়ে পড়লো। শাকেরার কথায় মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেও সে তাকে দায়ী করতে পারছে না। সরলা মেয়েটাকে কৌশলে হাত করে চক্রান্তের জাল বিস্তার হচ্ছে। লোকগুলো যে ঠাণ্ডা মাথায় এগুচ্ছে তা বুঝা যাচ্ছে। দু'দিন আগে সে জীতু, দিদার আর টুনু মেম্বারকে কুয়ার পাড়ে কথা বলতে দেখেছে। সেই রাতের ঘটনার পর লোকটা এদিকে পা না মাড়ালেও ষড়যন্ত্র থেমে আছে মেহেরজান মনে করতে পারছে না। বর্বর লোকটার পরিকল্পনায় সবকিছু এগুচ্ছে; কিন্তু কি তার লক্ষ্য, কি তার পরিণতি মেহেরজান জানে না। এক অজানা আশংকায় তার দু'চোখ ঝাপসা হলো। ভাবনার অতল তলে সে যেন হারিয়ে গেল। ঠিক তখনই শাকেরা ডেকে বলল, 'ভাবী, বিকালে চুলা জ্বালাইবা কি দিয়া। লাকড়ি, পাতা-পুতাতো কিছুই নাই। আমি কয়টা পাতা কুড়াইয়া আনি।'

মেহেরজান কিছু বলল না। সে সেভাবেই বিছানায় পড়ে রইল। শাকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

১৪

মেম্বারকে বাড়ির সম্মুখের রাস্তা ধরে আসতে দেখে দিদার বলল, 'কই থাইকা আইতাছেন টুনু ভাই? মা আপনেরে দেখা করতে কইছে।'

মেম্বার বলল, 'হাজী বাড়িতে গেছিলাম। তোমার মা'রে কইবা অহন না, রাইতে আমু। একটু থেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, 'কিরে, বাড়িতে থাকছ কি করতি। ফজলু আর তোগ সতী ভাবীর মইধ্যে নাকি পীরিত ভালা কইরাই জইমা উঠছে, কথাটা হাঁচানি?'

মেম্বারের কথায় দিদার সন্দিগ্ধ মুখে তার দিকে তাকালো। তারপর নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'কি জানি! ঘরে যায় আহে দেহি; ভিতরে কি আছে তাতো জানি না।'

মেম্বার চাপা গলায় বলল, 'গাধা'! বোকা-শোকা নাকি রে তুই! আমি তো জানি পীরিত ভালা কইরাই জইমা উঠছে। তোর মাও তো তাই কইল। শুন, কানে কানে শুন...।'

মেম্বার দিদারের কানে কানে কথা বলল। কথা শেষ করে উৎফুল্ল ভংগিতে বলল, 'যদি সফল হস...। হা-হা-হা-হা। এক ঢিলে দুই পাখি....। হা-হা-হা-হা।'

দিদারও মেম্বারের সাথে তাল মিলিয়ে হাসলো। মেম্বার বলল, 'আমি জানি তুই পারবি। তুই পারস না কিছু আছে নাকি! শাকেরারে কি কৌশলে তুই...। হা-হা-হা। আচ্ছা অহন আসি। তোর মারে কইস রাইতে আসুম।'

মেম্বার সামনের দিকে হাঁটতে লাগলো। দিদারও বিপরীত দিকে মুখ ঘুরালো।

দিদার বাড়ির দক্ষিণ দিকের বাঁশ ঝাড়টার কাছে আসতেই দেখলো শাকেরা পাতা কুড়াচ্ছে। সে পিছন থেকে বলল, 'ও শাকেরা, এত সুন্দর শাড়ি পইরা মানুষে বুঝি পাতা কুড়ায়? তোরে তো খুব সুন্দর লাগতাছে রে!'

শাকেরা ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে দিদারকে দেখে বিব্রত হাসলো। তারপর বলল, 'যা! তুই এহানে আইছত ক্যান?'

দিদার বলল, 'তোরে যে সুন্দর লাগতাছে– দেখতে আইছি।'

www.pathagar.com

শাকেরা লাজরাঙা হয়ে বলল, 'ভাবী আমারে যেই শাড়িটা দিছে, হেইটা পিনলে আরো সুন্দর দেহায়।'

দিদার বিস্মিত গলায় বলল, 'তাই! তাইলে তো একদিন দেখতে হইবো।'

শাকেরা বলল, 'কাইল পিন্দা তোরে দেহামু। তুই না কইছত আমারে কি কিন্যা দিবি, দিলিনাত।'

'দিমু, আড়ং থাইকা আনমু। কাইল না তোরে বাদাম খাওয়াইলাম।'

'আইজও খাওয়ান লাগবো।'

'আইচ্ছা।'

শাকেরা আবার পাতা কুড়াতে শুরু করলো। দিদার বলল, 'শুন।'

শাকেরা সোজা হয়ে দিদারের দিকে তাকাতেই বলল, 'থাক, অহন থাক, তোরে পরে কমু। রাইতে ঘরে আসিছ, তহন একটা জিনিস দিমু।'

শাকেরা হেসে মাথা নাড়লো। দিদার সে স্থান ছেড়ে বাড়ির দিকে এগুতে লাগলো।

১৫

মেহেরজান খুবই অবাক হচ্ছে। মাঝে মাঝে চোখ মেলে শাকেরাকে দেখছে। তার নিজের ঘুম হচ্ছে না, কিন্তু এতো রাতেও ঘুম কাতুরে শাকেরাকে বিছানায় ছটফট করতে দেখে বিস্ময়ের সীমা রইল না। সে শাকেরার দিকে তাকিয়ে আছে। জ্যোস্নায় ঢাকা হালকা আঁধারে তার ফর্সা মুখ দেখা যাচ্ছে। বেদনা আর ক্লান্তিতে মাখা সে মুখ।

শাকেরা আবার নড়েচড়ে উঠলো। মেহেরজান সেভাবেই তাকিয়ে আছে। শাকেরার বিধ্বস্ত মুখ তার ভিতরটাকে নাড়া দিয়েছে– একটা চিনচিনে ব্যথা বুকের গহীনে নিঃশব্দে খেলে যাচ্ছে। দু'জনের সুখ-দুঃখ একই সূত্রে গাঁথা; দু'জনই সমান দুঃখি– এমন একটা অনুভূতি ভিতরে জাগতেই তার দু'চোখ ভিজে উঠলো। একসময় চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় তা গড়ালো। মেহেরজান তার মমতা মাখা একখানা হাত শাকেরার বাহুমূলে রাখে। হাতের স্পর্শে শাকেরা চোখ মেলে তাকায়। মেহেরজান নরম গলায় বলল, 'অহনো ঘুমাননি?'

শাকেরা কিছুক্ষণ নিরব রইল। একসময় আবার নড়চড়ে শুল। তারপর আস্তে করে বলল, 'ঘুম আহে না।'

মেহেরজান শাকেরার কপালে হাত রাখে। আংগুলের ডগায় কপাল টিপে। তারপর রুক্ষ চুলে আংগুল চালাতে গিয়ে আস্তে করে বলে, 'ঘুম আহে না ক্যান্?'

শাকেরা জবাব দিল না। সে চোখ মুদে পড়ে আছে। মেহেরজান তার মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে; মোলায়েম হাতে চুল টেনে দিচ্ছে। একসময় মনে হলো শাকেরা ঘুমে তলিয়ে গেছে। মেহেরজান আরো কিছুক্ষণ হাত চালায়। তারপর ক্লান্ত হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে শোয়। ঠিক তখনই তাকে অবাক করে দিয়ে শাকেরা নড়েচড়ে বলল, 'আইচ্ছা ভাবী, আমি বড় না দিদার বড়?'

হঠাৎ এই রাতে এই জাতীয় প্রশ্ন শুনে মেহেরজান যেন চমকালো। সে ঘাড় বাঁকিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে শাকেরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এত রাতেও না ঘুমিয়ে এমন প্রশ্ন ও ভাবনায়

www.pathagar.com

মগ্ন শাকেরাকে যেন সে নতুন করে দেখছে। শাকেরা প্রশ্নটা করে তাকে হতবাক করে দিয়েছে। বিস্মিত মেহেরজান একসময় নিজেকে সামলে নিল। তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আমি কি কইরা কমু। আম্মায় থাকলে কইতে পারতো। তয় আপনেই বড় হইবেন মনে হয়।'

মেহেরজানের কোমল কণ্ঠের সহজ জবাব শুনে শাকেরা অনেকটা উৎসাহিত হয়ে বলল, 'মাইঝা চাচী কয় দিদার বড়। আমি নাকি হইছি বড় খরার চৈত মাসে, আর দিদার হইছে বড় পানির ভাদ্র মাসে। দিদার আমার থাইকা তিন বছরের বড়।'

শাকেরার কথা শুনে মেহেরজান আরো স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কথার ধরণ ও ইংগিত কিছুটা আঁচ করতে পেরে শংকিত মেহেরজান নিজেকে সামলে নিয়ে হালকা গলায় বলল, 'বয়স হিসাব করতাছেন ক্যান? বড় ছোট জানার দরকার কি?'

প্রশ্নটা করতেই মেহেরজানের মনে হলো শাকেরা লজ্জায় সংকুচিত হচ্ছে; লাজরাঙা হয়ে মিটিমিটি হাসছে। তা দেখে সে যেন আঁতকে উঠলো। শংকিত মুখে শাকেরার দিকে তাকিয়ে রইল। শাকেরা একসময় লজ্জিত মুখে বলল, 'তোমারে কইমু না। মাইঝা চাচী কইছে কইতাম না।'

মেহেরজান কাঁপছে। সর্ব অঙ্গে সে থির থির করে কাঁপছে। লোকগুলো কি জঘণ্য খেলায় মেতে উঠেছে তা বুঝতে তার বাকি নেই। সরলা মেয়েটাকে প্রলোভনের জ্বালে আঁটকানো হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের জাল অনেকদূর বিস্তার হয়েছে। বিয়ের প্রহসন করে সবকিছু দখলে নিতে চাইছে। একটা ঘুমকাতুরে সাদা-সিধে মেয়ে, অথচ ফাঁদে ধরা দিয়ে এ মেয়ে মাঝ রাতেও ঘুমাতে পারছে না। এতো রাতেও যে মেয়ে স্বপ্নের জাল বুনে যাচ্ছে তাকে সে কিভাবে বুঝাবে, কিভাবে সর্বনাশা পথ থেকে ফেরাবে মেহেরজান জানে না। তাছাড়া আর কোথায় কি ফাঁদ পেতেছে; তাকে নিয়ে কি ভাবছে তাও তো তার জানা নেই। লোকটার সেদিন রাতের রুদ্র মূর্তি আর প্রতিশোধের ছোবল থেকে সে মুক্ত, তাতো ভাবতে পারছে না। এক অজানা আশংকায় মেহেরজানের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। সে নিথর হয়ে বিছানায় পড়ে রইল। পাশে শোয়া শাকেরা নড়েচড়ে শুল। ওকে এ মুহূর্তে তার এতোদিনের চেনাজানা শাকেরা বলে যেন মনে হচ্ছে না। নির্দোষ জেনেও তার প্রতি একটা ভিন্ন রকম অনুভূতি, ভিন্ন রকম কষ্টবোধ তার ভিতরটায় তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে।

শাকেরা মেহেরজানের কোন সাড়া না পেয়ে একসময় বলল, 'ঘুমাইয়া গেছ ভাবী? তুমি মাইঝা চাচীরে কইয়ো না। মাইঝা চাচী কয় দিদারের লগে আমার...।'

লাজরাঙা শাকেরা কথা শেষ করতে পারলো না। এই রাতেও সে মুখে হাত চেপে লজ্জা ঢাকতে ব্যস্ত রইল। কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতিক্রিয়া জানতে উদগ্রীব হয়ে কান পাতলো। যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হলেও শাকেরা যখন দেখলো ব্যাকুল কণ্ঠের কোন জেরার মুখোমুখি সে হচ্ছে না, তখন বুঝলো মিছেমিছি লজ্জা পেয়ে লাভ নেই, লজ্জা দেয়ার মানুষ এতক্ষণে ঘুমিয়ে গেছে; সুতরাং সেও পাশ ফিরে শুল।

www.pathagar.com

১৬

রাতের খাবার শেষে মেহেরজান শুয়ে আছে। কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে নামায পড়বে সে। শাকেরা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেছে। এটা এখন তার প্রতিদিনের অভ্যাসে রূপ নিয়েছে। ইদানিং শাকেরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে; কোন কথা বললে শুনতে চায় না। কাজ-কর্মও আগের মত করছে না। মেহেরজান তাকে অনেক বুঝিয়েছে। জীতুদের ঘরে যেতে বারণ করেছে, কিন্তু কোন কথা কানে তুলছে না, আগের মতই আসা-যাওয়া করছে; আড়ালে দিদাদের সাথে কথা বলতেও সে দেখেছে। এখন এই রাতে নিশ্চয় ও ঘরে বসে আছে। এই সর্বনাশা পথ থেকে ওকে কিভাবে ফিরাবে মেহেরজান বুঝতে পারছে না। সে চিন্তিত মুখে পাশ ফিরলো।

ফজলু ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমে শাকেরাকে ডাকলো। কোন শব্দ না পেয়ে দরজা খোলা দেখে মেহেরজানকে ডাকতে ডাকতে ঘরের ভিতর ঢুকলো। মেহেরজান ফজলুর আগমন বুঝতে পেরে শোয়া থেকে উঠে বলল, 'আমি এইখানে। এত দেরি করলেন যে?'

মেহেরজানের ঘরে চৌকির নিচে রাখা একটা হারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে। সে আলোয় ঘরখানা মৃদু আলোকিত হয়ে আছে। ফজলু এগিয়ে এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বলল, 'আড়ং থাইকা ফিরার পথে মাজেদা বু'গ বাড়িত গেছিলাম। মাজেদা বু কিছুতেই না খাইয়া আইতে দিল না; হেই জন্য দেরি হইয়া গেল। আর দেখলাম বাজারে মাছ নাই; সাথে পুছবার মত কিছু নাই। তোমাগো লাইগা আনছি আদসের খেসারির ডাল। এই নেও ডাল।'

মেহেরজান ডালের পোটলা ফজলুর হাত থেকে নিয়ে আস্তে করে বলল, 'থাক, না পাইলে আনবেন কই থাইকা। গাছে কয়টা লাউ ধরেছে। লাউয়ে ডালে লাবড়া খাওন যাইব।'

ফজলু বলল, 'শাকেরা কই, ঘুমাইয়া গেছে নাকি?'

মেহেরজান বলল, 'সেই যে খাইয়া বাইর হইছে এই পর্যন্ত আওনের নাম নাই। অহন আর আমার কথা মোটেই শোনে না। অরে নিয়া যে কি করুম বুঝতে পারতাছি না। দিদারগো ঘরে হয়ত আছে।'

ফজলু উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'তুমি কি কিছু বুঝতে পারতাছ না। অরে রাইত-বিরাইতে বাইর হইতে দেও কেন? আমার জানি কেমন মনে হইতাছে, দিদারের লগে একটু বেশি মাখামাখি করতাছে। লক্ষণডা ভালা না। অরা অন্য চালে আগাইতাছে। শাকেরারে ফুশলাইয়া...।'

ফজলু কথা শেষ করতে পারলো না। বাম দরজায় শিকল নড়ার শব্দে শাকেরা এসেছে ভেবে সেদিকে তাকালো। মেহেরজানও কান খাড়া করলো; কিন্তু কাউকে ঘরে ঢুকতে না দেখে বলল, 'আপনে বোধহয় শুনেন নাই, চাচীজানরে কইছি। অরা শাকেরারে দিদারের লগে বি....।'

মেহেরজানের কথা শেষ হলো না। একই কায়দায় সদর দরজায়ও শিকল নড়ার শব্দ শুনে দু'জনেই সেদিকে তাকালো, কিন্তু মুহূর্তেই যা শুনলো, যা ঘটলো, তাতে যেন ওরা আকাশ থেকে পাতালে পড়লো। বিপদ সংকুল গহীন অরণ্যে পথহারা পথিকের মত

www.pathagar.com

অসহায় দৃষ্টি মেলে এদিক-ওদিক তাকালো। ফজলু একসময় চৌকির উপর বসা ঘাড়ের উপর মাথা নেতিয়ে পড়া মেহেরজানের বিধ্বস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত ভংগিতে বাম দরজার দিকে ছুটে গেল। খিড়কি ধরে দরজা টানতেই বুঝলো বাইরে থেকে শিকল আঁটা। সদর দরজায় গিয়ে দেখলো সে দরজাও মারা। ফজলুর কাছে মনে হলো পৃথিবীটা ঘুরছে, প্রচণ্ড গতিতে ঘুরছে। ঘর-দরজা, চৌকি, বেড়া সবকিছুই ঘুরছে। ফজলু নিজেকে সামলাতে ঘরের মাঝের বাঁশের খুঁটিটা ধরলো, তারপর পিছন ফিরে দেহটা খুঁটিতে এলিয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভয়াবহ আগুনে বাড়ি-ঘর আক্রান্ত হলে জ্ঞান হারা মানুষ যেমন দিক-বিদিক ছুটোছুটি আর চিৎকার করতে থাকে, দিদারেরও তেমনি উন্মাদের মত ছুটোছুটি আর চিৎকারে প্রথমে বাড়ি, তারপর পুরো গ্রাম যেন মুহূর্তেই জেগে উঠলো। আশপাশের বাড়ির মানুষও চিৎকার, হৈ-চৈ করে ঘটনা জানতে চাইল। রাতে আগুনে আক্রান্ত কোন বাড়ির দিকে পাড়া প্রতিবেশিরা যেভাবে কুপি, হারিকেন হাতে ছুটে আসে, জীতুদের বাড়ির দিকেও সেভাবে মানুষ আসতে লাগলো এবং মুহূর্তেই বাড়ি ভরে গেল। প্রত্যেকের হাতের আলোয় পুরো বাড়ি আলোকিত। ছেলেমেয়েরা শাকেরাদের বেড়ার ফাঁক গলিয়ে উঁকি-ঝুকি দিচ্ছে। মুরব্বি শ্রেণীর লোকেরা সকলকে চলে যেতে অনুরোধ করছে। জীতু ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জোর গলায় হাঁকাচ্ছে। জীতুর মা তাকে ঘিরে দাঁড়ানো মানুষগুলোর কাছে দুঃখের বয়ান দিচ্ছেন; এমন অপকর্ম বাড়িতে ঘটায় বিয়ে সমস্যার প্রশ্ন তুলছেন। কোন বর এ বাড়িতে পা মাড়াতে আসবে না জানিয়ে কঠোর বিচার দাবি করছেন।

দিদারকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে বড় জটলাটি। চিৎকার আর ছুটোছুটিতে পরিশ্রান্ত দিদার দ্রুত শ্বাস নিতে নিতে একটু আগে দেখা ঘটনার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে– 'কি করে আঁধার ঘরে ফিসফিস শব্দ শুনতে পেয়েছে, কিভাবে নিশ্চিত হলো ঘরের ভিতর কে আছে; তারপর বেড়ার ফুঁটোয় চোখ রেখে যে জঘন্য দৃশ্য দেখেছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে সে লজ্জায় সংকুচিত হচ্ছে। অবশেষে দরজায় শিকল আঁটার বুদ্ধিমত্তার কথা বলতে যেতেই এক মোড়ল লেয়াকত হাজী ছুটে এসে বলল, 'এই বদমাশ, বন্ধ কর। লজ্জা-শরম ধুইয়া খাইছত? আবার মানুষের কাছে কইয়াও বেড়াইতাছত।'

উপস্থিত মানুষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই মিয়ারা, আপনারা যান; যার যার বাড়ি চলে যান। যে অন্যায় হইছে তার বিচার হইব, কঠোর বিচার হইব। আপনেরা সকলে যান।'

পাঁচ মোড়লের তিন মোড়লকে দেখা গেলেও টুনু মেম্বারকে দেখা যাচ্ছে না। এক মোড়ল তার খোঁজ করায় জানা গেল তিনি আসেননি। তিন মোড়ল এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা খুললো। তারপর ফজলুকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিল। লজ্জায়, অপমানে বিধ্বস্ত ফজলু ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি মেলে বাঁশের খুঁটির সাথে সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। কারো নির্দেশ তার কানে ঢুকেছে বলে মনে হলো না। বার বার ডাকার পরও নড়াচড়া করলো না। এক মোড়ল ক্ষেপে গিয়ে ফজলুকে ঘাড় ধরে নিয়ে এলো। কুৎসিত গাল দিয়ে পিঠের উপর দু'ঘা বসিয়ে দিল। ফজলু ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে চাইল, কিন্তু মুখে কোন কথা ফুটলো না। এ রকম বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে ছেলেমেয়েরা হেসে উঠলো। কেউ কেউ কুৎসিত মন্তব্য ছুঁড়ে দিল। একটা আজব প্রাণী দেখার মত উৎসুক দৃষ্টি মেলে সকলে ফজলুর দিকে তাকিয়ে আছে। বাকশক্তি রহিত ফজলু অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে।

www.pathagar.com

পুত্রের চরম দুঃসময়ে এতোক্ষণ আড়ালে চোখের পানি ফেললেও এবার আর ফজলুর মা নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। উম্মাদিনির মত ছুটে এসে ছেলের নির্দোষিতা এবং ষড়যন্ত্র করে ফাঁসাবার কথা তিনি জোর গলায় বলতে লাগলেন। তার কথা শুনে কেউ কেউ তিরস্কারের ভংগিতে হাসলো। জীতু ও তার ভাইয়েরা একযোগে গর্জে উঠে অশ্লীল বাক্য ছুড়তে লাগলো। প্রচণ্ড প্রতিরোধে তিষ্টাতে না পেরে ফজলুর মা একসময় ছেলের হাত ধরে ঘরের দিকে এগুতে লাগলেন। নির্বাক ফজলু মাকে কাছে পেয়ে এবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। তিন মোড়ল সহসা এ দুষ্কর্মের কঠোর বিচার করবেন জানিয়ে চলে যেতে লাগলেন।

অনেকেই যার যার ঘরে চলে গেলেও মহিলারা বাইরে জটলা পাকিয়ে সরস আলোচনায় মেতে আছে। কেউ বা মেহেরজানকে তিরস্কার ও তার সতীপনা নিয়ে উপহাস করছে; কেউবা সন্দেহ, ষড়যন্ত্রের ইংগিত দিয়েও হাতে-নাতে ধরা পড়ায় চুপসে গেলেন। অনেকে বেড়ার ফাঁক গলিয়ে, কেউবা ঘরে ঢুকে মেহেরজানকে দেখছে। বিধ্বস্ত মেহেরজান এলোকেশে মড়ার মত চৌকির উপর পড়ে আছে।

শাকেরা এতোক্ষণ অবাক দৃষ্টি মেলে এখানে ওখানে মানুষের কথা শুনলেও কোথাও কিছু বলেনি। এবার সে ঘরের কোণে মহিলাদের জটলাটার কাছে এসে বোবা দৃষ্টি মেলে দাঁড়ালো। একটু পর জীতুর মা সেখানে এসে শাকেরাকে দেখে বলল, 'কি কইছিলাম তোরে শাকেরা! আমার কথা বিশ্বাস হইছে অহন?'

তারপর অন্য মহিলাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, 'এই সর্বনাশী যে একটা অঘটন বাড়িতে ঘটাইব হেইডা আমি আগেই শাকেরারে কইছি। আমার চোখে আরো কয়দিন পড়ছে, কিন্তু কিছু কই নাই। হেইদিন রাইতে...। না, থাক। এই শরমের কথা কইয়া নিজের ধর্ম খোয়াইতে চাই না। তাইনে সতীপনা দেহায়; সফির লাইগা নাকি পরাণ ফাইটা যায়। ভাইয়েরা কয়বার আইছে, নিয়া বিয়া দিব কইছে– না, তাইনে যাইব না, সফিরে কবর থাইকা তুইলা আনব। আর অহন...। ছিঃ ছিঃ ছিঃ– কেমনে বাড়িতে বাস করমু, মাইয়া-ঝিয়া বিয়া দিমু। দুনিয়া শুদ্ধা মানুষ আইজ বাড়ির মইধ্যে...।'

কথাগুলো বলে জীতুর মা জটলা ছেড়ে বিষণ্ন মুখে ঘরের দিকে এগুতে লাগলো। কেউ কেউ মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল। কারো কারো মুখে ভিন্ন অভিব্যক্তি ফুটলেও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে না পেয়ে নিরবে দাঁড়িয়ে রইল।

একসময় জটলাটি ভেঙে গেল। যে যার ঘরে চলে গেল। হতবিহ্বল শাকেরা হারিকেন হাতে ইতস্তত পা ফেলে মেহেরজানের ঘরে ঢুকলো। মেহেরজান নিথর হয়ে পড়ে আছে।

কিংবর্তব্যবিমূঢ় শাকেরা দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। তার মুখে কোন কথা ফুটছে না। মেহেরজানেরও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। আদৌ এ দেহে প্রাণ আছে কিনা সে বুঝতে পারছে না।

এতদিন মেহেরজানের কাছে শুলেও আজ কি করবে তা শাকেরাকে ভাবিয়ে তুললো। তাছাড়া এখন মেহেরজানকে ডাকবে কিনা, কিছু বলতে হবে কিনা শাকেরা বুঝতে পারছে না। কিছুক্ষণ বোবা দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় হারিকেন হাতে সে বেরিয়ে গেল। তারপর দরজার খিল আটকিয়ে নিজের ঘরে শুতে গেল।

www.pathagar.com

১৭

গত দু'দিন ধরে বিষয়টি মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হচ্ছে। অনেকে ঘটনাটি নিয়ে তিরস্কার করলেও কেউ কেউ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। বড় রাস্তার পাশে হালীমের চায়ের দোকানে কয়েকজন সে বিষয়ে তর্ক করছিল। হাজী বাড়ির কলেজ পড়ুয়া এরফান 'ফজলু ও মেহেরজান এ কাজ করতে পারে না, তারা ষড়যন্ত্রের শিকার'– এ কথা জোর গলায় বলতে লাগলো। তার প্রতিপক্ষরাও পাল্টা যুক্তি দিয়ে বিতর্কে মেতে উঠলো। পাশে করিমের দোকানে চা পানরত টুনু মেম্বার সে বিতর্ক কান পেতে শুনলো। একসময় চায়ের কাপ রেখে হালিমের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দোকানের মুখে দাঁড়িয়ে রসঘন গলায় বলল, 'কিরে, আমাগো এরফান হাজী কি কয় রে?'

মেম্বারের কথার ধরন ও ইংগিতে এরফানের প্রতিপক্ষরা মেম্বারকে স্বপক্ষের বুঝতে পেরে 'হো, হো' করে হেসে উঠলো। মেম্বার এরফানের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল, 'এরফান এখনো ছেলে মানুষ, টিপ দিলে নাকে দুধ গলবে। এসবের কি বুঝবে?– এরফান শুধু ষড়যন্ত্রই খুঁজবে; আর কিছু দেখার, বুঝার ক্ষমতা তার নেই।

কথাটা বলে মেম্বার হাসলো। স্বপক্ষের লোকজনও শব্দ করে হেসে উঠলো। এরফান বিব্রত মুখে টুলের উপর বসে রইল; জবাব দেবার মত জুতসই কথা সে খুঁজে পেল না।

মেম্বার আবার বলল, 'থাক, এইসব নিয়া আলোচনার দরকার নাই, উচিতও না। এই লজ্জা শুধু তাদেরই না– আমাদেরও। তাদের লজ্জা মানে গেরামের লজ্জা। একটু থেমে আবার বলল, একটা ঘটনা যখন ঘইটা গেছে কিভাবে মিটমাট করা যায়, ভবিষ্যতে আর না ঘটে সেই চেষ্টাই করা দরকার। গেরামে দশজন আছেন, মোল্লা-মৌলভি আছেন, তারাই এর বিচার করবেন; আমাগো বিতর্কে জড়াইয়া লজ্জা বাড়াইয়া লাভ নাই।'

মেম্বারের কথায় সকলে মাথা নাড়লো। মেম্বার আবার বলল, 'আজ সন্ধ্যায় আমাগো বাড়িতে দোয়ার মাহফিলের ব্যবস্থা করছি। বাবার মৃত্যু দিবসের দোয়া। তোমাগো সকলের দাওয়াত, তোমরা অবশ্যই আসবা।'

কথাটা বলে মেম্বার দাঁড়ালো না। হনহন করে বাড়ির দিকে এগুতে লাগলো।

রাতে খাবার খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে লোকজন মেম্বারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো। মেম্বার উঠানে দাঁড়িয়ে পান পরিবেশনের পাশাপাশি ভুরী ভোজনের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। সকলেই আয়োজনের উচ্ছসিত প্রশংসা করলেন। প্রতি বাড়িরই মাথা মাথা লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে। বাকী চার মোড়লও তাদের মধ্যে রয়েছে।

অনেকেই ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন। মেম্বার বিদায় জানাচ্ছেন। ইউনুস মৌলভিও আরো একটা পান মুখে পুরে চলে যেতে উদ্যত হলেন। জীতু সে সময় কি একটা বলতে যেতেই মেম্বার সকলকে শুনিয়ে নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'আমারে কইতাছ ক্যান, মাতাব্বর সাব, মৌলভি সাবরা আছেন, তাগরে কও; তারা যা কইবেন তাই হইবো।'

মেম্বারের কথা শুনে সকলে সেদিকে তাকালো। জীতু সবাইকে উদ্দেশ্য করে সেদিনের ঘটনার বিচার চাইলো– ইনিয়ে বিনিয়ে নানা কথা বলতে লাগলো। চার মোড়ল মেম্বারের মুখোমুখি এসে ইউনুস মৌলভির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মৌলভি সাহেব দৃঢ় গলায় বললেন,

www.pathagar.com

এইসব পাপাচারের বিচার হওয়া দরকার। বিচার না হইলে গ্রামে অনাচার বাড়তে থাকবে। এইসব বাড়তে দেওয়া উচিত না। সুতরাং পাঁচ মোড়ল পরামর্শ করে আগামী পরশু রাতে বিচার হবে বলে জীতুকে জানিয়ে দিল।

ইউনুস সাহেব এবার চলে যেতে উদ্যত হতেই মেম্বার তার হাতে মিলাদ পড়াবার হাদীয়া গুঁজে দিলেন। মৌলভি সাহেব মৃদু আপত্তি শেষে তা পকেটে পুরে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন।

বাড়ি এসে পকেট থেকে নোট দুটো বের করলেন, দশ দশ বিশ টাকা। এর বেশি আজকাল কোথাও দেওয়া হয় না। তবে দশ টাকার পরিমাণই বেশি। শহরে নাকি বেশি বেশি হাদীয়া পাওয়া যায়, কিন্তু সে কপাল তো আর সকলের নেই। নোট দু'টো পকেটে রাখার আগে ভাঁজ করতে যেতেই কেমন যেন মনে হলো। হারিকেনটা দূরে বলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না; কিন্তু দশ টাকার নোটের মতও মনে হচ্ছে না। তিনি অনেকটা ব্যস্ত পায়ে হারিকেনের দিকে এগিয়ে গেলেন। নোট দুটো মেলে ধরে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন; কিন্তু তারপরও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। তিনি রান্না ঘরে কাজে ব্যস্ত স্ত্রীকে ডাকলেন। স্ত্রী মর্জিনা বেগম কাছে আসতেই বিগলিত গলায় বললেন, 'দেখ তো এগুলা কত টাকার নোট?'

মর্জিনা বেগম তাকিয়ে বললেন, 'একশ টাকার।'

ইউনুস সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'বলো কি! লোকটা ভুল করেনি তো। বিস্ময়ের ঘোর কিছুটা কাটতেই হালকা গলায় বললেন, ভুল করার লোক তো সে না। মানুষটার দিল আছে, বড় দিলের মানুষ।'

মর্জিনা বেগম উৎফুল্ল ভংগিতে মাথা নাড়লেন। ইউনুস সাহেব প্রশান্ত মুখে তা ভাঁজ করে স্ত্রীর হাতে দিলেন।

১৮

সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলতে শুরু করেছে। চৈত্রের লালচে আভাযুক্ত খাঁ খাঁ রোদে প্রকৃতিতে যেন আগুন ধরেছে। সবুজ লতা-পাতা রোদের উত্তাপে সতেজ প্রাণ হারিয়ে কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে। মানুষ, পশু-পাখি প্রকৃতির রুদ্র মূর্তি দেখে নীড়ের আশ্রয়ে ফিরছে। ফজলুর বাবা কলিমউদ্দিনও লাংগল কাঁধে গরু তাড়িয়ে মাঠ থেকে ফিরলেন। লাংগলটা রান্না ঘরের কোল ঘেঁসে রেখে গরু দুটোকে গাছের ছায়ায় বাঁধলেন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তার পেট চোঁ চোঁ করছে। ঘরে ফিরতেই স্ত্রী রাবেয়া বেগম খেতে বসতে বললেন, কিন্তু কলিমউদ্দিন লুংগি-গামছা কাঁধে ফেলে পুকুর ঘাটে ছুটলেন।

গোসল সেরে এসে লোকটা খালি গায়ে মাটিতে বিছানা পেতে খেতে বসেছে। ফজলুর মা খেতে দিয়ে তালের পাখা হাতে বাতাস করছে। কলিমউদ্দিন কোন দিকে না তাকিয়ে গোগ্রাসে খেয়ে যাচ্ছে।

রাবেয়া বেগম বিষণ্ন মুখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন। তার বুক ফেটে যাচ্ছে, দু'চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে; মানুষটারে কথাটা বলা দরকার। পরামর্শ করে কিছু একটা করতে হবে, কিন্তু কিভাবে বলবে সে বুঝতে পারছে না। এই রোদে পুড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে মন মেজাজ চড়ে আছে। তার উপর...।

www.pathagar.com

রাবেয় বেগম আঁচলে চোখ মুছলেন। না বলেই বা উপায় কি, ফজলুর অবস্থাও ভাল না। সেদিন রাতের ঘটনার পর সেই যে জ্বরে পড়েছে আজ পর্যন্ত সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। এ পর্যন্ত জ্বর ছাড়েনি। ডাক্তার ঔষধে কিছুই হচ্ছে না। এই লজ্জা ছেলেটা হজম করতে পারছে না। তার উপর...।

রাবেয়া বেগম আবার আঁচলে চোখ মুছলেন। কলিমউদ্দিন আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। খাবার শেষ করে সোজা হয়ে বসলেন। একসময় পান হাতে নিতে গিয়ে তিনি ফজলুর অবস্থা জানতে চাইলেন। রাবেয়া বেগম মাথা নেড়ে ভাল নয় জানিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'অহন কি করবা কও। পোলাডা আমার শেষ হইয়া গেছে, এত বড় অপমান হজম করতে পারতাছে না। তার উপর আইজ রাইতে অরা বিচার ডাকছে। এই বয়সেই পোলার কপালে এত বড় কলংক ঝুলাইয়া দিছে। অহন আবার বিচারের নামে এলাকা শুদ্ধা ঢোল পিটতে চাইতাছে। এই পোলারে কেমনে বাঁচাইয়া রাখবা, আর বাঁইচা থাইকাইবা...।'

রাবেয়ার বেগম কথা শেষ না করে কাঁদতে লাগলেন। কলিমউদ্দিন বিষণ্ন মুখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনিও কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। কেন যে অসহায় মানুষ দুটোর পাশে দাঁড়াতে গেলেন সে জন্য আক্ষেপ হচ্ছে। রাবেয়া বেগম আঁচলে মুখ মুছে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা কাম কর না, মেম্বার বাদে আর মোড়লগো কাছে যাও না। এইটা যে আমাগরে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র একটু বুঝাইয়া কও। কেউ আমাগো পক্ষে কথা কইলেও তো...।'

কলিমউদ্দিন বিষণ্ন মুখে মাথা নিচু করে বললেন, 'কোন লাভ হইবো না। অরা সব মেম্বারের চেলা। মেম্বারের কথার বাইরে যাওনের মুরোদ তাগো নাই। আল্লার কাছে কও, এইকালে বিচার না হইলেও পরকালে হইবই। অন্যায়ের শাস্তি তারা পাইবই।'

রাবেয়া বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কলিমউদ্দিন বললেন, 'ঐ মাইয়াডার কি অবস্থা। মাইয়াডা মুখ খুইলা সত্য কথা কইলেও তো...। হুনতাছি নাকি...।'

ফজলুর মা উত্তেজিত মুখে বললেন, 'তাইনের কথা বাদ দাও। তাইনে নিজেও মরছে, আমাগরেও মাইরা গেছে। তার মাথা খারাপ হইয়া গেছে; মুখের ভিতর রাইখ্যা কি যেন বিড়বিড় করতাছে। এই কয়দিনে নাওয়া-খাওয়া ছাইড়া শুকাইয়া কাঠ হইছে। একটু আগে গেছিলাম যদি দরবারে খাড়াইয়া সত্য কথাডা কয়। গিয়া দেহি ঘরের কাছে কলাগাছ জড়াইয়া বিড়বিড় করতাছে। ঘরে আইনা মাথায় পানি দিলাম, বুঝাইলাম, চাইট্টা খাওয়াইতে চাইলাম– পারলাম না। তারপর দেহি কইথাইকা জানি সফির পুরান লুংগি আর জামা বাইর করলো। শাড়ির উপর দিয়া হেইগুলা পিনদা আবার বিড়বিড় শুরু করলো।'

কলিমউদ্দিন বিস্মিত গলায় বলল, 'কও কি! সর্বনাশ! ডাক্তার ডাকন দরকার। ডাক্তার না ডাকলে...।'

স্ত্রী রাবেয়া বেগম তাকে থামিয়ে দিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'রাহেন আপনের ডাক্তার। তাইনের লাইগ্যা অনেক করছি; কইরা আইজ আমাগো...।'

রাবেয়া বেগম উত্তেজনায় কেঁদে ফেললেন। আঁচলে মুখ চেপে হু-হু করে উঠলেন। কলিমউদ্দিন স্ত্রীর একখানা হাত ধরে কাঁপা গলায় বললেন, 'কাঁইদো না। মাইয়াডার কোন দোষ নাই। আমার পোলারও নাই। এমন ভালা মাইয়া খুব কমই আছে। দোষ হইলো গিয়া ঐ...।'

www.pathagar.com

কলিমউদ্দিন কথা শেষ করতে পারলেন না। উত্তেজনায় তার দু'চোখ ছলছল করছে। তিনি কাঁধের গামছায় চোখ মুছলেন। তারপর জোহরের নামায সারতে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মাগরিবের নামায পড়ে ইউনুস সাহেব মসজিদ থেকে বেরুতেই টুনু মেম্বার ইশারায় ডেকে পুকুর পাড়ের দিকে হাঁটতে লাগলেন। মেম্বারের পিছুপিছু আম গাছটার নিচে এলে মেম্বার ছোট গলায় বললেন, 'জীতুরা তো আইজ দরবার ডাকছে। এর কি মীমাংসা বুঝতে তো পারতাছি না। তবে শরীয়ত মত সমাধা হইলেই ভালা হয়; এইকাল-ঐকাল দুইডাই রক্ষা পায়। আপনে শরীয়তের যে রায় দিবেন আমরা সেইটাই মাইনা নিমু। কুকর্মের এমন বিচারই হওয়া উচিত।'

মৌলভি সাহেব মাথা নাড়লেন। মেম্বার আবার বললেন, 'এই মাইয়ার ভাইয়েরা বার বার আইছে। তারে নিয়া বিয়া দিতে চাইছে; কিন্তু সে যাইবো না– সফির লাইগ্যা ভং ধরছে; আর অহন এই কাণ্ড ঘটাইছে। এইহানে থাকলে আরো কত কি ঘটায় কে জানে।'

মৌলভি সাহেব মাথা নাড়লেন। মেম্বার একটু থেমে আবার বললেন, 'এরে চইলা যাওনের ব্যবস্থা করা দরকার। বিচারের রায়েও সেইভাবে বইলা দিতে হইব। তার ভাইরা আইসা তারে নিয়া যাইব। গেরামে আর কোন অপকর্মের সুযোগ দেওন যাইব না।'

ইউনুস সাহেব এবারও জোরালো ভংগিতে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, আপনারা দশজন তো আছেনই। কখন বসা হবে?

'এই তো এশার পর। চলেন যাই। নামায, খাওয়া-দাওয়া সাইরা জীতুগো বাড়িতে চইলা আইসেন।'

ইমাম সাহেব মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সামনের দিকে এগুতে লাগলেন।

এশার নামাযের পর পরই জীতুর ভাইদের ছুটোছুটি শুরু হলো। চেয়ার, বিছানা-চাটাই সংগ্রহ করে শাকেরাদের উঠানে বিছাতে লাগলো। মানুষ ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। চাঁদের আলো সত্বেও হারিকেন হাতে কেউ কেউ আসছে। জীতু সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো উঠান ভরে গেল। মানুষের গমগম শব্দ বাড়িময় ছড়িয়ে পড়লো। বিচারকের চেয়ে কৌতুহলী মানুষের সংখ্যাই বেশি।

শাকেরা উদ্বিগ্ন মুখে বেড়ার ফাঁক গলিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। এতো মানুষ আসছে কেন সে বুঝতে পারছে না। দিদারদের ছুটোছুটিও তার ভাল ঠেকছে না। সেদিনের পর থেকে লক্ষ্য করেছে দিদার তার সাথে কথা বলছে না; আম্বিয়া চাচীও আগের মত মিশছে না। লোকগুলোর হঠাৎ কি হলো বুঝে উঠতে পারছে না। শাকেরা বিস্মিত মুখে উঠানের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাঁচ মোড়লের চার মোড়ল আগেই চেয়ারে আসন নিয়েছে। মেম্বার আর ইমাম সাহেবের অপেক্ষায় এতোক্ষণ সকলে গল্প-গুজবে মেতে ছিল; একটু পূর্বে তারা দু'জন এসে পাশাপাশি আসন নেয়ায় মজলিশে একটা গুরুগম্ভীর ভাব সৃষ্টি হলো। লিয়াকত হাজী হাঁক ছেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কেউ আসার বাকি আছে কিনা?'

www.pathagar.com

জীতু না সূচক জবাব দিতেই বলল, 'তাইলে আর দেরি করা উচিত না। রাত অনেক হইছে। বিবাদিরা সকলে হাজির কি না?'

বিবাদিদের খবর দিতে লোক পাঠানো হলো। একজন এসে জানালো ফজলু খুব অসুস্থ্য, সে আসতে পারবে না। তার বাবা আসছেন।

এ কথায় মজলিশে গুঞ্জরণ হলো। অভিযুক্ত না এলে বিচার হবে কার? সুতরাং তাকে আসতে হবে। আবার লোক পাঠানো হলো।

মেহেরজানকে ডাকতে শাকেরার ডাক পড়লো। কেউ কেউ উঠান থেকে ডাকতে লাগলো। শাকেরার কেমন যেন রাগ হলো, 'লোকগুলি আমারে ডাকে ক্যান? ভাবীরে ডাকে ক্যান? ভাবীতো মরতাছে, কেউ তো একবার আইসা দেইখাও গেল না। সেই দিনের পর থাইকা দুনিয়ায় আছে কি নাই মানুষটা কইতেও পারবো না। খানা নাই, দানা নাই, ডাক্তার ওষুধ কিছুই নাই; শুকাইয়া কাঠ হইছে। আর অহন পাগলের মত বকতাছে। দিদারের উপরও তার রাগ হলো। দিদার কেন সেদিন চিল্লিয়ে মানুষ জড়ো করলো। সেই অপমানে তার ভাবীর এই অবস্থা। ফজলু তো তাগো ঘরে আইছে গেছে, সদায়-পত্র কইরা দিছে। সেই রাইতেও সে দেখেছে একটা ডাইলের পোটলা চৌকির উপর পইড়া রইছে। নিশ্চই ফজলু ডাইল দিয়া যাইতে আইছে। আর দিদার কইল কিনা– ছিঃ ছিঃ ছিঃ; তার ভাবীর মত মানুষ এমন কাজ কিছুতেই করতে পারে না, মইরা গেলেও না। দিদার কি কইরা এমন মানুষের নামে...।'

শাকেরা আসছে না দেখে কেউ একজন উত্তেজিত গলায় ডাকতেই তার মেজাজ বিগড়ে গেল। সে রেগে গিয়ে দরজা খুলে উঠান ভর্তি মানুষের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'এতো ডাক পাড়তাছেন ক্যান? ভাবী মরতাছে আর আপনেরা ডাকতাছেন। এতো মানুষের এহানে কি?'

শাকেরার কথা শুনে সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ হেসে উঠলো। জীতু প্রথমে থমকে গেল, তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে হাঁক ছেড়ে বেয়াদবি না করার জন্য শাকেরাকে শাসালো। মাতাব্বরদের ফয়সালায় শেষ পর্যন্ত দুই কিশোরকে পাঠানো হলো। তারা ঘরে গিয়ে মেহেরজানকে দেখলো। মেহেরজান ঘরের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে নির্লিপ্ত ভংগিতে কি সব জপছে সে; দুনিয়ার কোন খবর আছে বলে মনে হচ্ছে না। এতো লোক সমাগমে তার বিচার হচ্ছে, সে রকম কোন অনুভূতির ছোঁয়াও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। দু'জনই 'থ' হয়ে তাকিয়ে রইল। রূপবতী, স্বাস্থ্যবান মানুষটার এই বিপর্যস্ত পরিণতি তাদেরকে ব্যথিত করে তুললো; কেউ তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে বলার সাহস পেল না। একসময় ফিরে গিয়ে তারা মজলিসে মেহেরজানের অসুস্থ্যতার কথা জানালে লেয়াকত হাজী বলল, 'থাক, তার আসন লাগবো না। ঐখানে বইসা শুনলেই হইবো। ফজলু আইছে যহন অসুবিধা নাই।'

এই প্রচণ্ড গরমেও ফজলু চাদর মুড়ি দিয়ে এসেছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। একটা চাটাইয়ের উপর নিচু মাথায় বসে আছে সে। তার বাবা তার পাশে রয়েছে। ফজলুর বিপর্যস্ত উশকো-খুশকো মুখের দিকে অনেকে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। উঠানের পশ্চিম কোণে আড়ালে দাঁড়ানো ফজলুর মায়ের সুর করা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে।

রাত বেশি হচ্ছে দেখে অনেকে তাড়া দিল। সুতরাং বিচার পর্ব শুরু হলো। দিদারকে তার অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ দেয়া হলো। দিদার দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা বিব্রত গলায় সেদিন রাতের দেখা ঘটনা বলতে লাগলো।

www.pathagar.com

শাকেরা মেহেরজানের চৌকিতে বসে বেড়ার ফুঁটোয় চোখ রেখে দিদাদের কথা শুনছে। দিদার মেহেরজানের সাথে ফজলুর আপত্তিকর দৃশ্যের বর্ণনা দিতেই সে উত্তেজনায় ফোঁসে উঠলো। ঘর থেকে চিৎকার দিয়ে বলল, 'এই দিদার, এই! আল্লার গজব পড়বো! আমার ভাবীর নামে এতো বড় মিছা কইতাছত, আল্লার গজব পড়বো! এই ভালা মানুষটার নামে তুই...।'

শাকেরার কথা শুনে পুরো মজলিশের দৃষ্টি সেদিকে ফিরলো। দিদারও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, কিন্তু মুহূর্তেই পাঁচ মোড়ল ও জীতুর হুঙ্কারে শাকেরার কথা তলিয়ে যেতে লাগলো। তার কথা আর কিছুই বুঝা গেল না।

শাকেরাকে কঠোরভাবে শাসিয়ে দেয়ার পর দিদার বাকি কথা শেষ করে থামলো। ফজলু লজ্জিত মুখে মাথা নিচু করে বসে রইল।

ফজলুকে এবার বলতে সুযোগ দেয়া হলো। অসুস্থ্য ফজলু দাঁড়াতে পারছে না। তার শরীর কাঁপছে, গা পুড়ে যাচ্ছে। একজন তাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো।

জীতুর মা আম্বিয়া খাতুন উদ্বিগ্ন মুখে উঠানের মানুষ ডিংগিয়ে শাকেরার কাছে যেতে চাইলেন। শাকেরাকে তার ভীষণ প্রয়োজন; কিন্তু মেয়েটা ঘর বের হচ্ছে না; বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। আজ কেন এমন করছে বুঝতে পারছেন না। একে এখনই থামাতে হবে। তিনি কিছুদূর এগিয়ে যেতেই কে একজন গর্জে উঠায় বিব্রত মুখে পিছু হটলেন।

ফজলু ক্ষীণ কণ্ঠে তার কথা বলে গেল। তাদেরকে ফাঁসানোর জন্যই যে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে তা সে জোর দিয়ে বলল। জীতুরা কখন কোথায় কি করেছে– সফির জায়গা দখল, গাছ কাটা, তাতে তাদের বাধা দেওয়া ইত্যাদি তুলে ধরে গুছিয়ে বলতেই টুনু মেম্বার তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এইসব বাদ দাও, সেইদিনের কথা কও। তুমি যে কইলা এত রাইতে ডাইলের পোটলা দিতে গেছ– এটা তো তোমার মা, বোন বা অন্য কাউরে দিয়াও পাঠাইতে পারতা অথবা পরের দিন দিলেও ক্ষতি ছিল না। আর দিতেই গেছ যখন ঘরে রাইখা চইলা আসলেও পারতা; অন্ধকারে একা একজন স্বামীহীন যুবতী নারীর শোবার ঘরে ঢুইকা গল্প করার কি দরকার ঠেকলো?'

মেম্বার কথাটা বলে ফজলুর দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তার যুক্তির সমর্থনের আশায় উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টি ঘুরাতে লাগলো। অনেকে মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন জানালো। সে আবার ফজলুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'দিদার যে কইল তুমি আপত্তিকর অবস্থায় ঐ ঘরে ছিলা, সে কি মিছা কইছে? তাছাড়া শুধু ঐদিনই তো না, আরো অনেক দিন তোমারে অনেকে আপত্তিকর অবস্থায় ঐ ঘরে দেখেছে; সেটাও কি অস্বীকার করবা?'

ফজলু মাথা তুলে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'মিছা কথা। সব মিছা কথা। এমন পাপের কামে আমি কোনদিন পা রাখি নাই। ভাবীরে আমি বড় বোনের মত জানি, আর ভাবীও আমারে ছোট ভাইয়ের মত জানে। এমন মানুষরে জড়াইয়া এমন কথা...।'

ফজলু কথা শেষ করতে পারলো না। সে ছাদরে মুখ চেপে হু-হু করে কেঁদে উঠলো। এ পর্যায়ে ফজলুর বাবা দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাইলে অনেকে তাকে বাধা দিল। জীতু ও টুনু মেম্বার ক্ষেপে উঠলো। তবু তিনি বলতে থাকলেন, 'আমার পোলারে ছোটকাল থাইকা আপনেরা দেইখা আইছেন। কোনোদিন বড় কোন অন্যায় কাম সে করছে এমন কথা কেউ কইতে পারবো না। অহন যে কলংক আমার পোলার নামে রটানো হইছে

www.pathagar.com

এইসব খারাপ কামে আগে কোনদিন গেছে এই কথাও কেউ কইতে পারবো না। আইজ অসহায় মানুষ দুইডারে লইয়া, তাগো জাগা-জমি, ঘর-দুয়ার লইয়া যে...।'

কলিমউদ্দিন শেষ করতে পারলেন না। প্রচণ্ড হৈ-চৈ, চিৎকারের নিচে তার কথা তলিয়ে যেতে লাগলো। জীতুদের পাঁচ ভাইয়ের ছুটোছুটি দাপাদাপিতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো।

মাতাব্বররা ফজলুর বাবাকে থামালেন। জীতুদের থামাতে হাঁক ডাক করতে লাগলেন। মৌলভি ইউনুস সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে অনুরোধ করায় পরিবেশ কিছুটা শান্ত হলো। তখনই জীতুর মা আম্বিয়া খাতুন মজলিশের এক কোণে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ফজলুর বাপেরে দুইটা কথা কইতাম চাই।'

তার কণ্ঠ শুনে সকলের দৃষ্টি সেদিকে ফিরলো। তিনি বললেন, 'ফজলুর বাপে তো এতোক্ষণ অনেক কথা কইল। তার পোলা নিষ্পাপ, পাপের আঁচড় লাগে নাই হুনাইল; কিন্তু এই পর্যন্ত পোলা যেইসব কীর্তিকাণ্ড করছে, নিজ চোখে যা দেখছি– হেইগুলা কইলে তো বিশ্বাস করবো না, ষড়যন্ত্রের কথা কইবো। তয় একদিনের ঘটনাই শুধু কই, সেইটার স্বাক্ষী ফজলুর বাপ নিজেই দিবো, আমরা দিমু না। ঘটনাটা হইল গিয়া যেইদিন রাইতে সফির বৌ 'শাকেরা' 'শাকেরা' কইয়া চিৎকার দিল, হেই চিৎকার শুইনা ফজলুর বাপে ছুইটা আইলো। তার আওনের আগেই বাইরে যাইতে উইঠা আমি ঘরের দরজায় দাঁড়ানো। আপনে আইসা সফির বৌরে কি হইছে জানতে চাইলেন। বৌ কইল না; কিন্তু হেইদিন কি হইছিল আপনে কি জানেন? আপনের পোলা বাঁধ কাটা বেড়ার কোণা ঠেইলা বাইর হইয়া আমার সামনে দিয়া পালাইল; তবুও তো আপনের ইজ্জতের দিকে চাইয়া কারো কাছে কই নাই– আপনেরেও কই নাই। আর আইজ আপনে হেই পোলা নিয়া বড় গলায় কথা কইতাছেন। আমাগো ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করতাছেন।'

আম্বিয়া খাতুন কথাগুলো বলে থামলেন। তার কথা শুনে টুনু মেম্বার মাথা নিচু করলেন। পুরো মজলিশ স্তব্ধ হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে থাকা কলিমউদ্দিন অসহায়, বেদনাসিক্ত চোখে পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন। বিস্ময়ে বিমূঢ়, জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন, কম্পনরত ফজলু বাবার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে শুধু বলতে পারলেন, 'মিছা কথা বাবা! মি...।'

ফজলুর জড়ানো কণ্ঠ থেমে গেল। দু'চোখ মুদে যেন সে টলে উঠলো। মুহূর্তেই দাঁড়ানো ফজলু পাশে বসা একজনের উপর ধপাস করে পড়ে গেল। পুরো মজলিশে একটা গুঞ্জরণ উঠলো। এক কোণ থেকে ফজলুর মায়ের চিৎকার শোনা গেল। ফজলুর বাবাসহ আরো দু'জন ধরাধরি করে তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

বিচার মজলিশে কিছুক্ষণ নানা মুখি কথাবার্তা, হৈ-চৈ হলো। কলিমউদ্দিন আর ফিরে আসলেন না। লিয়াকত হাজী একসময় দাঁড়িয়ে বললেন, 'ফজলু অসুস্থ। অসুস্থ শরীলে দাঁড়াইয়া থাকতে থাকতে সে পইড়া গেছে। রাইত যথেষ্ট হইছে, আর দেরি করণ ঠিক না; অন্যদিন বসাও সম্ভব না। অহনই একটা মীমাংসা কইরা আমাগো যাওন দরকার।'

বিচারকদের সকলেই তার কথায় সম্মতি জানালো। সুতরাং বিচারের বাকী কাজ শুরু হলো। টুনু মেম্বার দাঁড়িয়ে বলল, 'আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। দুই পক্ষের কথাই আমরা হুনছি– কোন কিছু বাকী নাই। সুতরাং আমাগো শ্রদ্ধেয় ইমাম সাব আছেন, মোড়ল সাবরা আছেন; এর কি রায় দেওন যায় সেইটাই অহন ঠিক করা দরকার।'

www.pathagar.com

মেম্বারের কথায় সকলেই সায় দিল। ইয়াকুব সর্দার বলল, 'আপনেরা হগলে হৈ-চৈ না কইরা বইসা থাকেন। ইমাম সাব, মোড়ল সাবরা নিজেরা বইসা একটা সিদ্ধান্ত নিক, তারপর হগলরে জানাইয়া দিব।'

মজলিশ থেকে অনতি দূরে পাঁচ মোড়ল ও ইমাম সাহেব কিছুক্ষণ একান্তে আলোচনা শেষে ফিরে এসে যার যার চেয়ারে আসন নিলেন। রায় শোনার জন্য সকলে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল। মজলিশে একটা গুরু গম্ভীর ভাব সৃষ্টি হলো। মোড়ল সাহেবগণ মৌলভি সাহেবকে রায় শুনিয়ে দিতে বললে তিনি দাঁড়িয়ে ওয়াজ-নসীহতের ঢংগে অনেক কথা বললেন। সবশেষে বললেন, 'আমাদের শরীয়ত মত চলা উচিত। এইসব খারাপ কাজের শাস্তি আল্লাহপাক কুরআনে উল্লেখ করেছেন। শরীয়ত মত বিচার হলে আল্লাহ তায়ালা যেমন খুশি হবেন, আমরাও সুখে-শান্তিতে থাকবো। দুইপক্ষের কথা শুনে যা বুঝেছি– ফজলু একজন বেগানা যুবক, আর মেহেরজানও স্বামীহীন বেগানা নারী। তারা দু'জন রাতের আঁধারে সম্পূর্ণ একাকি একটা ঘরে অবস্থান করেছে। দিদাদের মত একজন বালেগ যুবক তাদেরকে খারাপ কাজে লিপ্ত অবস্থায় দেখেছে। এরপরও বহু লোক এসে বদ্ধ ঘরে স্বচক্ষে দেখেছে। তাছাড়া স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্যে জানা গেছে শুধু সেদিনই না, আরো একাধিক দিন তারা অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এসব থেকে প্রমাণিত হয় তারা ব্যভিচারে জড়িত। আল্লাহপাক পাপের যে শাস্তি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সে মতে আমরা দুই পাপাচারকে একশ করে দোররা মারার শাস্তি দিচ্ছি। তবে যেহেতু বর্তমানে দুইজনই অসুস্থ, সেহেতু এ রায় তারা সুস্থ হলে কার্যকর করা হবে। আর মেহেরজান, যেহেতু সে স্বামীহীন; সফির ফিরে আসার ক্ষীণ সম্ভাবনাও দেখছি না। তার ভাইয়েরা বার বার নিতে এসেছে, বিয়ে দিতে চেয়েছে কিন্তু সে যাচ্ছে না। এ গ্রামে থেকে আর কোন অপকর্ম সৃষ্টির সুযোগও আমরা দিতে পারি না। তাকে অবিলম্বে এখান থেকে চলে যেতে হবে– এটাই আমাদের সর্বসম্মত রায়। আপনারা সকলে মিলে এ রায় কার্যকর করবেন।' বলে ইমাম সাহেব বসে পড়লেন।

রায় শুনে পুরো মজলিশে পিনপতন নিরবতা নেমে এলো। শুধু জীতুদের ঘরের লোকদের মধ্যেই চঞ্চলতা দেখা গেল। সে সময়ে মজলিশের পূর্ব কোণ থেকে কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাইল। একজন রায়ে আপত্তি জানিয়ে কিছু বলতে থাকলো। টুনু মেম্বার দাঁড়িয়ে বলল, 'কেডা, এরফান নাকি। শুন ভাতিজা, তোমার কোন কথা থাকলে আগেই কইতা, এখন কওয়ার সুযোগ নাই। তাছাড়া কথা বলার বয়স এখনো তোমাগো হয়নি। ইমাম সাব রায় দিছেন, শরীয়তের রায়। শরীয়তের বিরুদ্ধে কথা কওয়া মহাপাপ। রাইত অনেক হইছে, আর দেরি করণ যায় না; আমরা তাইলে উঠি।' বলেই মেম্বার দাঁড়িয়ে গেলেন। তার সাথে সাথে আর সকলে উঠে দাঁড়ালো। যুবকদের সমালোচনার কণ্ঠ মানুষের হৈ-চৈ এর ভিতর তলিয়ে গেল।

১৯

শাকেরা বিলাপ করে কাঁদছে। মেহেরজানের অবস্থা ভাল নয়, দিন দিনই খারাপের দিকে যাচ্ছে। এখন সে রীতিমতো পাগলামী শুরু করেছে। মানুষ দেখলে ক্ষেপে গিয়ে মারতে চাচ্ছে। গতকাল শাকেরার গালে কষে চড় বসিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

ফজলুর বাবা কলিমউদ্দিন এ অবস্থা দেখে খলিল ডাক্তারকে ডাকলেন। ডাক্তার দেখে-শুনে ভাল বলেননি; অতি মানসিক চাপে ব্রেনে সমস্যা হয়েছে জানিয়েছেন। তিনি আপাতত ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঢাকায় বড় কোন মনোচিকিৎসককে দেখাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

শাকেরার কান্নায় মানুষের জটলা সৃষ্টি হয়েছে। শাকেরা দিদার, ফজলু ও মোড়লদের বিলাপের সুরে গালাগাল দিচ্ছে। তার ভাবীর সর্বনাসের জন্য তাদেরকে দায়ী করছে।

সে সময়ে কৌতূহলী মানুষের ভীড় ঠেলে বিষণ্ন মুখের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি মেলে প্রৌঢ় ও যুবক বয়সের দু'জন মানুষ ঘরে ঢুকলো। প্রৌঢ় মানুষটির রোদে পোড়া তামাটে রঙের পেটানো শরীরে তিলাই পড়া পুরনো সাদা পাঞ্জাবী আর বড় চেকের টাখনুর অনেকটা উপরে পরা সবুজ লুংগির সাথে রাবারের পামসু জুতা। দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে আসায় টাখনুর উপর পর্যন্ত সফেদ ধূলি রঞ্জিত হয়ে আছে। ভাংগা চোয়ালে কাঁচাপাকা দাড়ি আর কাঁচাপাকা চুলের এ মানুষটির সাথের যুবকটিরও লুংগির সাথে সবুজ রংগের ফুল শার্ট আর পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। ফর্সা, হ্যাংলা-পাতলা, লম্বাটে গড়নের। মুখাবয়বে দারিদ্র আর ক্ষেতে-খামারে খেটে খাওয়া মানুষের স্পষ্ট ছাপ।

এদেরকে কেউ কেউ চিনলেও অনেকে পারেনি। শাকেরা ছুটে এসে প্রৌঢ় মানুষটিকে জড়িয়ে ধরে আরো শব্দ করে কেঁদে উঠলো। লোকটি একটি হাত শাকেরার পিঠের উপর রেখে কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে রইল। যুবক ছেলেটিও বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে আছে।

শাকেরাকে ছেড়ে দিয়ে তারা একসময় মেহেরজানের ঘরে ঢুকলো। মেহেরজান পূর্ব দিকের বেড়াটার সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করছে। লোক দুটোকে দেখামাত্র সে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে শাকেরাকে ডাকতে লাগলো। এদের ঘর থেকে বের করে দিতে ক্রুদ্ধ ভংগিতে বলতে লাগলো। তারা বিস্মিত দৃষ্টি মেলে মেহেরজানের দিকে তাকিয়ে রইল। একসময় প্রৌঢ় মানুষটি দু'হাতে মুখ চেপে হু-হু করে কেঁদে উঠলো। যুবকটিও বিষণ্ন, কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

বয়স্ক লোকটি একসময় মুখের উপর চেপে রাখা হাত সরিয়ে কান্নাজড়িত গলায় বলল, 'কারা তোরে শেষ কইরা দিছে রে বইন? কারা আমার বইনেরে সব্বনাশ কইরা দিছে? একটু থেমে মেহেরজানের দিকে তাকিয়ে দরদ মাখা গলায় বলল, 'মেহের! মেহেরজান! আমি তোর বড় ভাই, কাদের ভাই– মিয়া ভাইরে চিনতে পারস নাই? এই যে তোর কুদরত ভাই, ছোট ভাই, কুদরতরেও চিনতে পারস না? – হায় হায়রে, কারা আমার এই বিবি হাজেরা, রহিমার লাহান বোইনটার নামে কলংক দিয়া শেষ কইরা দিছে! কারা আমার বোইনেরে পাগল বানাইয়া দিছে!'

কাদের মিয়া এবার চৌকির কিনারায় দু'পা তুলে দু'হাত মাথায় চেপে চিন্তিত ভংগিতে বসলো। কুদরত সেভাবেই কাঁদো কাঁদো মুখে বোনের দিকে তাকিয়ে রইলো। কাদের মিয়া টেনে টেনে বিলাপের ভংগিতে বলল, 'বোইনরে, কতবার তোরে নিতে আইছি, চইলা যাইতে কইছি– না, যাইবি না। এই গেরামের মানুষের মায়া তুই ছাড়তে পারস না। তাগোরে ভুলতে পারস না। আর আইজ এরা তোরে প্রতিদান দিছে, দোররা মারার শাস্তি দিছে; কলংক রটাইয়া পাগল বানাইয়া আমারে নিয়া যাইতে খবর পাডাইছে। এই শুয়রের দেশে অহনো তুই পইড়া রইছত। এই অমানুষের দেশে তোর মত মানুষের বাস কেমনে হয়রে বোইন, কেমনে হয়!'

www.pathagar.com

কাদের মিয়া ক্ষেদ মিশ্রিত গলায় কথাগুলো বলে গেল। ঘরের ভিতর ও বাইরে কৌতূহলী মানুষ দাঁড়িয়ে রইল। ক্ষিপ্ত মেহেরজান এতোক্ষণ পর শান্ত ভংগিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালো– যেন তাকে চেনার চেষ্টা করছে সে। কাদের মিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'মেহের! আমি তোর বড় ভাই, চিনতে পারছত? এই যে তোর ছোড ভাই কুদরত, তারে চিনছত? তোর ভাবী যাইতে কইছে, আমরা তোরে নিতে আইছি। বাড়ি যাইবি চল, যাইবি না?'

মেহেরজান কিছু বলছে না, ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে আছে। কিছু একটা যেন বলতে চাচ্ছে সে, কিন্তু পারছে না। দু'চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোটা অশ্রু তার গড়িয়ে পড়লো। তা দেখে কাদের মিয়া আবার হু-হু করে কেঁদে ফেললো। দু'হাতে মুখ চেপে বলল, 'আমি অহন কি করুমরে বোইন?–কই তোরে ডাক্তার দেহামু, কই এতো টাকা-কড়ি পামু। আমার কথা হুনস নাই। তাগো মায়া ভুলস নাই; আর আইজ তারা তোরে... ।'

কাদের মিয়া আবার দু'হাতে মুখ চেপে ডুকরে উঠলো। কুদরত ক্ষিপ্ত গলায় বলল, 'লও মিয়া ভাই, আর দেরি কইরো না। এই বাড়িতে পা রাখতে ইচ্ছা হয় না। তুমি তার সব কিছু গুছাইয়া লও। আমি বড় রাস্তায় গিয়া রিক্সা ঠিক কইরা আহি।'

কুদরত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাদের মিয়া শাকেরাকে ডেকে বিষণ্ন গলায় বলল, 'বেয়াইন, আর দেরি করণ যায় না। বেলা অনেক হইয়া গেছে। আপনের ভাবীর কাপড়-চোপড় কি আছে একটু গুছাইয়া দেন। অরে বাড়িত নিয়া থানা হাসপাতালে ডাক্তার দেহামু। অর কপালে কি আছে জানি না। একটু তাড়াতাড়ি করেন।'

কাদের মিয়ার কথা শুনে অচেনা জায়গায় বাবা-মাকে হারানো শিশুটি যেমন ভীত মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একসময় ফুলতে ফুলতে প্রচণ্ড শব্দে কেঁদে ওঠে– শাকেরাও ঠিক তেমনি কাদের মিয়ার দিকে সন্ত্রস্ত মুখে তাকিয়ে থেকে একসময় ফুলতে ফুলতে ডুকরে উঠলো। তারপর অথৈ সমুদ্রে পড়ে যাওয়া শিশু সন্তানকে বাঁচাবার আকুতিতে পাগল প্রায় মায়ের ছুটোছুটির মত ক্রন্দনরত শাকেরা এদিক-ওদিক ছুটতে লাগলো। একসময় ছুটে গিয়ে মেহেরজানকে জড়িয়ে ধরে বুকফাটা আর্তনাদে ফেটে পড়লো। মেহেরজান যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। আতংকিত দৃষ্টি মেলে শাকেরার কি হয়েছে সে জানতে চাচ্ছে। ফ্যাল ফ্যাল চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কাদের মিয়া মেহেরজানের এটা-সেটা গুছাতে লাগলো।

মেহেরজানকে নিয়ে যাচ্ছে, এ সংবাদ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ দলে দলে ছুটে আসছে। মহিলারা দল বেঁধে ভারাক্রান্ত মুখে তাকে নিয়ে আলোচনা করছে। অনেকে সরব কণ্ঠে তার নির্দোষিতা ও ষড়যন্ত্রের কথা বলছে।

কুদরত ফিরে এসে ভাইকে তাড়া দিল। সবকিছু দ্রুত গুছানো হলো। কে একজন মেহেরজানের মাথা আঁচড়ে দিচ্ছে। মেহেরজান বিস্মিত মুখে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে– যেন কি হচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করছে। চৌকির উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা শাকেরার ডুকরানির শব্দ ভেসে আসছে।

কুদরত মেহেরজানের ঘরে ঢুকে বোনের বাহুতে হাত রাখলো। তাকে বেরিয়ে আসতে তাড়া দিল। মেহেরজান ক্রুদ্ধ ভংগিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাত সরিয়ে দিল। কুদরত বুঝলো কাজটা মোটেই সহজ হবে না; কিন্তু যে করেই হোক নিতে হবে। এখানে আর না।

www.pathagar.com

কুদরত আবারো বোনের বাহুতে হাত রাখলো। কাদের মিয়া ভিতরের ঘর থেকে মেহেরজানের ঘরে ঢুকলো। বোনকে নরম গলায় বলল, 'লও মেহের, লও। আর দেরি কইরো না। রাইত হইয়া যাইব।'

মেহেরজান আবারো কুদরতের হাতকে ছুঁড়ে ফেললো। ঘরের মাঝের বাঁশের খুঁটিটা শক্ত হাতে ধরে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার দু'চোখ টলটল করছে। হৃদয়টা চুরমার করে কেউ যেন ভেংগে দিচ্ছে। সে ঝাপসা চোখের সন্ত্রস্ত দৃষ্টি মেলে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে।

কাদের মিয়া এগিয়ে গিয়ে মেহেরজানের বাম বাহুতে হাত রেখে বাকরুদ্ধ গলায় বলল, 'আয় বোইন, আয়। আর দেরি করিস না। এগো লাইগা চোখের পানি ফেলিস না। আরো ফেললে তোরে দোররা মাইরা বাইর কইরা দিব; আমাগো শুদ্ধা দিব। তোর মূল্য বুঝার ক্ষমতা...।'

বাকরুদ্ধ কাদের মিয়া আর বলতে পারলেন না। হাতের পিঠে দু'চোখ মুছলেন। কুদরতেরও চোখ ঝাপসা হলো। তাদের ঘিরে দাঁড়ানো মানুষগুলো লজ্জিত মুখে নিচু মাথায় দাঁড়িয়ে রইল।

কুদরত ভারাক্রান্ত মুখে ভাইকে তাড়া দিল। কাদের মিয়ার হাতের বাঁধন মেহেরজানের হাতে শক্ত হলো। দু'ভাই সামনে এগুতে চাইলো; কিন্তু না, মেহেরজান শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো। আতংকিত উদভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে ছুটোছুটি করতে লাগলো। মেহেরজানের আহাজারিতে ঘিরে দাঁড়ানো মানুষগুলো চোখ মুছছে। কিশোরী মেয়েগুলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। শাকেরার ঘর থেকে ফজলুর মায়ের বুকফাটা কান্না ভেসে আসছে। শাকেরা উপুড় হয়ে ডুকরাচ্ছে।

যথেষ্ট বল প্রয়োগ করেও মেহেরজানকে ঘর বের করতে না পেরে কাদের মিয়া যেন হাল ছাড়লো। কুদরত ভাইয়ের দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকালো। একসময় চোয়াল আরো শক্ত করে ভাইকে ইংগিত করতেই কাদের মিয়ার চোয়ালও শক্ত হলো।

ভাইদের আচরণে মেহেরজান বুক ফাটিয়ে কাঁদছে। তাকে ওরা ঘর বের করেছে। পুলিশের আসামী পাকড়াওয়ের মত দু'বাহুমূলে শক্ত হাতে ধরে সম্মুখে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মেহেরজান তবুও ছুটতে চেষ্টা করছে। তাকে ওরা মেরে ফেলবে কেঁদে কেঁদে বলছে, সফিকে খবর দিতে শাকেরাকে বিলাপ করে ডাকছে।

ডুকরে ক্রন্দনরত নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়েদের একটা বড়সড় দল রাস্তা ধরে মেহেরজানের পিছু পিছু এগুচ্ছে। আশপাশের বাড়ি থেকেও মানুষ রাস্তার দিকে ছুটে আসছে। সম্মিলিত ক্রন্দনরোলে পুরো গ্রামটাই যেন কাঁদছে। বাতাসে বেদনার হাওয়া বইছে। গাছ, তরুলতারা থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। উদ্বিগ্ন পাখিরা মধুর গান ভুলে গিয়ে ডালে ডালে ছুটোছুটি করছে। রাস্তার পাশে বাঁধা পশুগুলো খাবার বন্ধ রেখে বেদনাময় দৃষ্টি মেলে শোকাহত মানুষের মিছিলের দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু মানুষ নামের কতিপয় পশু পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন দেখে স্বউল্লাশে মেতে আছে।

www.pathagar.com

২০

ফজর নামায শেষে আজাদ আবার ঘুমাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু টেনশনে ঘুম হচ্ছে না। আগামীকাল থেকে গ্রীষ্মের বন্ধ শুরু হবে; আজই বাড়ি যাবে কিনা ভাবছে সে।

হলের বারান্দায় কারা যেন হৈ-চৈ করছে। বুট পলিশওয়ালার ডাকাডাকি কানে ভেসে আসছে। রুমমেট শিমুলের নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আজাদ আড়মোড়া ভেংগে আবার পাশ ফিরলো। আজই ক্লাস শেষ করে বাড়ির পথ ধরবে বলে ভাবছে সে।

হকার আজকের দৈনিকটা দরজার নিচ দিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে, যা মসৃন ফ্লোর গড়িয়ে অনেকটা কাছাকাছি চলে এসেছে। আজাদ শোয়া থেকেই ধনুকের মত বাঁকিয়ে তা হাতে নিয়ে চোখ বুলাতে লাগলো।

প্রথম পাতার নিচের অংশে দু'কলাম ব্যাপী 'ফতোয়াবাজদের দোররার শিকার আরেক মেহেরজান' হেডলাইনে তার চোখ স্থির হলো। অহরহ এসব খবর পড়তে অভ্যস্ত আজাদ তাতে চোখ বুলাতে লাগলো। নূরজাহান, মেহেরজান, হাসিনা, সখিনা, জরিনাদের জীবনে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটছে; গ্রামীণ জীবনে এর মাত্রা বেড়ে গেছে। ইদানিং ঘটনাগুলো পত্রিকার পাতায় বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে।

আজাদ যতই খবরের ভিতরে এগুচ্ছে ততই তার উদ্বেগ বাড়ছে, দৃষ্টি বিস্ফারিত হচ্ছে, শরীর কাঁপছে। একসময় চরম বিস্ময়ে সে বিছানায় উঠে বসলো। তার হাতে ধরা পত্রিকাটা থরথর করে কাঁপছে। উদ্বেগাকুল হয়ে সে পড়তে চেষ্টা করছে। একি কাণ্ড! জেলা, থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম সব মিলে যাচ্ছে। টুনু মেম্বার, ইউনুস মৌলভি, মেহেরজান, ফজলু, পাঁচমোড়ল...। তাহলে কি মেহেরজান ভাবী! আমাদের সফির বৌ! তাকে দোররা মেরে বের করে দিয়েছে! ফজলুর সাথে সে...! এও কি সম্ভব!'

প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত, বিস্ময়ে বিমূঢ় আজাদ সহস্র প্রশ্নের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। পত্রিকা হাতে শূন্য দৃষ্টি মেলে সে বসে আছে। ইউনুস চাচা কি করে এমন রায় দিতে পারলো আজাদ বুঝতে পারছে না। পাঁচ মোড়লের নাম দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি কোন...!'

আজাদ ভেবে কুল পাচ্ছে না। বিস্ময়ের ঘোর তার কাটছে না। ক্লাসের সময় হয়ে এলো। শিমুল প্রস্তুতি নিয়ে চলে যাচ্ছে। শিমুলের তাড়ায় একসময় সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

২১

জীতু বাড়ির সাথে লাগোয়া ধানের জমিতে কাজ করছে। টুনু মেম্বার সেখানে গিয়ে কথা জুড়ে দিয়েছে। দু'জনে জমির আলে খোশ মেজাজে গল্প করছে। জীতু এক পর্যায়ে নেতিবাচক ভংগিতে শাকেরার প্রসংগটি তুললো। মেম্বার মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলল, 'না, বিয়াটা হওন লাগবো। তা না হইলে প্রশ্ন উঠবো। আইনের প্যাঁচে আঁটকাইয়া যাইবা। বিয়া হইলে জামাই শ্বশুরের সম্পদ দেখছে, একমাত্র মাইয়ার ঘরে থাকছে– কোন কথা উঠবো না।

জীতু মেম্বারের কথায় মাথা নাড়লো। পূবের আল ধরে হালীম মির্জা এগিয়ে আসছে। দু'জনের দৃষ্টি সেদিকে ফিরলো।

www.pathagar.com

হালীম মির্জা কাছে এসে শংকিত গলায় বলল, 'হুনছনি কিছু; চার-পাঁচদিন আগে কোন পত্রিকায় নাকি আমাগো বিচারের কথা উঠছে। মেহেরজানরে দোররা মাইরা বাইর কইরা দিছি– সেই কথা লেখছে।'

মেম্বার না সূচক মাথা নাড়লো। জীতু বলল, 'কই হুনছ? কে কইছে?'

হালীম মির্জা বলল, 'গতকাইল আড়ং-এ কয়েকজন মিলা বলাবলি করতাছে। কোন্ এন-জি-ও অফিসে নাকি সেই পত্রিকা আছে। তারা ওহানে পড়ছে।'

মেম্বার হাসিমুখে বলল, 'তাইলে তো ভালাই হইলো। সারা দেশে আমাগো নাম ছড়াইয়া পড়লো।'

মেম্বারের কথায় জীতু ও হালীম মির্জা ম্লান হাসলো। হালীম মির্জা বলল, 'পরের দিনের পেপারে নাকি বুদ্ধিজীবি, মহিলা নেত্রীগো বিবৃতি উঠছে। তারা আমাগো কঠোর বিচার দাবি করছে।'

হালীম মির্জার কথা শুনে জীতুর মুখ অন্ধকার হলো। মেম্বার তাচ্ছিল্যের ভংগিতে বলল, 'আশুক না বিচার করতে, কারা আমাগো বিচার করে দেহি। তাছাড়া মিছা কথা লেখলো ক্যান্? আমরা তো রায় দিছি মাত্র। দোররা মারিনি, মেহেরজানরে তাড়াইয়াও দেইনি, তার ভাইরা আইসা নিয়া গেছে। পেপার পড়লে বুঝা যাইতো আসলে কি লেখছে।'

জীতু হাজীবাড়ির দিকে আংগুল নির্দেশ করে বলল, 'আজাদরে দেখা যাইতাছে। আজাদ ঢাকা থাইকা আইছে। সে হয়তো কইতে পারবো কি লেখছে।'

জীতুর কথায় মেম্বার ও মির্জার মুখে নেতিবাচক অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো। মেম্বার বলল, 'বাদ দাও এইসব। কারা বিচার করতে আসে আসুক। তারপর দেখুম কি করা যায়।'

মেম্বারের কথার পর তারা একসময় নিজ নিজ বাড়ির দিকে এগুতে লাগলো।

আজাদকে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মৌলভি সাহেব সেদিকে এগিয়ে গেলেন। আজাদের কাছাকাছি গিয়ে বললেন, 'তোমারে খুঁজছিলাম, শুনলাম আড়ং-এ গেছ। একটু কথার দরকার ছিল।'

আজাদ লোকটার দিকে অন্ধকার মুখে তাকালো। তাকে দেখামাত্র মেজাজ বিগড়ে গেলেও সে নিজেকে সামলালো। এই প্রথম মানুষটার প্রতি তার ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা জন্মেছে। আগে সহজ-সরল ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। আজাদ শীতল গলায় বলল, 'ভিতরে আসুন।'

ভিতরে ঢুকে বসার ঘরে দু'জন মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসলো। মৌলভি সাহেব উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'তুমি তো ঢাকা থেকে এসেছ। কয়েকদিন আগে কোন্ পত্রিকা আমার নামে নাকি কিসব লিখেছে, দেখছো নাকি কিছু?'

আজাদ তীক্ষ্ণ চোখে ইউনুস সাহেবের দিকে তাকিয়ে আছে। তার ইচ্ছা ছিল এসব নিয়ে গাঁয়ে কোন কথাই বলবে না; বলে আর কি হবে, যা হবার তো হয়েই গেছে– সর্বনাশের ষোল কলা পূর্ণ হয়েছে। এখন কথা বলা অর্থহীন। অর্থহীন কথা তার পছন্দ নয়, কিন্তু ভদ্রলোক তাকে বিপদে ফেলেছে। সে নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যথিত গলায় বলল, 'আপনার সাথে কথা বলতে ঘৃণা হচ্ছে চাচা! প্রচণ্ড ঘৃণা হচ্ছে!'

www.pathagar.com

কথাটা বলে আজাদ উঠে গিয়ে তার সাইড ব্যাগের পকেট থেকে পত্রিকার কপি দুটো আনলো, তারপর ইউনুস সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পড়ে দেখুন কি লিখেছে।'

ইমাম সাহেব বিব্রত মুখে তা হাতে নিয়ে কাংখিত রিপোর্টটি পেয়ে পড়তে শুরু করলো। আজাদ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল। মৌলভি সাহেব একসময় মুখ তুলে উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, 'একি সর্বনাশের কথা। আমরা তো রায় দিয়েছি মাত্র, দোররাও মারিনি আর বের করেও দেইনি। এমন মিথ্যা ওরা কি করে লিখলো?'

আজাদ গম্ভীর মুখে তাকালো। তারপর রাগত স্বরে বলল, 'আপনারা যে প্রয়োজনে নির্দোষ মানুষকে অপবাদ দিয়ে পাগল বানিয়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন, তারাও তাদের প্রয়োজনে যেভাবে রিপোর্ট করলে উদ্দেশ্য সফল হয় সেভাবেই করেছে; এতে অবাক হওয়ার কি আছে!'

আজাদের কথায় ইউনুস সাহেব চিন্তিত মুখে মাথা নিচু করলেন। একসময় মুখ তুলে বললেন, 'আমরা তো শরীয়তের রায় দিয়েছি। কুরআনে এইসব কুকর্মের যে শাস্তির কথা উল্লেখ আছে, তাই দিয়েছি; এতে আমাদের দোষ কোথায়?'

আজাদ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তীর্যক গলায় বলল, 'আপনাকে এ রায় দেয়ার ভার কে দিয়েছে চাচা?–কুরআন দিয়েছে, না রাষ্ট্র দিয়েছে? কুরআন তো এ অধিকার দিয়েছে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার বিভাগকে। আপনাকে, আমাকে বা গাঁয়ের কোন মোড়লকে দেয়নি। আর রাষ্ট্র দিয়েছে?– আমাদের রাষ্ট্র তো শরীয়তের বা কুরআনের আইনে চলছে না, চলছে মানুষের তৈরি, ব্রিটিশদের তৈরি আইনে। সেখানে তো এ রকম কোন শাস্তির কথা উল্লেখ নেই, তাহলে...।'

ইউনুস সাহেব চুপ করে বসে রইলেন। আজাদ আবার বলল, 'আপনি কি করে বিশ্বাস করতে পারলেন মেহেরজান ভাবী আর ফজলুর মত ছেলে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়েছে? আপনাদের অপবাদের যাতনায় স্বামী শোকে মুহ্যমান মেয়েটা আজ পাগল। ফজলু আজও ঘর বের হয়ে মানুষকে মুখ দেখায়নি। এখনো সে সুস্থ্য হয়নি– গতকাল দেখে এসেছি। আর আপনারা কিনা...।'

আজাদ কথা অসমাপ্ত রেখে বিস্মিত মুখে তাকিয়ে রইল। ইউনুস সাহেব বিব্রত মুখে মাথা নিচু করলো। আজাদ একসময় আবার বলল, 'আরো শুনলাম আপনি কিছুদিন আগে একাব্বরের তালাক দেয়া বৌকে রশীদের সাথে হিল্যা করিয়ে আবার একাব্বরের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। আমি তো আইনের ছাত্র, মুসলিম 'ল' আমাদের পড়তে হয়। পবিত্র বিধানের এমন অপব্যাখ্যা, অপকৃষ্টি তো সেখানে উল্লেখ নেই। যেখানে নবীজীর স্পষ্ট হাদীসে হালালাকারীকে বা হিল্যার বরকে ধার করা ষাঁড় বলা হয়েছে। যারা এসব করে, করায় তাদের উপর আল্লার লা'নত ও তারা অভিশপ্ত বলে উল্লেখ রয়েছে, সেখানে আপনি মসজিদের ইমাম হয়ে কি করে এমন খোদাদ্রোহী কাজে হাত দিতে পারলেন?'

আজাদের কথা শুনে ইউনুস সাহেব তার দিকে তাকালো। আজাদ আবার বলল, 'আপনি কি এখনো তাদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারেননি? জীতুরা যে সফির ঘরবাড়ি দখলে নিতে চায়, টুনু মেম্বার চায় সফির রাস্তার পাশের জমি; মেহেরজান থাকলে উদ্দেশ্য সফল হয় না। সে কারণে অপবাদ রটিয়ে আপনাকে, ধর্মকে ঢাল বানিয়ে মেয়েটাকে বের করেছে। ফজলু, ফজলুর বাবা কাজে বাধা হওয়ায় তাদেরকেও জব্দ করেছে।'

www.pathagar.com

কথাগুলো বলে আজাদ থামলো। মৌলভি সাহেব নিচু মাথায় চিন্তিত মুখে বসে রইলেন। একসময় বিমর্ষ মুখে বললেন, 'আমি সহজ-সরল মানুষ, এতো প্যাঁচঘাট বুঝতে পারিনি কিন্তু গতকাল জীতু আর মেম্বার দিদারের সাথে শাকেরার বিয়ের কথা বলায়; তাদের গোপন কিছু কথা কানে আসায় ব্যাপারটা আমার কাছেও ঘোলাটে মনে হচ্ছিল। এখন তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি আসলে পুরো ব্যাপারটাই একটি সাজানো ঘটনা। মাঝখানে মেয়েটা, ফজলুটা– তাদের এত বড় সর্বনাশে আমাকেও তারা জড়িয়ে ফেলেছে। আমার নামে আজ এসব লেখা হচ্ছে; ফতোয়াবাজ বলে শাস্তির দাবি তুলছে। জীবনে কোনদিন আমি... ।'

বাকরুদ্ধ ইমাম সাহেবের চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আজাদ ব্যথিত মুখে সেদিক তাকিয়ে রইল। ইমাম সাহেব একসময় ভীত গলায় বললেন, 'এখন কি হবে আজাদ! এসব লেখালেখির কারণে যদি... ।'

ইউনুস সাহেবের কথা শুনে আজাদ মাথা নিচু করলো। চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর মুখ তুলে বলল, 'তেমন কিছু হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। দু'পক্ষের উদ্দেশ্যই আপনি সফল করে দিয়েছেন। গ্রামের টাউটরা আপনাকে ব্যবহার করে তাদের উদ্দেশ্য যেমন সফল করেছে, ঐ মহলটিও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো ও ফতোয়াবাজ বলে গালি দেওয়ার মওকা পেয়েছে। সুতরাং যতই গালি দিক, বিচার দাবি করুক, ওরা আপনার উপর খুব নাখোশ বলে তো মনে করছি না। তাছাড়া বাড়াবাড়ি করলে নিজেদের মিথ্যার ঝুলিও বেরিয়ে পড়ার ভয় রয়েছে, সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আজাদের খোঁচা বুঝতে পেরে ইমাম সাহেব মাথা তুলে বলল, 'ঠিকই বলেছ আজাদ, ঠিকই বলেছ। আজ বুঝতে পারছি কত বড় সর্বনাশ মানুষগুলোর করেছি, ধর্মের করেছি। মেহেরজান মেয়েটারে আমিও বড় ভাল জানতাম, কিন্তু কি যে হলো, ওদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারিনি। ভাবছি এ সবের শাস্তি হওয়া দরকার, শাস্তি না হলে গ্রাম-সমাজ শুদ্ধ থাকবে না, অনাচারে ভরে যাবে। কিন্তু... ।'

কথাগুলো বলে ইমাম সাহেব কাঁধে জড়ানো লাল ডুরে রুমালটা দিয়ে দু'চোখ মুছলেন। আজাদ সেদিকে তাকিয়ে ব্যথিত গলায় বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে এ বিচারের ভার ইসলামী রাষ্ট্রের। ইসলামী রাষ্ট্রের অবর্তমানে তা করতে চাইলেও করতে হবে যথাযথ দায়িত্বশীলতার সাথে। পাপাচারকে উৎসাহিত করে এমন সব উপকরণের মূলোৎপাটন ও বিবাহ ব্যবস্থাকে সহজ করার পরও যদি কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, চারজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই শুধু রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা তা কার্যকর করার অধিকার রাখে; কিন্তু আমরা তো সে ব্যাপারে সচেতন নই। পূর্ণাংগ ইসলাম বাস্তবায়নের কোন প্রচেষ্টাও আমাদের নেই। না জেনে না বুঝে এক শ্রেণীর ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে চলছেন, এতে ইসলামেরই ক্ষতি হচ্ছে বেশি। স্বার্থান্বেষী মহল এ অজ্ঞতার সুযোগে স্বার্থ উদ্ধার ও অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ইসলাম ও আলেম সমাজকেই ব্যবহার করছেন। যতদিন সচেতনতা না আসবে ততদিন তারা করেই যাবে।'

কথাগুলো বলে আজাদ থামলো। ইমাম সাহেব ভারাক্রান্ত মুখে মাথা নাড়লেন। আজাদ একসময় দাঁড়িয়ে বলল, 'চাচা, আমাকে জরুরি কাজে আবার আড়ং-এ যেতে হবে। আপনি বসুন, আমি আসি।'

আজাদ ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেল। মৌলভি ইউনুস সাহেব চিন্তিত মুখে সেভাবেই বসে রইলেন।

www.pathagar.com

২২

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। কত দ্রুত জীবন থেকে সময় বয়ে যায় টের পাওয়া যায় না। বলতে বলতে একটি যুগ অতিবাহিত হলো। এরই মাঝে কত পরিবর্তন। আজাদের বড় চাকুরী, শহরে বিয়ে ও আট বছরের ছেলে সন্তানের জনক সে। দিদার শাকেরার বিয়ে হলো। দিদার পরে আরো একটি বিয়ে করলো। তারপর জীবন যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ শাকেরার অস্বাভাবিক আচরণ শুরু হলো। তার ওপর জ্বীনের আছর হয়েছে বলে গাঁয়ের সকলে জানলো। একদিন ধোপাদের বিশাল দিঘিতে শাকেরার লাশ পাওয়া গেল। তাকে জ্বীনে ডুবিয়ে মেরেছে বলে অনেকেই নিশ্চিত হলো।

সরকারি বড় কর্মকর্তা আজাদ নতুন বৌ নিয়ে দু'একবার এলেও এবার গাঁয়েই বৌ-ছেলে নিয়ে কুরবানির ঈদ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। সে মোতাবেক ঈদের দিন তিনেক পূর্বেই তাদের থানা সদরে এসে নামলো। এখন আর আগের মত ঝক্কি-ঝামেলা নেই। সদর থানা থেকে তাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তাটিতে এখন অহরহ ছোট-খাট যানবাহন চলাচল করছে।

স্যুট-কোট পরা আজাদ ছেলের হাত ধরে বাজারের ভিতরের একটি গলি পথে গ্রামমুখি রাস্তাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বৌ তার পিছু পিছু আসছে। মুটে জিনিস-পত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ টোকাই গোছের কিছু ছেলেমেয়ের চিৎকার আর আতংকিত ছুটোছুটি দেখে আজাদ থমকে দাঁড়ালো। কিছু ভেবে উঠার আগেই লক্ষ্য করলো উশকো-খুশকো চুল, ছেঁড়া-ময়লা শাড়ি, বীভৎস চেহারার এক পাগলিনী ইটের টুকরো হাতে ক্রুদ্ধ মূর্তিতে তাদের দিকে তেড়ে আসছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় আজাদ পাগলীর ভয়ংকর মূর্তি দেখে ভয়ে ছেলেকে নিয়ে পিছু হঠতে গিয়েও একসময় থমকে দাঁড়ালো। উদ্ধত ইট হাতে পাগলী ক্রুদ্ধ ভংগিতে তার মুখোমুখি চলে এলো। আজাদের স্ত্রী এই সমূহ বিপদেও স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আতংকিত হয়ে ছুটে এলো। ছেলেটাকে টেনে নিয়ে অদূরে একটি ইলেকট্রিক থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে কাঁপছে। মানুষ শূন্য রাস্তায় আজাদ আর পাগলিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আজাদের স্তব্ধ, বিস্ফারিত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পাগলী যেন হতোদ্যম হলো। তার উদ্যত হাত একসময় অবনমিত হতে দেখে কেউ কেউ সাহস করে এগিয়ে এলো। কে একজন পিছন থেকে বলল, 'মেহের পাগলী এমনিতে ভাল; ছেলেমেয়েরা ক্ষেপালেই ক্ষেপে যায়, নয়তো খুব শান্ত। অনঢ়, স্তব্ধ, ব্যথিত দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকা আজাদের দু'চোখ বেয়ে টপটপ করে পানি গড়িয়ে পড়ছে। পাগলীর উদ্যত হাত নত হতে দেখে সে মনে মনে বলল, 'মারো ভাবী মারো, আমার কপালেই মারো। বর্বরদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনি, পাশে দাঁড়াতে পারিনি– এতেই প্রায়শ্চিত্য হবে না ভাবী, আরো কিছু মারো।'

এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে কিছু মানুষ ভীড় করে দাঁড়ালো। তার স্ত্রী ও ছেলে এগিয়ে এসে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পাগলী মানুষের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, 'দেখছনি কাণ্ড, আমি কি সাহেবরে মারতে চাইছি? সাহেব কেমন ভয় পাইছে। আবার কাঁদতাছেও। পোলাপাইনে আমারে ঢিলায়, আমিও তাগরে ঢিলামু।' বলে মেহেরজান পাগলী ইট হাতে পাশের চিপা গলিটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। আজাদ সেভাবেই টলটল

www.pathagar.com

চোখের ঝাপসা দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে রইল। একসময় মানুষের বিস্মিত দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সে ব্যথিত পদক্ষেপে সামনে এগুতে লাগলো। স্ত্রী ও ছেলে হতবিহ্বল হয়ে তাকে অনুসরণ করলো।

রিক্সায় উঠেও আজাদ হাতের রুমালে চোখ মুছছে। স্ত্রী নাদিয়া ও ছেলে নাফিজের কৌতূহলী প্রশ্নের মুখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। মুখে তার কোন কথা ফুটছে না। তাদের কি বলবে বুঝতে পারছে না। আত্মগ্লানিতে দগ্ধ আজাদ রুমালে আবার চোখ মুছলো। পাশে বসা নাদিয়া আড়চোখে তা খেয়াল করলো। বার বার প্রশ্ন করেও উত্তর পেতে ব্যর্থ নাফিজ একসময় মরিয়া হয়ে বলল, 'বল না আব্বু! ইস্ পাগলীটা যদি ইট মেরে দিত! তুমি কি ওকে চেন আব্বু?'

আজাদ গম্ভীর মুখে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো। ছেলেটা আবার ব্যাকুল হয়ে বলল, 'কে এই পাগলী আব্বু– বল না প্লিজ!'

আজাদ ধরা গলায় বলল, 'সে এক ট্রাজেডি বাবা! সে এক করুণ, মর্মান্তিক, নির্মম আত্মগ্লানির উপাখ্যান। মনটা আজ ভাল নেই। তোমাদের এ মুহূর্তে কিছুই বলতে পারবো না। তবে কথা দিচ্ছি পরে বলবো। তোমার পিতৃভূমির মানুষদের নৃশংসতায় অজপাড়াগাঁয়ের এক অসাধারণ গৃহ বধূর আজকের নির্মম পরিণতির কথা তোমাদের অবশ্যই বলবো।'

কথাগুলো বলে আজাদ থামলো। নাদিয়া ও কোলে বসা নাফিজ তার ব্যথিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে রিক্সা গ্রামের সীমানায় চলে এসেছে। দূর থেকে মাগরিবের আযানের শব্দ ভেসে আসছে। রাস্তার পাশে টুনু মেম্বারের সেমিপাকা বাড়ি ও বাগান দেখা যাচ্ছে। আজাদ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আবার দৃষ্টি ফিরালো। গাঁয়ের ভিতরের ছোট রাস্তা ধরে রিক্সা এগিয়ে চললো। নাফিজ অতৃপ্তমুখে বাবার বেদনাহত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

২৩

নাদিয়ার বিস্ময় কিছুতেই কাটছে না। সে ঘুম ভাঙা ঢুলো ঢুলো চোখে বাইরে তাকিয়ে আছে। আজাদ এই রাতে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে। চিন্তিত মুখে গাছের সাথে হেলান দিয়ে আছে সে। উজ্জ্বল জ্যোস্নায় তার সর্বাংগ দেখা যাচ্ছে। এক রাশ বিষণ্নতা যেন মুখাবয়ব থেকে খশে খশে পড়ছে। নাদিয়া সেভাবেই তাকিয়ে রইল। বিস্ময় মাখা প্রশ্নে ভরা সে দৃষ্টি। মানুষটাকে এতোটা বিমর্ষ হতে ইতিপূর্বে সে কখনো দেখেনি। বাড়ি এসে কারো সাথে তেমন একটা কথাও বলেনি। বিছানায় শুতে গিয়ে দীর্ঘ সময় এপাশ-ওপাশ করেছে।

নাদিয়া কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে সে বলতে পারবে না। দীর্ঘ জার্নির কারণে ঘুমে বেহাল হয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু একসময় ঘুম ভেঙে আজাদকে বিছানায় না দেখে বাথরুমে গিয়েছে ভাবলো। দীর্ঘ অপেক্ষার পরও আজাদ আসছে না দেখে সে চিন্তিত মুখে বিছানা ছাড়লো। তারপর অন্ধকার হাতড়ে দরজার কাছে এসে খোলা জানালায় চোখ পড়তেই তাকে বাইরে দাঁড়ানো দেখলো সে।

নাদিয়া তখনো তাকিয়ে আছে। বিস্ময়ের ঘোর তার কাটছে না। রাত কতটা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। মাঝরাত নিশ্চয় পেরিয়ে গেছে। আঁধারে ঘড়ি দেখাও সম্ভব হচ্ছে না।

নাদিয়া একসময় দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা বন্ধ হলেও খিড়কি খোলা। সে আস্তে করে বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর আজাদের দিকে পায়ে পায়ে এগুতে লাগলো।

www.pathagar.com

পুকুর পাড়ে গাছের উপর কি একটা নিশি পাখি পাখা ঝাপটাচ্ছে। দূরে কোথাও একটা ডাহুক একটানা ডেকে যাচ্ছে। পাশের বাড়ি থেকে কুকুরের ছুটোছুটি আর ঘেউ ঘেউ শব্দ কানে ভেসে আসছে। নাদিয়ার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। সে ততক্ষণে আজাদের কাছাকাছি চলে এসেছে।

আজাদ সেভাবেই বিষণ্ন মুখে দাঁড়িয়ে। স্ত্রীর আগমন এতক্ষণ টের না পেলেও এবার পেয়েছে। নাদিয়া পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আজাদের হাতে হাত রাখলো। তারপর উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, 'এত রাতে বাইরে কেন, কখন এসেছো এখানে?'

আজাদ ঘাড় ঘুরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালো। বিমর্ষ মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সম্মুখে দৃষ্টি ফিরালো। তারপর ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। নাদিয়া আবার হাতে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'শোবে এসো। চল, ঘরে চল। এত রাতে বাইরে থাকা ঠিক নয়। এসো।'

আজাদ আবার ক্লান্ত মুখে উৎকণ্ঠিত নাদিয়ার দিকে তাকালো। জ্যোস্নালোকে তার ফর্সা মুখাবয়বে ভাবনার বলিরেখা যেন লেপ্টে আছে। আজাদ সেদিকে তাকিয়ে বেদনাহত গলায় বলল, 'ঘুম আসছে না নীতু (নাদিয়ার ডাক নাম)। আমি কিছুতেই চোখের পাতা এক করতে পারছি না। দৃশ্যটা আমাকে আপসেট করে ফেলেছে। অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা প্রতি মুহূর্ত আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এক অসাধারণ ভদ্র মহিলার এই পরিণতি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। নিজেকেও এ দায় থেকে মুক্ত ভাবতে পারছি না। ঐ ক্রিমিনালগুলোকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে যে আমার শান্তি নেই নীতু! কিন্তু কি করে তা সম্ভব ভেবে পাচ্ছি না।'

আজাদ কথাগুলো বলে থামলো। নাদিয়া চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লো। তারপর ব্যথিত গলায় বলল, 'নাফিজের দাদুর কাছে রাতে সব শুনেছি। একটা ভাল মানুষকে অপবাদ রটিয়ে ওরা তার সর্বনাশ করেছে– বাড়ি-ঘর, জায়গা-জমি দখল করে নিয়েছে। অবশ্যই এদের বিচার হওয়া, শাস্তি হওয়া দরকার; কিন্তু...।'

নাদিয়াও ভেবে পাচ্ছে না কি করে তা সম্ভব। সে শূন্য দৃষ্টি মেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আজাদ নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বলল, 'নীতু, আমি ভাবছি মেহেরজান ভাবীর চিকিৎসার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করবো। এবার যে করেই হোক আমাদের সাথে উনাকে ঢাকায় নিয়ে যাবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হলে আল্লাহপাক তাকে সুস্থ্য করে দিতে পারেন। আমি উনার প্রতি এ দায়িত্বটুকু পালন করতে চাই নীতু!'

আজাদ কথাগুলো বলে থামলো। নাদিয়া দীপ্ত গলায় বলল, 'অবশ্যই করবে। অবশ্যই আমাদের তা করা উচিত। আমিও তোমাকে সে কথাই বলতে চেয়েছিলাম। ভাল কোন মনোচিকিৎসকের পরামর্শমত এগুলে, উপযুক্ত চিকিৎসা হলে আমারো মনে হচ্ছে উনি ভাল হয়ে উঠতে পারেন। আমরা অবশ্যই উনাকে সাথে করে নিয়ে যাবো। এসো ঘুমাবে। না ঘুমিয়ে স্বাস্থ্য খারাপ করা ঠিক হবে না। তোমাকে সুস্থ মাথায় এগুতে হবে। তাহলে ওদের বিচারেরও একটা পথ হয়তো খুঁজে পেয়ে যাবে।'

নাদিয়ার কথায় আজাদের হাতের বাঁধন তার হাতে আরো শক্ত হলো। সে তাড়া দিয়ে বলল, 'চল শোবে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জলদি এসো।'

স্ত্রীর তাড়ায় আজাদ ধীর লয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর নাদিয়ার ঘাড়ের উপর একখানা হাত রেখে ঘরের দিকে এগুতে লাগলো।

www.pathagar.com

গাঁয়ের মানুষদের কারো ভাষায় ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ জজসাব এসেছেন– এ সংবাদ পেয়ে সকাল থেকেই লোকজন আজাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসতে লাগলো। কেউ কেউ কিছু সাহায্য বা ঈদ বখশিস পাবার আশায়ও ঘুর ঘুর করছে। আজাদ এ পর্যন্ত অনেকের সাথেই কুশল বিনিময় করেছে। তার মা সাহায্য প্রার্থীদের এটাসেটা দিয়ে বিদায় করেছে। আজাদ এক পর্যায়ে গোসল সেরে আড়ং-এর দিকে যাবে বলে ভাবছে। ঠিক তখনই চার-পাঁচ বছরের একটা উলংগ বালক এসে আজাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো। ভীত মুখে ডান হাত পেতে আজাদের দিকে তাকিয়ে রইল। চেয়ারে বসা আজাদ ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে, তুই ন্যাংটা ক্যান? জামা-কাপড় নেই?'

ভীত ও বিব্রত ছেলেটা কিছু না বলে সেভাবেই হাত পেতে দাঁড়িয়ে রইল। আজাদের মা হামীদা খাতুন বলল, 'এটা দিদারের শেষের ঘরের পোলা। দিদারের কথা হুনছসনি কিছু! গাড়ির নিচে পইড়া তার এক পা কাইটা গেছে। অহন লাঠি দিয়া হাঁটে আর ভিক্ষা কইরা খায়।'

আজাদ কিছু বলল না। সে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক সে সময়ে বাঁশের তৈরি স্কেচে ভর দিয়ে আসা একজন ঘরের ভিতর ঢুকে অতি দ্রুত হুমড়ি খেয়ে আজাদের দু'পা জড়িয়ে ধরলো। তারপর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বিলাপ করে কাঁদতে লাগলো। আজাদ ভাঙা চোয়ালে খোঁচা খোঁচা দাড়ির এই লোকটাকে চিনে উঠতে পারলো না। তা বুঝতে পেরে আজাদের মা বলল, এইটা দিদার। দেখছস কি পোলা কি হইছে।'

দিদার নাম শোনামাত্র আজাদ তীক্ষ্ণ চোখে দিদারের দিকে তাকালো। মুহূর্তেই তার মুখাবয়ব অন্ধকার হয়ে উঠলো। সে ক্ষুব্ধ মুখে পা জড়িয়ে ক্রন্দনরত দিদারের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেক সময় পরও কোন সহানুভূতির হাত পিঠে পড়ছে না দেখে দিদার একসময় মাথা তুলে তাকালো। সহানুভূতির পরিবর্তে আজাদের রাগত অভিব্যক্তি দেখে সে অনেকটাই যেন ভড়কে গেল। তারপর কিছু বুঝে উঠতে না পেরে নিচু মাথায় বেসুরো ভঙ্গিতে আবার কাঁদতে শুরু করলো। কিন্তু এতেও আজাদের কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে একসময় বিব্রত মুখে উঠে দাঁড়ালো। আজাদ তখনো দিদারের দিকে রাগত মুখে তাকিয়ে আছে। আজাদের মাও ছেলের এই অস্বাভাবিক আচরণ বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি কিছু না বলে ভিতরের ঘরে ছুটে গেলেন। তারপর একটা শাড়ি হাতে ফিরে এসে দিদাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নেরে দিদার,এটা নে। শাড়িটা তোর বৌরে দিস।'

আজাদ দিদারের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মুহূর্তকাল কি যেন ভাবলো। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে রাগত ভংগিতে বলল, 'রাখ মা, এটা এখন রাখ। ও আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিক। নয়তো তারে আমি ফাঁসিতে ঝুলাবো। তুমি দয়া করে এখন যাও।'

হামীদা খাতুন ছেলের অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি দেখে হাসিমুখে বললো, 'কি কথা কবি তুই অর সঙ্গে। দেখস না পোলাটা কেমন ভয় পাইছে। কথা থাকলে পরে কইস। ও এখন যাক।'

আজাদ আবার গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি ওকে চেন না মা। ও আমার সামনে তোমাকে গলা টিপে খুন করতে পারবে– একটুও হাত কাঁপবে না। প্লিজ, তুমি এখন যাও।'

www.pathagar.com

হামীদা খাতুন নিরুপায় হয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেলো। আজাদ ভিতর থেকে খিড়কি এঁটে দিদাদের মুখোমুখি বসলো।

হামীদা খাতুন বুঝলেন গতকাল মেহেরজানের অবস্থা দেখেই ছেলেটা এমন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এতদিন পর বাড়ি এসে সে কারো সাথে তেমন কথা বলেনি, এমনকি রাতের খাবারও খেতে পারেনি– যা তার কাছে খুবই অস্বাভাবিক ঠেকেছে। আর এখন দিদারকে কাছে পেয়ে ছেলের রাগ চড়ে গেছে। নিশ্চয়ই মেহেরজানের প্রসংগেই কথা বলবে। তিনি সেদিকে গেলেন না। একমাত্র নাতি নাফিজের সাথে গল্প জুড়ে দিলেন। গল্পের এক পর্যায়ে জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলেন আজাদ হনহন করে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। তিনি জানালায় মুখ রেখে ব্যস্ত গলায় বললেন, 'কই যাইতাছস রে? ভাত খাইয়া গেলি না?'

মায়ের ডাকে আজাদ ফিরেও তাকালো না। তার গতি ও অভিব্যক্তি বেশ রুক্ষ। হামীদা খাতুন কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। ছেলেটা এভাবে কোথায় যাচ্ছে জানেন না। তিনি শংকিত মুখে পুত্রের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একসময় মনে হতেই দিদাদের খোঁজে বসার ঘরে ছুটে গেলেন; কিন্তু ততক্ষণে দিদারও চলে গেছে। হামীদা খাতুন উদ্বিগ্ন মুখে দরজা এঁটে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আজাদ যতোটা উত্তেজিত ভংগিতে টুনু মেম্বারের বাড়ির দিকে ছুটে গেল বসার ঘরে মেম্বারের অবস্থা দেখে ততটাই যেন ভড়কে গেলো। তারপরও নিজেকে সামলে নিয়ে অন্ধকার মুখে মেম্বারের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা চেয়ারে উদোম দেহে বসা মেম্বার বিস্মিত মুখে আজাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অনেক কষ্টে শ্বাস টেনে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'জজ সাব যে, আমারে দেখতে আইছ। আমি তো শেষ হইয়া গেছিরে ভাই। এই, তোরা কই গেলি। আমাগো জজ সাব আইছে। অরে বইতে দে।'

আজাদ মেম্বারের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'আপনার কি হয়েছে? কতদিন থেকে এ অবস্থা?'

মেম্বারের শ্বাস টেনে আনতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। শ্বাস টানতে গিয়ে পেট ও বুক প্রচণ্ডভাবে ফুলে উঠছে আর নিচে নামছে– যা ভয় উদ্রেক করার মত দৃশ্য। আজাদ সেদিকে তাকিয়ে আছে। সে এখন কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। যে উত্তেজনা ও পরিকল্পনায় ছুটে এসেছে মেম্বারের অবস্থা দেখে তাতে যেন ছেদ পড়তে যাচ্ছে। সে মেম্বারের দিকে তাকিয়ে রইল। মেম্বার অনেক কষ্টে কাঁদো কাঁদো গলায় জানালো, 'শ্বাসের রোগ আগে থেকেই তার ছিল; এখন সেটা মারাত্মক হয়েছে। শ্বাস টেনে আনতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তার মাঝে এখন আবার যক্ষ্মায় বুক ঝাঁঝরা করে ফেলেছে।

আজাদ বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়লো। মেম্বার খেদ মিশ্রিত গলায় আরো বলল, 'তার দুই বৌ, ছেলেমেয়েরা কেউ তাকে দেখছে না। ওষুধ-পথ্য, সেবা-শুশ্রূষা ঠিকমত করছে না। আল্লাহ ছাড়া তার কোন গতি নাই। সে এখন মৃত্যুর দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে– ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

কথাগুলো বলে মেম্বার কাঁধের গামছায় দু'চোখ চেপে ধরলো। আজাদ তাকিয়ে রইল। সে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কি করে এ অসুস্থ লোকটাকে প্রায়শ্চিত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাবে জানে না; কিন্তু ভিতরের প্রচণ্ড ক্ষোভকেও দমন করতে পারছে না। আজাদ কিছুক্ষণ

www.pathagar.com

নিচু মাথায় ভাবলো। একসময় মাথা তুলে দৃঢ় অথচ নরম গলায় বলল, 'আপনার শরীরের অবস্থা দেখে আমি ব্যথিত; কিন্তু আপনার জন্য আরো দুঃখ অপেক্ষা করছে টুনু ভাই! আরো কঠোর প্রায়শ্চিত্য আপনাকে করতে হবে। আমি সে কথা জানাতে এসেছি।'

আজাদের কথা শুনে মেম্বার অন্ধকার মুখে তাকিয়ে রইল। একসময় বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'তুমি কি কইতাছ আজাদ! আমি তোমারে দেইখাই বুঝতে পারছি আমারে দেখতে আস নাই। আইছ কিছু একটা কইতে, কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আজাদ মেম্বারের চোখে চোখ রেখে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনি এ পর্যন্ত যা করেছেন তা দেখে এবং শুনে আমার গা শিউরে উঠছে। কি করে একজন মানুষ এতোটা নিষ্ঠুর হতে পারে আমার বুঝে আসে না। আপনি অসুস্থ, সে জন্য এসব নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু আপনার জঘন্য অপকর্মের কঠোর প্রায়শ্চিত্য হওয়া দরকার। তা না হলে মরেও রেহাই পাবেন না।'

মেম্বার উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'এইসব কি কইতাছ আজাদ!'

আজাদ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'মেহেরজান ভাবীকে কি জঘণ্য কায়দায় গ্রামছাড়া করেছেন আপনি জানেন না? সে ভদ্র মহিলা এখন থানা সদরে পাগল নাচছে। শাকেরাকে কি জীনে মেরেছ? ওকে কিভাবে কারা মেরে দিঘিতে ফেলেছিল আপনি নিশ্চয় জানেন। সফির জায়গায় বাড়ি করেছেন। কে আপনাকে এ অধিকার দিয়েছে?– জীতু মরে বেঁচেছে; নয়তো তাকেও আপনার সাথে ফাঁসিতে ঝুলাতাম।'

কথাগুলো বলে আজাদ থামলো। আজাদের কথা শুনে আতংকে মেম্বারের দু'চোখ যেন কোটর থেকে বেরিয়ে এলো। ভীত সন্ত্রস্ত মেম্বার কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'এ তুমি কি কইতাছ! আমি কি কইরা শাকেরা, মেহেরজান...।'

উত্তেজনায় কম্পনরত আজাদ মেম্বারকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মিথ্যে বলে আর পার পাবার সুযোগ নেই টুনু ভাই! আপনার প্রতিটি অপকর্মের স্বাক্ষী-প্রমাণ আমার হাতে। দিদার সব স্বীকার গেছে। তার প্রতিটি কথা টেপ করে রেখেছি। আপনারা যা করেছেন, বিচারে আপনাদের ফাঁসি ছাড়া আমি কোন পথ দেখছি না। এ মামলায় আমি বাদী হবো, সেটাই শুধু জানাতে এসেছি। আপনাদের শাস্তি পেতেই হবে।'

আজাদের কথা শুনে মেম্বার থর থর করে কাঁপতে লাগলো। ভীত সন্ত্রস্ত মুখে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। একসময় ছুটে গিয়ে দু'পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। মেম্বারের কান্না শুনে তার দু'স্ত্রী ছুটে এসে বিস্মিত মুখে তাকিয়ে রইল। বিব্রত আজাদ মেম্বারকে পা থেকে সরাতে চেষ্টা করেও পারছে না। সে ক্ষমা ছাড়া পা ছাড়বে না। অবশেষে দাঁড়িয়ে গিয়ে দু'বাহু টেনে আজাদ মেম্বারকে চেয়ারে বসিয়ে দিল। মেম্বার মাথা চাপড়িয়ে বিলাপের ভংগিতে কাঁদছে। তাকে বাঁচাবার কাকুতি-মিনতি জানাচ্ছে। ঘটনার আকস্মিকতায় বিব্রত আজাদ মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। নিচু মাথায় কি যেন ভাবলো। তারপর মাথা তুলে বলল, 'আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে লাভ নেই টুনু ভাই! যাদের আপনি সর্বনাশ করেছেন; সম্মান, সম্পদ নষ্ট করেছেন, তাদের তা ফেরত দেয়া আপনার দায়িত্ব। শাকেরা, বেচারি আজ বেঁচে নেই। এই সরলা মেয়েটার উপর জুলুমের বিচার অবশ্যই আল্লাহপাক কঠোরভাবে করবেন। মেহেরজান ভাবী, এই অসাধারণ মানুষটার নামে যে কলংকের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন; যে ভার বইতে না পেরে বেচারি আজ পাগল; তাকে তার হৃত সম্মান ফিরিয়ে দেয়া,

www.pathagar.com

গাঁয়ের মানুষের ভুল ভাঙার দায়িত্ব আপনার। আপনি অসুস্থ বলে আমি দুটো পথ খোলা রাখছি। এর যে কোন একটি আপনাকে বেছে নিতে হবে। আর দু'দিন পর ঈদ। আগামী পরশু অর্থাৎ ঈদের আগের দিন আমি গাঁয়ের সকলকে ডাকবো। সে মজলিশে হয় আপনি এসব অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইবেন; সফির সম্পদসহ যথাযথ ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য থাকবেন; নতুবা আমি সকলকে আপনার অপরাধের কথা জানাবো। সকলকে নিয়ে আইনের আশ্রয়ে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবো। এর কোনটি বেছে নিবেন আমাকে এখনই জানাতে হবে। আমি সে মতে এগুবো।'

কথাগুলো বলে আজাদ থামলো। মেম্বার বিমর্ষ মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার হু-হু করে কেঁদে উঠলো। তারপর অস্থির ভংগিতে আবার আজাদের পা ধরতে যেতেই সে বাধা দিয়ে বলল, 'এসব করে কোন লাভ নেই, টুনু ভাই। আপনাকে দুটোর একটি পথে যেতেই হবে। আমি আজই পুলিশ ডেকে থানায় দিতাম; শুধু আপনার অসুস্থতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে জঘন্য কাজ করেছেন, শুধু ফাঁসিতেই তা মোচন হবার নয়। বলুন কোন পথে যাবেন। আমাকে বাড়ি যেতে হবে।'

মেম্বার করুণ দৃষ্টি মেলে আজাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আজাদও চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল। মেম্বার একসময় মাথা নিচু করলো। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো। তারপর মাথা তুলে ব্যথিত গলায় বলল, 'আমার অবস্থা তো দেখতাছ। মরণ আমার বাকি নাই। এই শেষ বেলায় আমারে বেইজ্জত কইরো না। তুমি যে শাস্তি দিবা আমি তা'ই মাথা পাইতা নিমু। আমারে তুমি ক্ষমা কইরা দাও।'

কথাগুলো বলে মেম্বার কাঁধের গামছায় মুখ চেপে ধরলো। আজাদ রুক্ষ গলায় বলল, 'আপনি অপরাধি হয়েও সত্য প্রকাশে ইজ্জতের কথা ভাবছেন; কিন্তু আপনার স্বীকারোক্তির সাথে যে নিরপরাধ মানুষদের ইজ্জত-সম্মান জড়িত সেটা ভাবার ক্ষমতা আপনার নাই। আমি আর বসতে পারছি না। যা ভাল মনে করবেন সে পথেই এগুবেন। পরশুদিন গাঁয়ের সকলকে ডাকছি।'

কথাগুলো বলে আজাদ বসা থেকে দাঁড়ালো। মেম্বার ভীত মুখে আজাদের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে চাইলো, কিন্তু মুখে তার কথা ফুটলো না। আজাদ আর না দাঁড়িয়ে বাড়ির পথে হাঁটতে লাগলো।

•

মেম্বার এত সহজে কাবু হবে, আজকের বৈঠকে হাজির হবে আজাদ কিছুতেই ভাবতে পারেনি। গতকালও লোকটা উল্টা-পাল্টা বকেছে, হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্টে যাবে হুমকি দিয়েছে। আজ সকাল থেকেই অসুস্থ শরীরে সাবেক চেলা-চামুন্ডাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে। তাদের সমর্থন পেতে চাইছে; কিন্তু সম্ভবত ব্যর্থ হয়েই নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছে।

আজাদ আপন সফলতায় বেশ উদ্দীপিত। সে মজলিশে উপস্থিত লোকগুলোর মুখের দিকে ঘুরে ফিরে তাকাচ্ছে। তাদের বিশাল উঠান লোকে লোকারণ্য। এই রাতে মানুষের গম গম শব্দে পুরো বাড়ি মুখরিত। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় প্রতিটি মানুষ একদিকে যেমন হতবাক, অন্যদিকে তারা বেশ পুলকিত। সকলেই এ মুহূর্তে মেহেরজানের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও

www.pathagar.com

মেম্বারকে তিরস্কার ছুড়ে দিচ্ছে। মেম্বারের সাবেক চেলারাও বেশ সরব। তারাও তাকে ভর্ৎসনা করছে। লজ্জিত, বিধ্বস্ত মেম্বার নিচু মাথায় চোখের পানি ফেলছে। একটু আগে সকল অপরাধ স্বীকার করে সে করজোড়ে ক্ষমা চেয়েছে। পঙ্গু দিদারও এতক্ষণ ফজলুর পায়ে পড়েছিল। ফজলু তাকে ক্ষমা করায় উঠে দাঁড়িয়েছে। এরফান এ পর্যায়ে মেম্বারের দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের ভংগিতে বলল, 'মেম্বার সাব, বিচার করার বয়স কি এখন আমার হইছে? সেইদিন আপনে আমারে নাকে দুধ গলে কইয়া টিটকারি মারছেন; অন্যায় বিচারের প্রতিবাদ করায় হুঙ্কার মাইরা উঠছেন। বৈঠক ভাইঙা দিয়া তড়িঘড়ি চইলা গেছেন; আর আইজ আপনে...।'

এরফানকে থামিয়ে দিয়ে আজাদ এ পর্যায়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সকলকে উদ্দেশ্য করে দৃঢ় গলায় বলল, 'আপনারা থামুন। ধৈর্য্য ধরে একটু বসুন। রাত অনেক হয়েছে, আর দেরি করা ঠিক নয়। টুনু ভাই তার অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছে। সফির জায়গাসহ সবরকম ক্ষতিপূরনের ওয়াদা করেছে। কেউ ক্ষমা চেয়ে ক্ষমা পাওয়ার পর আর অপরাধী থাকে না। আমাদের এখন প্রধান দায়িত্ব ভবিষ্যতে এ গাঁয়ে এমন অপরাধ ও অপরাধীর জন্ম যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করা এবং যে কোন অন্যায় প্রতিরোধে সকলে এগিয়ে আসা। আপনারা অনেকেই জানেন যে, এ গাঁয়ের গৃহবধূ মেহেরজান এখন সম্পূর্ণ এবনর্মাল– যিনি থানা সদরে অলি-গলিতে ঘুরে বড়াচ্ছেন। গতকাল তার সাথে আমার দীর্ঘসময় কথা হয়েছে। সুখের বিষয় যে তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। অতীত স্মৃতি স্মরণ করতে পারায় তার দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়েছে। আমি উনাকে...।'

এ পর্যায়ে এসে আজাদ বাকরুদ্ধ হলো। সে প্রথমে হাতে, পরে পকেট থেকে রুমাল বের করে দু'চোখ চেপে ধরলো। আজাদের অবস্থা দেখে মজলিশের বিভিন্ন দিক থেকে কান্না ও ডুকরানির শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। আজাদ দ্রুত নিজেকে সামলে বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমি উনাকে আমার এক আত্মীয়ের বাসায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। সেখানে গোসল, খাওয়া-দাওয়া সারিয়ে রেখে এসেছি। উনার কালকের অবস্থা দেখে আমার এ প্রত্যাশা জন্মেছে যে, উপযুক্ত চিকিৎসা হলে আল্লাহপাক তাকে সুস্থ করে দিতে পারেন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার যাওয়ার পথে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ঢাকায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো। আপনারা দোয়া করবেন। এই অসাধারণ ভাল মানুষটাকে...।'

আজাদ এ পর্যায়ে আবারও বাকরুদ্ধ হলো। সে নিজেকে সামলে বলল, 'উনাকে গতকাল গাঁয়ে আনতে অনেক চেষ্টা করেছি; কিন্তু কিছুতেই রাজি করাতে পারিনি। এ গাঁয়ের কুৎসিত স্মৃতি নিশ্চয় তিনি ভুলতে পারেননি। আপনারা দোয়া করবেন সুস্থ হয়ে উনি যেন এ গাঁয়েই ফিরে আসেন। অতীত স্মৃতি ভুলিয়ে তাকে যেন মর্যাদার আসন দিতে পারি সে তৌফিক আল্লাহ দান করেন। আপনাদের আর কষ্ট দিতে চাই না। রাত অনেক...।'

আজাদের কথার এ পর্যায়ে ফজলুর বাবা কলিমউদ্দিন তাকে থামিয়ে দিয়ে বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'শেষ করার আগে আমার দুইডা কথা আপনেরা একটু দয়া কইরা শুনেন।'

কলিমউদ্দিন শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ভদ্রলোককে কাছে ডাকলেন। ভদ্রলোক আসতেই তিনি তার হাত ধরে বললেন, 'আপনেরা অনেকেই উনারে চিনেন। উনি আমার বেহাই, আমাগো ফজলুর শ্বশুর।'

www.pathagar.com

এ কথা বলে কলিমউদ্দিন একটু থামলেন। হাতের পিঠে চোখ মুছলেন। তারপর আবার বললেন, 'ফজলুর নামে কলংক রটানোর পর অনেক চেষ্টা সাধনা কইরাও যখন তারে বিয়া করাইতে পারলাম না; কেউ ফজলুর মত অসৎ ছেলের কাছে মাইয়া দিতে রাজি হইলো না; তখন আমার এই বেহাইই শুধু বিশ্বাস করলেন যে এই পোলা খারাপ হইতে পারে না। তিনি তার সকল আত্মীয়-স্বজনের মতামত উপেক্ষা কইরা আমার পোলার কাছে মাইয়া বিয়া দিলেন। তারপরও অনেক গঞ্জনা সইলেন। আমার সৌভাগ্য যে বেহাই আইজকার এই দিনে আমাগো বাড়ি বেড়াইতে আইছে। আমার পাশে বইসা তার অতি আদরের মেয়ে জামাইর নির্দোষিতার কথা হুনছে। উনার আর আমার মুখের দিকে আপনেরা সকলে তাকান। চোখ দিয়া পানি পড়লেও এই পানি দুঃখের না, আনন্দের পানি। আইজকার মত আনন্দের দিন আমাগো জীবনে আর কোনদিন আহে নাই। এইটা সম্ভব হইছে আল্লাহপাক আমাগরে একটা মহামানুষ দান করছে। তার বিবেক-বুদ্ধি আর সততার কারণেই আমাগো মুখে হাসি ফুইটা উঠছে। দোয়া করি এই দেশের প্রত্যেক গেরামে গেরামে যেন আজাদের মত একজন মানুষের জন্ম হয়। তারা দুঃখী মানুষদের কাইড়া নেয়া মুখের হাসি ফিরাইয়া দেয়। আমার ফজলু, ফজলুর মা, বৌমা ঐতো আড়ালে দাঁড়াইয়া কাঁদতাছে। দোয়া করি এমন কান্না যেন দুঃখীদের ঘরে ঘরে বইয়া যায়।'

কথাগুলো বলে কলিমউদ্দিন কাঁধের গামছায় দু'চোখ চেপে ধরলো। আজাদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আপনাদের ডেকেছি। আমার ডাকে আপনারা সাড়া দিয়ে কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন; সে জন্য সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। রাত অনেক হয়েছে। আর কষ্ট দিতে চাই না। আমাদের কাজ এখানেই শেষ। আল্লাহ্ হাফেজ।

বৈঠক শেষে কুপি, হারিকেন হাতে মানুষ যার যার বাড়ির পথে এগুতে লাগলো। রাত অনেক হওয়ায় একে একে সকলেই উঠোন ছেড়ে চলে গেল। আজাদ তখনও চেয়ার চেপে উঠোনে বসে আছে। ক্রিমিনাল দুটোকে স্বীকারোক্তি ও কিছুটা হলেও শাস্তির আওতায় আনতে পেরে সে বেশ পরিতৃপ্ত। আজাদ প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে তাদের আঙিনার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের ভিতর বাতি জ্বলছে। আজাদের মা হারিকেন হাতে রান্না ঘরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সম্ভবত শোয়ার আগে ছেলের আকাঙ্ক্ষিত চায়ের জন্যই তার এ ব্যস্ততা; কিন্তু দাদুর পিছু পিছু নাফিজকেও ছুটতে দেখে সে কিছুটা অবাক হলো। এত রাতেও ছেলেটা ঘুমায়নি!

আজাদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। পূর্বাকাশে ক্ষয়িষ্ণু বাঁকা চাঁদ গাছের চূড়া ভেদ করেছে। আকাশে অসংখ্য তারার ফুল– যেন দূরাকাশে মেলা বসেছে। গাছ-গাছালিতে মৃদু-মন্দ বাতাস হেলে দুলে বয়ে যাচ্ছে। আজাদ বার কয়েক উঠোনে পায়চারি করলো। মুগ্ধ চোখে এদিক-ওদিক তাকালো। একসময় ধীর পায়ে ঘরের দিকে এগুতে লাগলো।

বসার ঘরে ঢুকেই আজাদ স্ত্রী নাদিয়ার মুখোমুখি হলো। গত তিন দিন ধরে বিষণ্ন আজাদকে এ মুহূর্তে বেশ উৎফুল্ল দেখে নাদিয়া প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। আজাদও মুগ্ধ চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একসময় কপালের ওপর আসা নাদিয়ার এক গোছা এলো চুল আলতো হাতে সরিয়ে দিতেই সে বিশেষ ভঙ্গিমায় হাসলো। আজাদের মুগ্ধ দৃষ্টি আরো প্রগাঢ় হয়ে নাদিয়ার মুখের উপর স্থির হয়ে রইল।

পারিবারিক গ্রন্থাগার
মুজাহিদ

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

বাংলাদেশে শরীয়াহ্ ভিত্তিক প্রথম ইসলামী জীবন বীমা (তাকাফুল)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

সুদমুক্ত হালাল বীমা ব্যবস্থা

■

লাভ ও লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত

■

পরস্পরের মধ্যে দায়িত্বের অংশীদারিত্ব

■

সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণমুখী ব্যবস্থা

■

পারস্পরিক সংহতি ও সহযোগিতা

ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ

ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত

প্রধান কার্যালয় ঃ টি.কে ভবন, (১৪তম তলা) ১৩, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ ৮১৫০১২৭-৩১ ফ্যাক্স - ৮৮০-২-৮১৩০৬১১

www.pathagar.com

- সময়
- শ্রম
- অর্থ

সাশ্রয় করুন
একদামে
কিনুন

প্রতিটি ফ্ল্যাটের
চারদিকই
উন্মুক্ত

Crescent VIEW
at MIRPUR
1250, 1140, 1000, 950 sft.

Crescent HEAVEN
at MIRPUR
1370, 1400 sft.

Crescent PEACE
at WEST DHANMONDI
1670, 1530, 1350 sft.

Crescent HIVE
at SUKRABAD
1250, 1050, 900 sft.

Crescent MEADOW
at MIRPUR
745, 790, 855, 915, 940
985, 990 &1175 sft.

Crescent MELLOW
at MOGHBAZAR
1150, 1240, 1125 sft.

note : 1 sft. = 0.0929 sqm. appx.

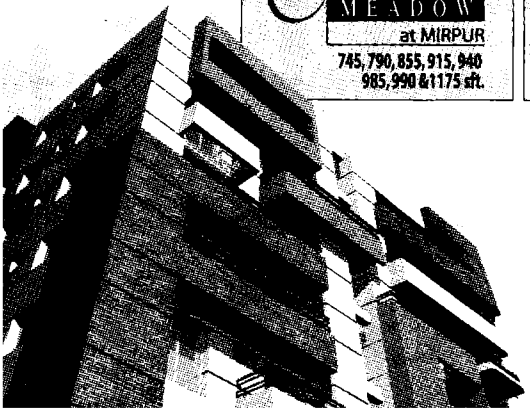

Land
Wanted
for
JOINT VENTURE
DEVELOPMENT

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

প্রবন্ধ

১.	বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস	নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান	৩০০/-
২.	আধুনিক মুসলিম মণীষা	অধ্যাপক মোঃ আব্দুল লতিফ	১০০/-
৩.	বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে	ড. আসকার ইবনে শাইখ	৫০/-
৪.	দরোজার পর দরোজা	আবদুল মান্নান সৈয়দ	৬০/-
৫.	বহুরূপে নজরুল	শাহাবুদ্দীন আহমদ	১০০/-
৬.	কবি ফররুখ ঃ তাঁর মানস ও মনীষা	শাহাবুদ্দীন আহমদ	৫৫/-
৭.	সঙ্গ প্রসঙ্গ	মাফরুহা চৌধুরী	৫০/-
৮.	সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঃ ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট	আবদুল মান্নান তালিব	৪০/-
৯.	ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান	আবদুল মান্নান তলিব	২৫/-
১০.	ছোটদের হযরত ওমর	আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দীন	৩৫/-
১১.	বাংলা ভাষা ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন	মুহম্মদ মতিউর রহমান	৪০/-
১২.	বাংলা সাহিত্যের ধারা	মুহম্মদ মতিউর রহমান	৬০/-

উপন্যাস

১.	কাবিলের বোন (মুক্তি যুদ্ধের উপন্যাস)	আল মাহমুদ	১৫০/-
২.	যে পারো ভুলিয়ে দাও (ঐতিহ্যিক উপন্যাস)	আল মাহমুদ	৭০/-
৩.	মুনীরা (ঐতিহ্যিক উপন্যাস)	জামেদ আলী	১০০/-
৪.	রক্ত রঞ্জিত পথ (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	নাজিব কিলানী	৫৫/-৮০/-
৫.	আল্লার পথের সৈনিক (ঐতিহ্যিক উপন্যাস)	নাজিব কিলানী	৪৭/-
৬.	মুজাহিদের তলোয়ার (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	নসীম হিজাযী	১৫০/-
৭.	মানুষ ও দেবতা (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	নসীম হিজাযী	৬০/-
৮.	প্রত্যয়ের সূর্যোদয় (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	নসীম হিজাযী	১৬০/-
৯.	ভারত যখন ভাঙলো (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	নসীম হিজাযী	১৬০/-
১০.	অপরাজিত (সামাজিক উপন্যাস)	নসীম হিজাযী	১৬০/-
১১.	বিদ্রোহী জাতক (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শফীউদ্দীন সরদার	৮০/-১৫০/-
১২.	ঝড়মুখী ঘর (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শফীউদ্দীন সরদার	১৪০/-
১৩.	রোহিনী নদীর তীরে (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শফীউদ্দীন সরদার	৮০/-
১৪.	দখল (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	শফীউদ্দীন সরদার	৮০/-
১৫.	লোহলিয়ার বাঁকে (সামাজিক উপন্যাস)	সোলায়মান আহসান	৬০/-
১৬.	অলক্ষ্যে অগোচরে (সামাজিক উপন্যাস)	সোলায়মান আহসান	৮০/-
১৭.	একবার ফিরে চাও (সামাজিক উপন্যাস)	মোহাম্মদ আলী আজম	৬০/-
১৮.	মন মনান্তর (সামাজিক উপন্যাস)	সুফিয়া হাফিজ মুক্তা	৬০/-
১৯.	দুই সুলতান (ঐতিহাসিক উপন্যাস)	জামান সাদী	৪০/-
২০.	আষাঢ়ের আগুন (কিশোর উপন্যাস)	মোহাম্মদ আলী আজম	৬০/-

গল্প

১.	নতুন জমিনদার	শাহেদ আলী	৩৫/-৫৫/-
২.	বিশ শতকের চার দরবেশ	বদরে আলম	৩৫/-৫০/-
৩.	এক টুকরো মেঘ	মাহবুবুল হক	৪৫/-৬০/-

এছাড়াও আবুল আসাদ রচিত সাইমুম সিরিজ ১ থেকে ৪০ নং পর্যন্ত এবং কাশ্মীরের জেহাদ সিরিজ ১ থেকে ৯ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা

১৭১(ডাক্তারের গলি), বড় মগবাজার,ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৩২৪১০

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহামানির রাহীম

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে
আমরাও নিজেদেরকে এগিয়ে নিচ্ছি।
অডিও ভিডিও ক্যাসেটের পাশাপাশি
১০০ বছরের সংরক্ষণের
নিশ্চয়তায় সংগ্রহ করুন
আমাদের উল্লেখযোগ্য ক্যাসেটের

ভিসিডি / সিডি

চলে আসুন আমাদের শো-রুমে

আমাদের প্রযোজিত দুই শতাধিক ক্যাসেট থেকে
আপনার পছন্দেরটি সংগ্রহ করুন

ক্যাসেট ক্রয় করার সময় CHP মনোগ্রাম দেখে নিন।

www.pathagar.com

বই কিনুন বই পড়ুন, প্রিয়জনকে বই উপহার দিন

আধুনিক বিশ্বের সেরা ইসলামী মণীষী

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহ. এর

বিশ্বসেরা তাফসীর

'তাফহীমুল কুরআন'

ও

'সীরাতে সরওয়ারে আলম'সহ

ইসলামের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের

সকল দিক ও বিভাগের উপর লেখা

বইগুলো পড়ুন

ইসলামকে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিন

ঃ যোগাযোগ করুন ঃ

আধুনিক প্রকাশনী

৪৩৫/২-এ ওয়ারলেস রেলগেইট

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

২৫ শিরিদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

১০ আদর্শ পুস্তক বিপণী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

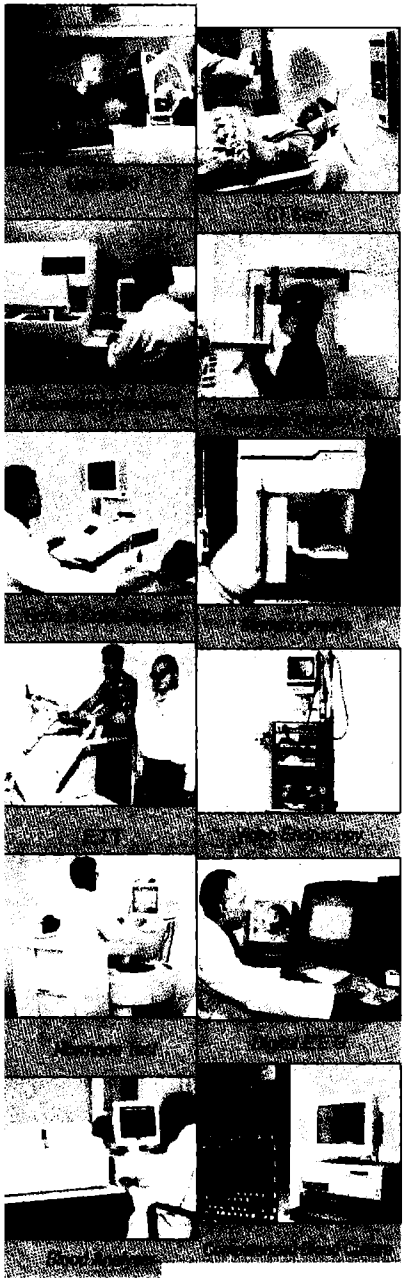

World Class Diagnostic Technology at IBN SINA

IBN SINA a pioneer in the field of diagnostics in Bangladesh, having qualified specialists to operate our highly sophisticated diagnostic equipments from SIEMENS, Germany.

IBN SINA OFFERS FOLLOWING SERVICES:

- Open MRI
- CT Scan
- Haematology Analyser
- Panoramic Dental X-ray
- Echo & Color Doppler
- Mammography
- E.T.T
- Video Endoscopy
- Hormone Test
- Digital E.E.G (32 Channel)
- Blood Analyser
- Computerized Blood Culture and all other laboratory tests.

IBN SINA-WAY AHEAD :

- First to install Open MRI in Bangladesh.
- First to install Computerized Blood culture (Bact Alert) machine in private sector.
- The only Upgradable Haematology analyser, cell Dyn-3700.
- Pioneer for 32 channel DIGITAL EEG & Video EEG monitoring in the country.

THE IBN SINA, a Trust totally committed to serve humankind. So, we charge everyone 25% less for all tests.

Uncompromising Quality
All Tests Cost
25%
Less
Always

IBN SINA
Pioneer in Health Care

Ibn Sina Medical Imaging Centre
House#58, Road#2/A, (Jigatala Bus Stand) Dhanmondi R/A
Dhaka-1209, Tel: 8610420, 8618007, 8618262

www.pathagar.com

ইসলামী চেতনায়
আমাদের পথচলা

প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

শরীয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত
একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানী

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ সদস্য সমন্বিত শরীয়াহ্ কাউন্সিল
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালনা পরিষদ
- স্বল্পতম সময়ে দাবী পরিশোধ
- স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা
- দ্রুততম গ্রাহক সেবার নিশ্চয়তা
- প্রবাসীদের সেবা প্রদানের সুব্যবস্থা
- ইসলামী পূণর্বীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তি সম্পাদন

আমাদের একটি পলিসি
আপনার আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে– ইনশা'আল্লাহ

প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
برائيم اسلامى لائف انشيورنس لميتيد
Prime Islami Life Insurance Limited
আর্থিক নিরাপত্তার সেতুবন্ধন

Head Office : Raj Bhaban (6th floor), 29, Dilkusha C/A, Dhaka-1000
Phone : 9554538, 9560889, Fax : 9564390; e-mail : plicl@bdonline.com

www.pathagar.com

ওপেক প্লাস্টিক বা টিনের কনটেইনারে নয়,
স্বচ্ছ প্লাস্টিক বোতলে ...

কিউট

পারফিউমড ও রিফাইন্ড
না র কে ল তে ল

দেখেই বুঝা যায় কত স্বচ্ছ, কত হালকা.....
আর ব্যবহারে একদম নন-স্টিকি।
চুল চটচটে হয় না, জট বাঁধেনা, খুশকিতো হয়ই না।

বহুদিন ঘরে রাখলেও কিউট নারকেল তেল -এ কোন গাদ পড়ে না

তাই কিউট নারকেল তেল
আজ দেশের সেরা বলে
প্রমাণিত ও প্রশংসিত

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের মুদারাবা ওয়াক্‌ফ্‌ ক্যাশ ডিপোজিট একাউন্ট

আপনি কি সামাজিক ও মানবিক কল্যাণে দান করতে চান?

এ জন্য কি আপনি কিস্তির ভিত্তিতে তহবিল গড়ে তুলতে ইচ্ছুক?

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড আপনার সদিচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য চালু করেছে

মুদারাবা ওয়াক্‌ফ্‌ ক্যাশ ডিপোজিট একাউন্ট

আপনি ক্যাশ ওয়াক্‌ফ্‌ হিসাবে ওয়াক্‌ফ্‌কৃত সমুদয় অর্থ এককালীন জমা করতে পারেন অথবা ক্যাশ ওয়াক্‌ফ্‌-এর মোট পরিমাণ ঘোষণাপূর্বক প্রারম্ভিক অবস্থায় ন্যূনতম ৳. ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) মাত্র জমা করে পরবর্তী সময়ে হাজার টাকা বা তার গুণিতক অংকে বাকী অর্থ কিস্তিতে জমা করতে পারেন।

এ হিসাবে সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদান করা হয়।

এ হিসাব থেকে অর্জিত মুনাফা হিসাবকারীর নির্দেশ অনুযায়ী সামাজিক ও মানবিক কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়াহ্‌ মোতাবেক পরিচালিত

www.islamibankbd.com

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন